প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র
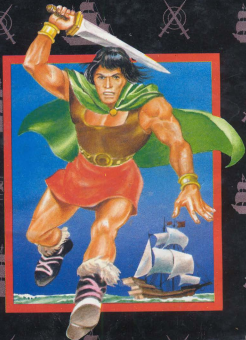
ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

অভিশপ্ত দ্বীপে ফ্রান্সিস ● রাজা ম্যাগনামের পাণ্ডুলিপি ● আবু হামিদের রোজনামচা ● ইবু সলোমানের রত্নভাণ্ডার

ফ্রান্সিস সমগ্র (৯)

অনিল ভৌমিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

FRANCIS SAMAGRA PART 9
By Anil Bhowmick
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী ২০০৮

পরিবেশনায় :
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎ চন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ :
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রণে :
ইন্দ্রলেখা প্রেস

একশ টাকা মাত্র
Rupees One hundred Only

ISBN-81-7334-122-2

> আজকের দিনে যে জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর পরেই তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

প্রায় এক হাজার বছর আগেকার কথা। দীর্ঘ পাঁচ-ছ'শ বছর দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাতি মুররা পোর্তুগালের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে রাজত্ব চালিয়েছিল। তেমনি এক শাসক ছিলেন ইবু সলোমন। কবি স্বভাবের মানুষ। ধর্ম সম্বন্ধে উদার, অন্যদিকে বাস্তববুদ্ধিও ছিল প্রখর। আরবীয় বণিকদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে প্রচুর কুফি অর্থাৎ প্রচুর আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করেছিলেন। আবার একান্তপ্রিয় বন্ধু আর এক কবি আলফানসোর সঙ্গে রাত জেগে মুখে মুখে কবিতা (তৎকাল প্রচলিত গিজেল) রচনাও করতেন। তাঁর একটিই দুর্বলতা—একমাত্র পুত্রের প্রতি অন্ধস্নেহ। তাঁর সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডারের লোভে দুর্বিনীত পুত্র তাঁকে হত্যা করেছিল। কোনদিন পুত্র সুপথে আসবে ভেবে নিয়ে লোভাত নদীর তলদেশে তাঁর স্বর্ণভাণ্ডারের সিন্দুক গোপনে রেখে গিয়েছিলেন। এবং তার সূত্রও মৃত্যুর পূর্বে একটি কবিতায় রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু সেই সূত্রের অর্থ বুঝে নিয়ে কেউ তা উদ্ধার করতে পারে নি। ফ্রান্সিস সেই কবিতাটি ইবু সালেমের কবি বন্ধু আলাফনসার কাছে শুনে সব কাহিনী জেনে চিন্তা ও বুদ্ধির সাহায্যে 'ফ্রান্সিস উদ্ধার করেছিল। সেই কাহিনী নিয়েই বর্তমান উপন্যাস।

অনিল ভৌমিক

জীবনপঞ্জী

জন্ম ১৯৩২ চট্টগ্রামে। তবে বাল্য ও প্রথম যৌবন কেটেছে ময়মনসিং জেলার জামালপুর শহরে (অধুনা বাংলাদেশ)। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নিঃস্বম্বল অবস্থায় দেশত্যাগ ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ। অভাব দারিদ্র্যের ঝড়ো সময় কাটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাকাউন্টেট জেনারেল অফিসে পেশাগত-জীবন শুরু। কিশোরকালে 'পাঠশালা' পত্রিকায় প্রথম 'সে' গল্প প্রকাশিত। সাহিত্য সাধনার সংকল্প নিয়ে চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ। বড় ছোটোদের জন্য সৃষ্টি করেছেন গল্প উপন্যাস অনুবাদ। অবসর গ্রহণের পরে এখনও সক্রিত। আকাশবাণীতে প্রখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপ লিখেছেন দীর্ঘকাল। 'পরাশর রায়' এই ছদ্মনামে আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত গীতিকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা [illegible]

এই লেখকের কয়েকটি বই

সোনার ঘন্টা হীরের পাহাড় মুক্তোর সমুদ্র তুষারে গুপ্তধন	ফ্রান্সিস সমগ্র—১ম
রুপোর নদী মনিমানিক্যের জাহাজ বিষাক্ত উপত্যকা চিকামার দেবরক্ষী	ফ্রান্সিস সমগ্র—২য়
চুনীপান্নার রাজমুকুট কাউন্ট রজারের গুপ্তধন যোদ্ধামূর্তি রহস্য রানীর রত্নভাণ্ডার	ফ্রান্সিস সমগ্র—৩য়
যীশুর কাঠের মূর্তি মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস চার্লসের স্বর্ণসম্পদ রুপোর চাবি	ফ্রান্সিস সমগ্র—৪র্থ
ভাঙা আয়নার রহস্য সম্রাটের রাজকোষ রত্নহার উদ্ধারের ফ্রান্সিস রাজা ওভিড্ডোর তরবারি	ফ্রান্সিস সমগ্র—৫ম
চিচেন ইতজার রহস্য পাথরের ফুলদানি স্বর্ণখনির রহস্য হীরক সিন্দুকের সন্ধানে	ফ্রান্সিস সমগ্র—৬ষ্ঠ
সোনার ঘর শায়িত দেবতাদের মন্দির গর্ভগৃহে ধনভাণ্ডার রাজা আলফ্রেডের স্বর্ণখনি	ফ্রান্সিস সমগ্র—৭ম
সোনার সিংহাসন সিয়োভরের রত্নভাণ্ডার মৃত্যুসায়রে ফ্রান্সিস সুলতান হানিফের রত্নভাণ্ডার	ফ্রান্সিস সমগ্র—৮ম

ফ্রান্সিস সমগ্র ১—৮

এছাড়াও

সোনার শেকল

সর্পদেবীর গুহা

মেরীর স্বর্ণমূর্তি

হাতিপাহাড়ের গুপ্তধন

অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

কিশোর গল্পসম্ভার

অভিশপ্ত দ্বীপে ফ্রান্সিস

অতিকায় হাঙরের কামড়ে গুরুতর আহত ফ্রান্সিসের দিন কাটতে লাগল বিছানায় শুয়ে। ফ্রান্সিসের ডান হাঁটুর কাছে মাংস খুবলে নিয়েছিল সেই বড় হাঙরটা। ফ্রান্সিসের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। ক্ষত সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বয়স্ক বৈদ্য ভেন চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষত শুকোবার সব রকম ওষুধই ভেন ব্যবহার করছে। তবু ভয় যাচ্ছে না ওর মন থেকে। যদি ক্ষত বিষিয়ে ওঠে? ভেন তিনবেলা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে যেন ক্ষত বিষিয়ে না ওঠে। এই আশঙ্কার কথা, এই ভয়ের কথা ভেন কাউকে বলছে না।

ওদিকে ফ্রান্সিসও মনে মনে ওর এই অসহায় অবস্থাটা মেনে নিতে পারছে না। ওর মতো দুঃসাহসী দৃপ্ত যুবক এই ভাবে বিছানায় পড়ে আছে এটা মারিয়াও মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু উপায় তো নেই। মারিয়া দিনরাত সেবাশুশ্রূষা করে চলেছে। পাছে মারিয়ার মন দুর্বল হয়ে পড়ে তাই ফ্রান্সিস মুখ বুঁজে সব জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছে। বন্ধুদের মুখে হাসি নেই। রাতে আর জাহাজের ডেকে নাচ-গানের আসর বসে না। ওরা মাঝে মাঝেই এসে ফ্রান্সিসকে দেখে যায়। নীরবে নিজেদের কাজ করে যায়। ভেনের চিকিৎসার ওপর ওদের গভীর বিশ্বাস। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই সুস্থ হবে। আবার আগের মতোই তরোয়ালের লড়াই চালাতে পারবে।

দিন সাতেকের মধ্যে ফ্রান্সিস খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। ও যদিও সেটা কাউকে বুঝতে দিচ্ছিল না। কিন্তু মনের দুশ্চিন্তা কাটতে চায় না। যদি সত্যিই ও এভাবে মারা যায় তাহলে মারিয়ার কী হবে? বন্ধুরাই বা কী করবে?

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস কিছুটা সুস্থ হল। ভেনের ওষুধ আর মারিয়ার শুশ্রূষায় ফ্রান্সিস দিন পনেরোর মধ্যে হৃতশক্তি অনেকটাই ফিরে পেল। মারিয়া ও ফ্রান্সিসের বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হল।

এক সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল, হ্যারি, আমি এখন অনেকটা সুস্থ। আর এখানে পড়ে থেকে কী হবে? জাহাজ ছাড়তে বলো। উত্তরমুখো। দেশের দিকে। হ্যারি শাঙ্কোদের ডেকে বলল সে কথা। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। পাল খাটাল। জাহাজ ছেড়ে দিল। কয়েকজন চলে গেল দাঁড়ঘরে।

দ্রুত দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ পূর্ণগতিতে চলল। পালগুলো জোরালো বাতাসে ফুলে উঠল। জাহাজ সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে দ্রুত ছুটল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হাঁটতে পারছে এখন।

রাত হলে সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ডেকে উঠে আসে ও। ধীরে ধীরে ডেকে পায়চারি করে। মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার পেড্রোকে ডেকে বলে, পেড্রো, ঘুমিয়ে পড়ো না। নজর রাখো। পেড্রোও গলা চড়িয়ে বলে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। রাত জেগো না। তোমার বিশ্রামের, ঘুমোবার খুব দরকার। এ সময় হ্যারিও ডেকে উঠে আসে। দুজনের কথা হয়। জাহাজ ঠিক দিকে যাচ্ছে কিনা, কবে নাগাদ দেশে পৌঁছোনো যাবে এসব নিয়ে আলোচনা চলে।

দিন পনেরো-কুড়ি নির্বিঘ্নেই কাটল। ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়তে হয়নি। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। পেড্রো দিনরাত মাস্তুলের ওপর থেকে চারদিকে নজর রাখছে। কিন্তু চারদিকেই জল। ডাঙার কোনো চিহ্নই দেখতে পাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস এখন একটু খুঁড়িয়ে হলেও মোটামুটি হাঁটাচলা করতে পারছে। মাঝে মাঝে শাঙ্কো বিনেলোর সঙ্গে তরোয়ালের খেলা খেলে। আগের মতো তড়িৎগতিতে অবশ্য চলাফেরা করতে পারছে না। বাঁ পায়ের জোর বেশ কমে গেছে।

জাহাজ চলছে। কিন্তু কোথায় ডাঙা? ফ্রান্সিস, হ্যারি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ল। ওদিকে জাহাজে পানীয় জল, খাদ্য ফুরিয়ে আসছে। ডাঙায় পৌঁছোতেই হবে। বন্ধুরা পাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাঁড় টেনে জাহাজের গতি বাড়াতে লাগল। জাহাজের গতি বাড়ল। কিন্তু ডাঙা চোখে পড়ছে না।

ভাইকিংরা সমুদ্রকে ভালোভাবেই চেনে। আবাল্য দেখে এসেছে এই সমুদ্রকে। ভোরের আবছা কুয়াশায় ঢাকা সমুদ্র তারপর সূর্যোদয়ের সেই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। আকাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় উজ্জ্বল রোদের ঝিকিমিকি পূর্বের আকাশে রক্তিমাভা ছাড়াছাড়া মেঘের গায়ে কত বিচিত্র রঙের খেলা। তার মধ্যে দিয়ে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য। মাঝিরা তো এসময় ডেক-এ উঠে রেলিং ধরে দাঁড়াবেই। বড় ভালোবাসে এই সূযাস্তের দৃশ্য দেখতে। সন্ধ্যার মুখে দুটো একটা করে তারা ফুটতে থাকে। তারপরে রাত্রির আকাশের বিপুল শূন্যতায় লক্ষ তারার ভিড়। ক্ষীণ চাঁদ দিনে দিনে পূর্ণতা পায়। পূর্ণিমায় মস্তবড় চাঁদ। আদিগন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় জ্যোৎস্নার ঝলকানি। সমুদ্রের হাওয়ায় ভাইকিংরা অনেকেই ডেক-এ এসে শুয়ে বসে থাকে। সারাদিনের কাজ শেষ।

আবার কখনও কখনও সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপও দেখে। ঘন কলো মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ মাথার ওপর ঝলসে ওঠে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের জাহাজের ওপর। শুরু হয় ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে লড়াই। ভাইকিংদের জাহাজের জীবন তো এটাই। এই জীবনই ওদের প্রিয় একান্ত আপন।

এখন কিন্তু ভাইকিংরা বড় চিন্তায় পড়েছে। অনেকদিন হয়ে গেল জাহাজ চলেছে তে চলেছেই। মাটির দেখা নেই। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা ওদের কাছে নতুন কিছু নয়। তবু এই সময় ওরা বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কখনও দল বেঁধে, কখনও একা একা জাহাজের রেলিং ধরে। চারপাশে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যদি পাহাড়ের মাথায় সবুজ গাছগাছালি দেখা যায়। নজরদার পেড্রো অবশ্য মস্তুলের ওপর ওর বসার জায়গায় চারদিকে নজর রেখে চলেছে। তবু ভাইকিংদের মন মানে না। সময় পেলেই ডেক-এ এসে রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। জাহাজে এখন আর নাচ-গানের আসর বসে না। সকলেরই মন খারাপ। শুধু ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিরুদ্বেগ। দুজনে কখনও কখনও ডেক-এ উঠে আসে। বন্ধুরা বেশ চিন্তিত মুখে দুজনের কাছে আসে ফ্রান্সিস হেসে ওদের আশ্বস্ত করে। বলে—সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো তোমাদের কাছে নতুন কিছু তো নয়। সাহস হারিও না। এখনও খাদ্য আর পানীয় জলে তেমন টান পড়েনি। নাচগানের আসর বসাচ্ছো না কেন? সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে বলে— সিনাত্রা—নতুন নতুন গান বাঁধো। গান গাও। মনে কোন দুর্ভাবনাকে কোনরকম প্রশ্রয় দিও না। ফ্রান্সিসের কথায় বন্ধুরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। সিনাত্রা উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে — ভাই সব— নতুন নতুন গান বেঁধেছি। রাতে শোনাবো। বন্ধুদের মধ্যে একটু উৎসাহের সঞ্চার হয়। কেউ কেউ বলে ওঠে — ঠিক আছে। বসাও নাচগানের আসর।

দিন কাটে। বিকেল হয়। পশ্চিম আকাশে রঙের আলোর বন্যা বইয়ে সূর্য অস্ত যায়। সেই সূর্যাস্ত আর কেউ না দেখুক মারিয়া রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখবেই। সেই সূর্যাস্তের দৃশ্য মারিয়ার কাছে প্রতিদিনই নতুন বলে মনে হয়। দেশ থেকে বাবা-মার কাছ থেকে কত দূরে ক্ষুধা তৃষ্ণায় দুর্বল শরীর তবু মারিয়া সূর্যাস্ত দেখতে আসে। এতে মারিয়া যেন মনে খুব শান্তি পায়। ভুলে থাকতে পারে ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট। শরীরের দুর্বলতা।

রাতের খাবার খেয়ে অনেক বন্ধু ডেক-এ উঠে আসে। ডাঙার দেখা নেই। কাজেই ফুরিয়ে আসা খাদ্য জল খাওয়া সবাই কমিয়ে দিয়েছে। ডাঙায় না পৌঁছানো পর্যন্ত — খাদ্য জল না পাওয়া পর্যন্ত বেঁচে তো থাকতে হবে। এটা

জানতে পেরে ফ্রান্সিস হ্যারিও খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। কাউকে না জানিয়ে মারিয়াও খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে।

সেদিন পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। নক্ষত্র ছাওয়া কালো আকাশে উজ্জ্বল প্রায় গোল চাঁদ জ্যোৎস্না ছাড়িয়েছে ডেউয়ের মাথায় অনেক দূর পর্যন্ত। হাওয়া ছুটেছে শন্ শন্। জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল সিনাত্রা। জ্যোৎস্না ধোয়া সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ওর ক্ষুধা তৃষ্ণাকাতর শরীর যেন রোমাঞ্চিত হল। ও চিৎকার করে বলে উঠল — হে পৃথিবী তুমি কী সুন্দর। দুজন চারজন করে অনেকেই ডেক-এ উঠে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিসও হ্যারি আর মারিয়াকে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কো নিয়ে এসেছে একটা খালি পীপে। গান নাচের সঙ্গে তাল দেবে বলে। দাঁড়িয়ে থাকা সিনাত্রার চারপাশে গোল হয়ে বসল সবাই। সিনাত্রা ওর সুরেলা কণ্ঠে গান ধরল—

স্বদেশ তুমি স্বদেশেই থাকো
আমি তো সারা বিশ্বের
এই সাগরই আমার ঘরবাড়ি
এই সাগরই আমার মা
এই মায়ের কোলই আমার শেষ শয্যা।

নাচের গান নয়—টানা বড় সুন্দর সুরের গান। সিনাত্রার সুরেলা কণ্ঠের গান চলল। শাঙ্কো পীপে হাত ঠুকে বাজাতে ভুলে গেল। মারিয়ার চোখে তো জল এসে গেল। হ্যারিও মুখ নিচু করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ঘিরে বসা বন্ধুদেরও মন বিষণ্ণ হল। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকিয়ে নিল। বুঝল সিনাত্রার কণ্ঠের জাদুতে গানটা বড় সুন্দর। কিন্তু এই বিষাদের গান সুর মনকে দুর্বল করে দেয়। ফ্রান্সিস বলে উঠল—সিনাত্রা আনন্দের গান গাও, সুখের গান গাও। জানো তো — দেশের পাহাড়ি এলাকায় যখন বরফ গলে গিয়ে প্রথম কচিকচি সবুজ ঘাস গজিয়ে ওঠে—মেষ পালকেরা নবজীবনের গান গাইতে গাইতে ভেড়ার পাল নিয়ে যায়, সেই আনন্দ উল্লাসের গান গাও। সিনাত্রা হেসে বলল বেশ। আবার সিনাত্রা গান ধরল—

কিন্তু রাজকুমারী নই। তোমাদের মতই একজন। মারিয়া একটু অভিমানের সুরে বলল।

—এটা ভালো করেই জানি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—

মারিয়া—এরকম কথা তোমাকে আগে কোনদিন বলিনি। আজ কেন বললাম জানো—বাবা-মার জন্যে দেশের কথা ভেবে ভেবে এতদিন পরে তোমার মন

অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তাই তোমার মনে সাহস জোগা। ক্ষুধাতে তৃষ্ণার সঙ্গে লড়াই করতে যাতে মনকে শক্ত রাখতে পারো তাই এসব কথা বলা। রাজকুমারী বলে তোমাকে এসব কথা বলিনি। মারিয়া কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল — তুমি আগে থেকে অনেককিছু ভেবে রাখো।

—নইলে আমাদের আর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী বলা হয় কেন। যাক গে—শোন—আমাদের এখন সাবধান হবার সময় হয়েছে। তুমি হ্যারিকে এখানে আসতে বলো। আমি এখন সিঁড়ি দিয়ে বেশি ওঠানামা করতে চাই না। পা দুটোকে যথাসাধ্য বিশ্রাম দিচ্ছি। মারিয়া উঠে হ্যারিকে খবর দিতে চলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হ্যারি এল। বলল—কী হয়েছে ফ্রান্সিস? তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

—স্বাভাবিক। জাহাজে খাদ্যাভাব, জলের অভাব চলছে। কিছুদিনের মত খুব ভেবে চিন্তে আমাদের চলতে হবে।

—এসব তো নতুন কিছু নয়। এই সমস্যা তো এর আগে হয়েছে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। ডাঙায় পৌঁছেতেই হবে। খাদ্য চাই, জল চাই।

—কিন্তু কী করবে? ফ্রেজার তো অভিজ্ঞ হাতেই জাহাজ চালাচ্ছে। পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে দিনরাত নজর রেখে চলেছে। ও না অসুস্থ হয়ে পড়ে।

—আমরাও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। এখন আমরা যাতে আরো কিছুদিন সুস্থ থেকে ডাঙার সন্ধান করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—রাতের খাবার খেয়ে সবাইকে ডেক-এ আসতে বলো। আমার কিছু বলার আছে।

—বেশ বলছি। হ্যারি চলে গেল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ভেন বাদে আর সব ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

মেঘমুক্ত আকাশে অনেক তারার ভিড়। সারাদিন গুমোটের পর জোর হাওয়া ছুটেছে। আধভাঙা চাঁদের আলো পড়েছে সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের মাথায়। সবাই জড়ো হতে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়াও এল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল।—ভাই সব।

আমরা খাদ্য ও পানীয় জলের সমস্যার মুখোমুখি পড়েছি। এরকম সমস্যায় এর আগেও পড়েছি। তখন দেখা গেছে জল কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বুদ্ধি হারিয়ে দু-একজন সমুদ্রের নোনা জল খেয়েছে। তারপরেই যা হওয়ার হয়েছে। বমি করেছে, মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। কষ্ট বেড়েছে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি প্রথমেই সাবধান করে দিচ্ছি—দাঁত চেপে জল তেষ্টা সহ্য করবে। সমুদ্রের নোনা জল খাবে না। এতে খুব কষ্ট হবে। কিন্তু ক্ষুধার সঙ্গে জল তেষ্টার সঙ্গে লড়াই করার বাড়তি শক্তি শরীরে থাকবে। ফ্রান্সিস থামল।

সবাই নিশ্চুপ। শুধু দুরন্ত বাতাসের শন শন শব্দ শোনা যাচ্ছে। সব বন্ধুরা মনেযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের কথা শুনতে লাগল ফ্রান্সিসের ওপর ওদের অগাধ বিশ্বাস। ওরা জানে বিপদের মুখে ফ্রান্সিস কক্ষণো বিচলিত হয় না। বরং আরো বেশি ধীর স্থির হয়। অবশ্য তরোয়ালের লড়াই চালাবার সময় কিন্তু ফ্রান্সিসের অন্য রূপ। দৃঢ় মুখ। চোখে শ্যেন দৃষ্টি। টান টান শরীর। ফ্রান্সিস বলতে লাগল —ভাইসব — জাহাজে অল্প দিনের মধ্যেই ভীষণ খাদ্যাভাব জলের অভাব দেখা দেবে যদি না এর মধ্যে আমরা ডাঙায় পৌঁছে খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারি। তাই বলছি—কাল থেকে যতট পারো কম খাবার খাবে আর কম জল খাবে। অন্তত ডাঙার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত। নজরদার পেড্রো রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে নজর রেখে চলেছে। ডাঙার দেখা আমরা পাবোই। আমরা বীরের জাতি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অসহায়ভাবে মৃত্যু আমরা মেনে নেব না। আমার যা বলার বললাম। আমার বিশ্বাস আমরা আমাদের সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারবো। ফ্রান্সিস থামল। উৎসাহিত বন্ধুরা ওদের সংকল্পের ধ্বনি তুলল ও-হো-হো.... মৃদু স্বরে কথা বলতে বলতে সবাই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগল। শুধু শাঙ্কো বিনেলো আর অন্য দুএকজনকে নিয়ে ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। বৃষ্টি না হলে শাঙ্কো বরাবর ডেক-এ শুয়ে ঘুমোয়। তবে ঘুমের মধ্যেও ও সজাগ থাকে। বলা যায় না — পেড্রোর নজর এড়িয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ওঠা কোন জলদস্যুদের ক্যারাভেল একেবারে কাছে চলে আসতে পারে। বিদেশি লোকরাও নৌকোয় চড়ে এসে ওদের আক্রমণ করতে পারে। সে সময় শাঙ্কোরা চিৎকার করে বন্ধুদের ঘুম ভাঙিয়ে সেই অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিক সঙ্গে নিয়ে জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে এল। বলল— ফ্লেজার দিক ঠিক রেখেই চালাচ্ছে তো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ফ্লেজার মাথা কাত করে বলল।

—জাহাজের গতি কেমন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—দিনের বেলা বাতাস পড়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যের পরই বাতাসের জোর বেড়েছে। এখন গতিবেগ ভালোই।

—জাহাজ উত্তর পশ্চিম দিকে চালাচ্ছো তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমাদের দেশ তো ঐদিকেই। ফ্রেজার বলল।

—কিন্তু ফ্রেজার আমরা পথ হারাই নি তো?

—খুব জোর দিয়ে বলতে পারছি না। কারণ কোন দ্বীপে বা দেশের অংশে না পৌঁছাতে পারলে কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু দ্বিধার সঙ্গে ফ্রেজার বলল?

—কিন্তু আমি বন্ধুদের কী বললাম শুনেছো তো?

—হ্যাঁ। শুনেছি। ফ্রেজার বলল।

—জাহাজে খাদ্য ও জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কাজেই যে করে হোক ডাঙায় আমাদের পৌঁছাতে হবে। সে কোন জঙ্গলেই হোক বা পাহাড়ি এলাকায়ই হোক। জঙ্গলে পৌঁছলে খাবার মত ফলটল পাবো। পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছলে ঝর্ণার জল পাবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—উত্তর পূর্ব নয়—সোজা পূর্ব দিকে জাহাজ চালাও। দেশের দিকে নয়। জাহাজের মুখ ঘোরাও। আগে তো প্রাণে বাঁচি দেশে পৌঁছতে না হয় কিছুদিন দেরিই হোক।

—বেশ। জাহাজের মুখ ঘোরাচ্ছি। ফ্রেজার বলল।

জাহাজ চলল। সব ভাইকিং বন্ধুরা, ফ্রান্সিস মারিয়াও কম খাবার কম জল খেতে লাগল।

দিন যায়। রাত যায়। নজরদার পেড্রোর চোখে ঘুম নেই। বিশ্রাম নেই ওর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুঁজছে গাছপালার আভাস। মাটি পাহাড়। কিন্তু সে সবের দেখা নেই। এক বেলা খাওয়া আর সামান্য জল খাওয়া চলল। সবাই বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। মারিয়া তো খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এইমাত্র খিয়ে এলাম। ফ্রান্সিস আর কিছু বলে না।

সেদিন সূর্যাস্ত দেখবে বলে মারিয়া জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অনেকটা নেমে এসেছে। দক্ষিণ দিকে তাকাতেই মারিয়ার বুক কেঁপে উঠল। দক্ষিণ দিগন্ত থেকে ঘন কালো মেঘ এসেছে। বেশ দ্রুতই উঠে আসছে মাঝ আকাশের দিকে। বাতাস পড়ে গেছে। রোদের তেজ অনেক কমে গেছে। শাঙ্কোর উচ্চস্বর শোনা গেল—ভাই সব, ঝড় আসছে? তৈরি হও। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু হল। কিন্তু সকলেরই শরীর আধপেটা খেয়ে সামান্য জল খেয়ে খেয়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বল শরীর নিয়েই ঝড় বৃষ্টির

সঙ্গে লড়তে হবে। অনেকেই বেশ চিন্তায় পড়ল।

দক্ষিণ আকাশ থেকে ঘন কালো মেঘ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মাঝ-আকাশে উঠে আসতে লাগল। সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। অন্ধকার হয়ে এল আকাশ সমুদ্র। অন্ধকার আকাশ চিরে শুরু হল আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের ঝলকানি। ভাইকিংরা দ্রুত পাল নামিয়ে ফেলল। দাঁড় বাওয়া আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হল। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ওরা লড়তে অভ্যস্ত। ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে সবাই মাস্তুলের পালের কাঠের দড়িদড়া ধরে তৈরি হল। কিন্তু আধপেটা খেয়ে তৃষ্ণায় দুর্বল সবাই। ওদের নির্ভীক মনে একটু সন্দেহের অনুভূতিও জাগল। এই দুর্বল শরীরে কতক্ষণ লড়তে পারবে ঝড়ের সঙ্গে। হ্যারি ছুটে এল শাঙ্কোদের কাছে। চিৎকার করে বলল শাঙ্কো শিগগির নিচে যাও কয়েকজন। তিনটে জলের পীপেই নিয়ে এসো। ডেক-এ রাখো। যতটা সম্ভব বৃষ্টির জল ধরে রাখো। এই সুযোগ কাজে লাগাও। পানীয় জলের সমস্যাটা কিছু দিনের জন্যে মেটানো যাবে। শাঙ্কোরা তিন চারজন ছুটল সিঁড়ির দিকে খালি জলের পীপে আনতে।

দেখতে দেখতে প্রচণ্ড জোরে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজের ওপর। ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে গেল। পরক্ষণেই সোজা হল। শুরু হল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। বিদ্যুতের ঝলকানি আর বাজ পড়ার মুর্হুর্মুহু গম্ভীর ধ্বনি আর মুষলধারে বৃষ্টি। দুর্বল শরীর নিয়েও ভাইকিংরা ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই চালাল। দু'চারজনের দড়িধরা হাতের মুঠি ঝড়ের ঝাপটায় আলগা হয়ে গেল। ছিটকে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে পরক্ষণেই উঠে এসে দড়ি চেপে ধরতে লাগল। ঝড়ের তাণ্ডব চলল।

ভাইকিংদের সৌভাগ্য বলতে হবে ঝড়বৃষ্টি বেশিক্ষণ চলল না। বৃষ্টি আস্তে আস্তে কমে গেল। ঝড়ের ঝাপটার তীব্রতাও কমল। বিদ্যুৎ ঝলকানি আর বজ্রনাদ অবশ্য চলল কিছুক্ষণ।

আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গেল। বিদ্যুতের ঝলকানি বন্ধ হল। বন্ধ হল বজ্রধ্বনি। আকাশ পরিষ্কার হল। পশ্চিম আকাশে ডুবে গেছে সূর্য। কমলা রঙের আভা তখনও লেগে আছে পশ্চিম দিগন্তের কাছে। একটা দুটো করে তারা ফুটতে লাগল।

দুর্বল শরীর নিয়ে অসহ্য ক্লান্তিতে বেশ কয়েকজন ভাইকিং ডেক-এর ওপর শুয়ে রইল। বৃষ্টিতে ভেজা সপ্‌সপে পোশাক গায়ে। শাঙ্কোরা কয়েকজন পীপের কাছে ছুটে এল। দেখল—বেশ বৃষ্টির জল জমেছে পীপে তিনটেতে।

ওদের মুখে হাসি ফুটল। হ্যারি এসে পী.পের জল দেখে বলে উঠল —সাবাস শাঙ্কো। শাঙ্কোরা কয়েকজন পীপে তিনটে কাঁধে নিয়ে সিঁড়ির দিকে চলল। যাক কিছুদিনের জন্যে খাবার জলের সমস্যা মিটল।

জাহাজ চলল। কিন্তু সেই এক ঘেয়েমি সীমাহীন জলরাশি চারদিকে। ডাঙার দেখা নেই। পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় বসে চারদিকে নজর রাখছে। কিন্তু কোথায় ডাঙা? কোথায় মাটি পাহাড় সবুজের ছোঁয়া। পেড্রোকে দুপুরে খাওয়ার সময় ডাকা হয়। রাতে তো খাওয়া বন্ধ। পেড্রো তাড়াতাড়ি নেমে আসে। খেয়ে নিয়েই আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। তৃষ্ণায় জল পাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু খাওয়া তো সামান্য। দুর্বল শরীরেও বড় ক্লান্তি নেমে আসে। দিনের বেলা খেয়ে এসে নিজের ছোট্ট গোল ঘরের জায়গায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। তারপরেই শুরু হয় সারারাত জেগে তীক্ষ্ণ নজরদারি। কিন্তু ডাঙা কোথায়? ডাঙার দেখা নেই।

এদিকে ভাইকিংদের প্রায় না খেয়ে দিন কাটছে। খিদে অসহ্য হয়ে উঠলে ওরা পেট ভরে জল খাচ্ছে। এতে খিদেটা কমছে। ফ্রান্সিস থেকে শুরু করে সবারই এই অবস্থা। কিন্তু ফ্রান্সিস মারিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছে এই বলে—তোমাকে পেট পুরে খেতেই হবে। উপোষ করে থাকা তোমার চলবে না। উপোস করে থাকার অভ্যেস তোমার নেই। তাহলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমাদের বিপদ সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। মারিয়া অবশ্য হেসে বলেছে—না না। আমি দুবেলাই পেট পুরে খাচ্ছি। তুমি আমার জন্য ভেবো না। কিন্তু মারিয়া আধ পেটা তো খাচ্ছেই না। মাঝে মাঝে না খেয়েও দু'তিন দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। দুপুরে রাতে খাওয়ার সময় কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে ডেক-এ উঠে আসে। সময় কাটায়। তারপর কেবিন ঘরে এসে ঢোকে। ফ্রান্সিস একই দুর্বলস্বরে জিজ্ঞেস করে খেয়ে এসেছো তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো খেয়ে এলাম। হ্যারি কিন্তু মারিয়ার এই ফাঁকি একদিন ধরে ফেলল। যেটুকু খাবার জুটেছে তা খাবার সময় খাবার ঘরে ও মারিয়াকে দেখতে পাচ্ছিল না। দুদিন আগে হ্যারি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে নিঃশব্দে ডেক-এ উঠে এসেছিল। দেখল মারিয়া রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি কোন কথা না বলে নিঃশব্দে নেমে এল। পরিষ্কার বুঝতে পারল রাজকুমারী মাঝে মাঝে উপোষ করে থাকছে। এটা ফ্রান্সিসকে বুঝতেও দিচ্ছে না। কারণ তাহলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফ্রান্সিসের উদ্বেগ বাড়বে। ফ্রান্সিসের ক্ষতি হবে।

সেদিন দুপুরে মারিয়া কেবিন ঘরে ঢুকতে ফ্রান্সিস যে সামান্য খাবার খাচ্ছিল তাই খেতে খেতে বলল—

—কী খেয়ে এলে?

—হ্যাঁ। মারিয়া মাথা কাত করে বলল।

—ভালো করে খেয়েছো তো? ফ্রান্সিস তবু বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মারিয়া মৃদু হেসে বলল।

—এবার শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম করো। ঘুমোও। মারিয়া শুয়ে পড়ল। না খেয়ে থাকতে থাকতে খিদের বোধটাই যেন নেই আর। কোনদিন তো খিদে কাকে বলে ও জানতো না। ক্ষুধার্ত মানুষের ঘুম আসতে চায় না। এই সত্যটা মারিয়া এবার জানতে পারল। সত্যি। ক্ষুধার্ত মানুষেরা ঘুমিয়ে একটু শান্তি পাবে তারও উপায় নেই। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়েছিল। একই কারণে ওরও ঘুম আসছিল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে মারিয়া উঠে পড়ল। বলল—বড্ড গরম লাগছে। একটু ডেক-এ হাওয়া খেয়ে আসি। মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস অবশ্য সিঁড়ি দিয়ে বেশি ওঠানাম করে না। শুয়ে থাকে।

ডেক-এ উঠে এসে মারিয়া দেখল আকাশ মেঘ শূন্য। শেষ বিকেলে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অনেকটা নেমে এসেছে। অস্ত যেতে খুব বেশি দেরি নেই। আকাশে রোদ উজ্জ্বল। চারপাশে সমুদ্রের জলের মাথায় রোদের ঝিকিমিকি। তখনই কানে এল মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রোর চিৎকার ভাই সব ডাঙা ডাঙা দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে। ক্ষুধার্ত ভাইকিংদের কারো চোখে ঘুম নেই। কেবিনঘরে ডেক-এর ওপরে শুয়ে ছিল সবাই। ফ্লেজার নিঃশব্দে জাহাজের হুইল ধরে ছিল। পেড্রোর চিৎকার করে বলা কথা অনেকের কানেই গেল। ডেক-এ শুয়ে থাকা মাস্তুলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকা শাঙ্কোরা কেবিন ঘর থেকে অন্য বন্ধুরা ছুটে এসে ডেক-এ জড়ো হল। রেলিং ধরে দাঁড়াল। বিকেলের আলোয় মারিয়া আর অন্য বন্ধুরা দেখল ডানদিকে—তীর ভূমি। একটা কালো রঙের টিলা মাথা উঁচিয়ে আছে। তার নিচে বিস্তৃত সবুজ বনভূমি। উঁচু উঁচু গাছ ঝোপ ঝাড়। ফ্লেজার জাহাজের তীরভূমির দিকে চালাতে লাগল। হ্যারি শাঙ্কোকে ডেকে বলল—যাও ফ্রান্সিসকে খবর দাও। উপবাস ক্লিষ্ট মানুষগুলোর মধ্যে যেন নবজীবনের সঞ্চার হল। যাক খাদ্য জল তো পাওয়া যাবে।

জঙ্গলা জায়গাটার পরেই দেখা গেল বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ঢালু হয়ে সমুদ্রের তীরে নেমে এসেছে। একটা ছোট বন্দর মত। একটা ছোট জাহাজ নোঙর করা আছে। বালিয়াড়ির পরেই দুধারে পাথরের কাঠের শুকনো ঘাসপাতার ছাউনি নিয়ে সারি দিয়ে কিছু বাড়ি ঘর। ফেরি জাহাজ চালাতে চালাতে ফ্লেজার

সমুদ্রের জলের গভীরতা আন্দাজ করে বুঝল এখানে তীর ভূমিতে জাহাজ ভেড়ানো যাবে। কিন্তু ফ্রান্সিস আজও ডেক-এ উঠে আসে নি। ফ্রান্সিস আসুক। ফ্লেজার আস্তে আস্তে জাহাজ থামাল।

তখন ফ্রান্সিস সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। রেলিং ধরে দাঁড়ানো মারিয়া হ্যারিদের ভিড়ের কাছে এল ও। ফ্রান্সিসকে দেখে হ্যারি তাড়াতাড়ি ওর কাছে ছুটে এল। বলল— কী করবে?

—দাড়াও। আগে সব দেখি টেখি। ফ্লেজারের কাছে চলো। দুজনে ফ্লেজারের কাছে এল।

—ফ্লেজার কী মনে হয়? এখানে জাহাজ ভেড়ানো যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় যাবে। একটা জাহাজও নোঙর বাঁধা দেখছি। তার মানে এখানে জাহাজ ভেড়ানো হয়। একটা ছোট খাটো বন্দরই বলা যায়। ফ্লেজার বলল।

—ঠিক আছে। এখনই ভিড়িও না। ভালো করে আগে সব দেখি। দুজনে রেলিং এর কাছে এল। রেলিং ধরে দাঁড়াল। শেষ বিকেলের আলোয় দেখা গেল বেশ কয়েকটা দেশীয় নৌকাও বাঁধা আছে ঘাটে। তীরে ওখান থেকেই বালি ভরা পথ মত চলে গেছে বাড়ি ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে পশ্চিম মুখো। কিছু লোকজন দেখা গেল—কিছু দূরে বালি ভরা রাস্তায় তাদের হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। বোঝা গেল সাধারণ মানুষ যোদ্ধা নয়।

—এখন নামবে? হ্যারি ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

—না। জাহাজ ঘাটের চেয়ে একটু দূরেই থাকুক। সন্ধ্যে হতে বেশি দেরি নেই। আমরা তৈরি হয়ে নামতে নামতে সন্ধ্যা হয়ে যাব। অন্ধকার নেমে আসবে। অজানা অচেনা জায়গা। কোন দ্বীপ না দেশের অংশ তাও জানি না। কী ধরনের লোক এরা জানি না। সকালে নেমে গিয়ে কথা বলা যাবে। তখন জানা যাবে এটা কোন দ্বীপ বা কোন দেশের অংশ কিনা। কোন যোদ্ধাটোদ্ধা তো দেখা গেল না। তবু সাবধান থাকা ভালো। একটা জায়গা যখন তখন নিশ্চয়ই রাজাটাজা নয় তো কোন উপজাতির সর্দার গোছের কেউ আছে।

—তাহলে কাল সকালে নামবে। হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—কিন্তু ফ্রান্সিস—বলছিলাম—ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে কত দিন কাটছে আমাদের তার তো হিসেব নেই। আমাদের কথা ছেড়ে দাও। রাজকুমারীও যে কতদিন না খেয়ে আছেন তুমি তা জানো না। হ্যারির কথা শেষ হতেই মারিয়া চমকে

উঠে বলল—হ্যারি।

—একবার ভালো করে রাজকুমারীর শুকনো রোগার্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখ। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যারি কী বলছো সব? ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস এবার মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। সত্যিই রাজকুমারীর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। চোখের নিচে বেশ কালচে ভাব। ফ্রান্সিস একটু ক্ষুব্ধস্বরে বলল—তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছো। হ্যারি বিব্রত হল। বলে উঠল—

—ফ্রান্সিস মাননীয়া রাজকুমারী কক্ষণো মিথ্যে কথা বলেন না। কিন্তু তুমি যাতে উদ্বিগ্ন না হও তুমি যাতে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকো তাই তিনি তোমাকে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়েছেন। রাজকুমারীর কোন দোষ নেই।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। হ্যারি বলল—তাই বলছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের অন্তত কয়েকদিনের মত খাদ্য জল সংগ্রহ করতে হবে। বলা যায় না এখন আমরা যদি হঠাৎ আক্রান্ত হই এত দুর্বল শরীর নিয়ে আমার সর্বশক্তি দিয়ে তরোয়াল চালাতে পারবো না।

—ঠিক আছে। বলো কী করতে চাও। ফ্রান্সিস শান্তভাবে বলল। যতখানি খাদ্য জল সংগ্রহ করা সম্ভব আজকে সন্ধ্যের মধ্যেই তা এখান থেকে জোগাড় করতে হবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। তবে দু'তিনজন নয়। শাঙ্কো একা যাবে। আমাদের নৌকায় চড়ে। যতটা পারে খাদ্য নিয়ে আসবে। জল যা আছে আরো কয়েকদিন চলে যাবে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল।

—আমি একাই যাবো। কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে আসবো। শাঙ্কো বলল।

—তোমার উপর সেই বিশ্বাস আছে আমার শাঙ্কোর। ফ্রান্সিস বলল।

ভিড় ভেঙে গেল সবাই চলে এল। দু'একজনের সঙ্গে শাঙ্কো রেলিং ধরে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দূরের লোকজন দেখতে লাগল। দেখল ঐ লোকজনদের মাথার চুল লম্বা। উঁচু করে চুড়ো বাঁধা। কয়েকজনকে দেখল খালি গা। গলায় ঝুলছে লাল সূতোর মোটা মালা মত। পরনে মোটা কাপড়ে নানারঙের সূতো দিয়ে ফুল পাতা তোলা। প্রায় ঐ রকম লম্বা চুল উঁচু করে চূড়োর মত বাঁধা। শাঙ্কো মাথা নিচু করে ছক ভেবে নিল। তারপর দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে নেমে এল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে ছিল। মারিয়া মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলছিল। দুজনেই শাঙ্কোর দিকে তাকাল।

শাঙ্কো বলল রাজকুমারী আপনার ফুলপাতা আঁকা একটা গাউন আছে না? মারিয়া অবাক। বলল—হ্যাঁ তো। ওটা কোমরের কাছে কাটুন আর নিচের নীল কাপড়ের ঝালরটা কেটে ফেলুন। মারিয়ার বিস্ময় আরো বাড়ল। কিন্তু মারিয়া কিছু বলার আগেই শাঙ্কো বলল পরে সব বলবো। আমি আসছি।

—কিন্তু আমি তো এখন সূর্যাস্ত দেখতে যাবো। মারিয়া বলল।

—আজকে না হয় নাই গেলেন। কাজটা সেরে রাখুন। তাড়াতাড়ি সারতে হবে সব। শাঙ্কো দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

কিছু পরে শাঙ্কো দু'টো বস্তা নিয়ে ফিরে এল।

দেখল রাজকুমারী সেই গাউনটা বের করে কাঁচি দিয়ে কাটছে। ফ্রান্সিস বলল—উঁহুঁ। শাঙ্কো একটা বস্তা নিয়ে যাও। দুটো বস্তা কাঁধে নিয়ে দ্রুত ছুটতে পারবে না। আর বিপদ আঁচ করলেই সব ফেলে পালিয়ে আসবে।

—কিন্তু আটা চিনি তো আনতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—না আনতে পারলেও আর কয়েক দিন না খেলে মরে যাবো না। কিন্তু তোমার জীবনের মূল্য আমার কাছে অনেক। একটা বস্তাই নিয়ে যাও। চিনি পেলে যতটা পারো আটার সঙ্গেই মিশিয়ে নিয়ে আসবে।

—বেশ। তোমার কথার অবাধ্য হবো কী করে। ততক্ষণে মারিয়ার পোশাক কাটা হয়ে গেছে। টানা কাটায় মারিয়ার অভিজ্ঞ হাত। সেই বিচিত্র পোশাকটা নিয়ে শাঙ্কো চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে খালি পায়ে ঐ বিচিত্র পোশাকটা পরে শাঙ্কো এল। মারিয়া তাই দেখে না হেসে পারলে না। এবার শাঙ্কো বলল রাজকুমারী— এবার আমার মাথার চুল চুড়ো করে বেঁধে দিন। শাঙ্কোর চুল বেশ বড় বড়। জাহাজের জীবন। নিয়মিত তো চুল দাড়ি কাটা হয় না। মারিয়া আজও কিছু বুঝে উঠতে পারল না। হাসি মুখে শাঙ্কোকে বসিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে চুড়ো করে বেঁধে দিল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াতে ঐ চুড়ো করে বাঁধা চুল আর ঐ বিচিত্র পোশাক খালি গা দেখে মারিয়া মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিসও হাসি না চাপতে পেরে হেসে উঠল।

—এবার আপনার মাথার চুল বাধার মোটা লাল ফিতে থাকলে দিন। মারিয়া হাসতে হাসতে ওর চামড়ার ঝোলা থেকে একটা লাল রঙের ফিতে বের করে দিল। শাঙ্কো গিট দিয়ে ওটা গলায় ঝোলালো। মারিয়া আবার হেসে

উঠল। মারিয়াকে হাসতে দেখে ফ্রান্সিসের খুব ভালো লাগল। মারিয়া খুব খুশি হলে ঐ রকম খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—শাঙ্কোর এরকম অদ্ভুত সাজে সাজার কারণ আছে। শাঙ্কো খুব বুদ্ধিমান। শাঙ্কো হেসে বলল—রাজকুমারী —তীরে কয়েকজন মানুষকে এরকম পোশাক পরে চলাফেরা করতে দেখেছি। এই পোশাকে তাদের সঙ্গে মিশে গেলে অনেক সহজে কার্যোদ্ধার করতে পারবো চলি।

শাঙ্কো ডেক-এর উঠে এল। ওর বন্ধুরা ওকে এই পোশাকে মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল দেখে হেসে গড়াগড়ি। শাঙ্কো গম্ভীর মুখে দড়ির মই বেয়ে ওদের বাঁধা নৌকোটায় নেমে এল। দড়ির বাঁধন খুলে দাঁড় তুলে নিল। নৌকো চালাল তীর- ভূমির দিকে তখন সূর্য অস্ত গেছে। তবে অন্ধকার খুব গাঢ় হয়নি। নৌকো তীরে ভিড়ল। শাঙ্কো নৌকোটা টেনে তীরের বালির ওপর তুলে রাখল জোয়ার এলেও ভেসে যাবার আশঙ্কা রইল না।

তারপর আবছা অন্ধকারে বালির ওপর দিয়ে আস্তে হেঁটে চলল ঘরবাড়িগুলোর দিকে। কাঁধে নিল বস্তাটা। বস্তা মত কিছু কয়েকজনের কাঁধে দেখেছিল। কয়েকটা দোকান মত পেল। মোটা সুতোয় বোনা কাপড়-টাপড়ের দোকান। মাটির দুচার রকম পাত্রের দোকান। এ সব পার হয়ে দেখল একটা বড় মোটা হলুদ সুতোয় তৈরি বস্তা রাখা একটা দোকান। সব দোকানের সামনেই ততক্ষণে ছোট মশাল মত জ্বালা হয়েছে। কিছু দোকান বন্ধও দেখল। সেই বস্তা রাখা দোকানে গিয়ে শাঙ্কো দেখল বস্তায় আটা ময়দা আর ছোট ছোট দানামত কিছু রাখা। ওসব সেদ্ধ করে খাওয়া হয়। শাঙ্কোকে কারো বিদেশী বলে মনেই হল না। ওর মুখ আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। শাঙ্কো গাঁট থেকে দুটো সোনার চাকতি চুল চুড়ো করে বাঁধা দোকানিকে দেখাল। তারপর সোনার চাকতি দেখে দোকানি খুব খুশী। হাত বাড়িয়ে সোনার চাকতিটা নিল। তারপর একটা কাঠের পাত্র দিয়ে মেপেমেপে শাঙ্কো মেলে ধরা বস্তায় আটা চিনি ঢেলে নিল। এবার শাঙ্কো আঙ্গুল দিয়ে দানা মত জিনিসটার বস্তা দেখাল। দোকানি হেসে সে সব এক পাত্র দিল। শাঙ্কো সব নিয়ে বস্তাটা কাঁধে তুলতেই একজন ওদেশীয় লোক অদ্ভুত ভাষায় শাঙ্কোকে কিছু জিজ্ঞেস করল। শাঙ্কো হেসে মুখের সামনে আঙুল ছোঁয়ালো। অর্থাৎ ও বোবা। শাঙ্কো আর দাঁড়ালে না। বালি ভরা রাস্তায় নেমে এল। ওপাশে তাকাতেই দেখল একটা বুড়ো পাঁচ ছটা বড় বড় বুনো মুরগী নিয়ে বসে আছে।

কতদিন পেট পুরে মাংস খাওয়া হয় না। শাঙ্কো বুড়োটার কাছে গেল। মুরগী গুলোর পায়ে দঁড়ি বাঁধা। শাঙ্কো বুঝল। সব কটা মুরগী নেওয়া যাবে না। ও আবার গাঁট থেকে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করে বুড়োকে দিল। বুড়ো ঝুঁকে পড়ে ঐ চাকতি সোনার বুঝতে পেরে মুখ তুলে ফোকলা মুখে হাসল। শাঙ্কো বস্তা নামিয়ে চারটে মুরগীর পাগুলো দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর বস্তা কাঁধে তুলে নিয়ে দঁড়ি বাধা মুরগীগুলো ঝুলিয়ে সমুদ্রের দিকে চলল। শুরু হল মুরগীগুলোর কোকরকোঁ ডাক। শাঙ্কো নির্বিঘ্নেতে সমুদ্র তীরে পৌঁছল। আবছা অন্ধকারে দেখল নোঙর করা জাহাজটা জনশূন্য। ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে। নৌকো টেনে জলে নামিয়ে বস্তা মুরগীগুলো রাখল। তারপর দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকো চালাল। কয়েকজন ডেক-এ ছিল তারা মুরগীর ডাক শুনল। তাড়াতাড়ি সেই কজন ছুটে এল। নৌকো বেঁধে শাঙ্কো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এর কাছে উঠে এল। বন্ধুরা ধরাধরি করে বস্তাটা নামল। মুরগীগুলো নিয়ে ছুটল সিড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইকিংদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শাঙ্কো খাবার দাবার তো এনেছেই সঙ্গে বড় বড় চারটে বুনো মুরগীও এনেছে।

রাতে পেট ভরে খেল সবাই। আটা চিনি আর ঐ দানাগুলো মিশিয়ে যে খাবার রাঁধুনি বন্ধু তৈরি করল তার স্বাদই হল আলাদা। রাঁধুনি বন্ধুটির খুব প্রশংসা করল সবাই। কতদিন পরে পেট ভরে খেল সবাই।

রাতে রান্না করা খাবার কাঠের থালায় করে রাধুনি ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—রাজকুমারীর খাবারও এখানে দিয়ে যাও। ওকে আমার সামনে খেতে হবে। রাঁধুনি মারিয়ার খাবারও দিয়ে গেল। মাংস অবশ্য দু টুকরোর বেশি কেউ পেল না। তবু সুস্বাদু রান্না। খাওয়া শেষ করে মারিয়া বলল—যাই আরো দুটো মোটা রুটি নিয়ে আসি।

—যদি বাড়তি থাকে তবেই এনো। ফ্রান্সিস বলল।

রুটি দুটো খাওয়া হলে মারিয়া বলল—রাঁধুনি বন্ধুর রান্নার হাত এত ভালো যে এই অদ্ভুত রান্নাও কী সুস্বাদু হয়েছে।

—তা ঠিক। তবে খিদের মুখে রান্না করা সব কিছুরই স্বাদ বেড়ে যায়। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল। তখনই হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল হ্যারি পেট ভরে খেয়েছো তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। শাঙ্কো সত্যিই বুদ্ধিমান। হ্যারি হেসে বলল।

—আমি সেটা ভালো করে জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—এই পাঁচ মিশেলি রান্না আমার তো কেকেএর মত খেতে লাগল। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই হেসে উঠল। মারিয়া একটু মনক্ষুণ্ণ হয়ে বলল—যা প্রশংসার আমি নির্দ্বিধায় তার প্রশংসা করে থাকি।

—মাননীয় রাজকুমারী আমাদের মাপ করবেন। হ্যারি বলল।

—যাক গে — ফ্রান্সিস বলল— হ্যারি এই সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। এখানকার অধিবাসী কারো সঙ্গে আমাদের একটা কথাও হয়নি কাজেই রাতের অন্ধকারে ওরা যদি দল বেঁধে আমাদের জাহাজে আক্রমণ করে আমরা বিপদে পড়বো। কাজে নজরদার পেড্রোকে বলো গে—ও যেন সজাগ থাকে।

—পেড্রোর ওপর ভরসা রাখো। হ্যারি হেসে বলল।

— ভরসা তো রাখতেই চাই। কিন্তু আগে দু-তিনবার ও আমাদের সাংঘাতিক বিপদে ফেলেছিল।

—তা ঠিক। যা হোক —অনেকদিন পরে পেট ভরে খেয়ে সত্যিই আজ শরীরটা অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল হ্যারি—দেখবে আজ রাতে ঘুমও ভালো হবে। ক্ষুধার্ত মানুষের ঘুম আসতে চায় না। তন্দ্রামত আসে। ক্ষুধা মানুষকে কী অস্থির করে তোলে কী দুর্বল করে শরীরে যেন সাড় থাকে না, — এটা যার অভিজ্ঞতা নেই সে কিছু বুঝবে না। আমার তো মনে হয়—মানুষের ক্ষুধার অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। কয়েকদিন হলেও। তাহলেই সে ক্ষুধার্ত মানুষকে ঠিক বুঝতে পারবে। তখন আমরা সবাই কাছাকাছি আসতে পারবো। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবো। সব মানুষকে ভালোবাসতে পারবো। উপলব্ধি করতে পারবো সবার দুঃখ বেদনা। ফ্রান্সিস তুমি এসব ভাবো? একটু অবাক হয়ে হ্যারি বলল।

—ভাবি বৈ কি। কত দেশ দ্বীপ তো ঘুরলাম, কত রাজা সুলতানকে তো দেখলাম। আবার দুঃখী অজ্ঞানী মানুষও দেখেছি। ক্ষুধার্ত মানুষও দেখেছি। মনের মধ্যে কোথাও তাদের কথা ঠাঁই নিয়েছিল। তাই মানুষের ক্ষুধার কথা উঠতেই সেই সব অভিজ্ঞতা ভিড় করে এল। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—কিন্তু সত্যিই তো ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা দূর করার সাধ্য আমাদের কতটুকু? হ্যারি বলল।

—যতটা পারি। নইলে আমরা আর মানুষ কীসে। ফ্রান্সিস বলল। একটু চুপ করে থেকে বলল—ফ্রান্সিস তুমি শুধু দুঃসাহসী অভিযাত্রীই নও অনেক কিছু ভাবো তুমি। যাকগে রাত বাড়ছে। চলি। হ্যারি চলে গেল। মারিয়া এতক্ষণ ফ্রান্সিসের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল। হ্যারি চলে গেলে

বলল—ফ্রান্সিস তুমি অনেককিছু ভাবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঘুমিয়ে পড়ো। দেখবে আজ রাতে কী নিটোল ঘুম হয়। সকালে নিজেকে মনে হবে যেন অন্য মানুষ। পরিতৃপ্ত সুখী—কোন ক্লান্তি নেই শরীরে।

কতদিন পরে ভাইকিংরা পেট ভরে খেতে পেল। সারারাত গভীর ঘুমে কাটল। শুধু নজরদার পেড্রোর চোখে ঘুম নেই। তীর ভূমির দিকে তো বটেই সমুদ্রের দিকেও আধভাঙা চাঁদের ম্লান আলোর মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে থেকে রাত কাটল পেড্রোর। নির্বিঘ্নেই কাটল রাতটা। এখানকার অধিবাসীরাও জাহাজে আক্রমণ চালাল না। ওদিকে সমুদ্রের দিক থেকেও কোন আক্রমণ হল না।

ভোর হল। ঘুম ভেঙে ফ্রান্সিসের প্রথম চিন্তাই হল তীরে নামতে হবে। জানতে হবে কোথায় এলাম। এখানকার লোকেরাই বা কেমন। সবচেয়ে বড় কাজ যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় জল সংগ্রহ করা। সকালের জলখাবার খেয়েই ও শাঙ্কো আর বিনেলোকে ডেকে পাঠাল মারিয়াকে দিয়ে। শাঙ্কো আর বিনেলো এল। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা তৈরী হয়ে এসো। তীরে নামবো। সব খোঁজ খবর নিতে হবে।

—তরোয়াল নিয়ে যাবো? শাঙ্কো বলল।

—না। আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। খোঁজ খবর করতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আমি তো বেশি খাদ্য আনতে পারিনি। জল তো ফুরিয়ে এসেছে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ জানি। কিন্তু এখনই আমরা বস্তা পীপে নিয়ে যাবো না। এখনও তো জানি না কাদের মধ্যে কী অবস্থায় গিয়ে আমরা পড়বো। বিপদের আশঙ্কা নেই বুঝলে তখন খাদ্য জলের জন্যে যাবো। যাও। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কোরা চলে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। দেখল আকাশ পরিষ্কার। চারদিক উজ্জ্বল রোদে ভেসে যাচ্ছে। শাঙ্কো আর বিনেলো তৈরী হয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল। আমি যাবো?

—না হ্যারি। তিনজনই ভালো। বিপদে পড়লে সুযোগ বুঝে পালাতে সুবিধে হবে। তরোয়াল তো নিয়ে যাচ্ছি না। লড়াই-টড়াইয়ে কোন ভাবে জড়াবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু ফ্রান্সিস —জীবন বিপন্ন হলে? হ্যারি আশঙ্কা প্রকাশ করল।

—তখন আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করতে হবে। কিন্তু এখন অস্ত্রশস্ত্র না

নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে এল।

ফ্লেজার হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

— ফ্লেজার —জাহাজ তীরে ভেড়াও। আমরা নামবো। ফ্লেজার গিয়ে হুইল ধরল। আস্তে আস্তে জাহাজটা চালিয়ে তীরে ভেড়াল। শাঙ্কো আর বিনেলো ধরে ধরে কাঠের লম্বা পাটাতনটা তীরের বালিভরা মাটিতে নামাল। পাটাতন দিয়ে তিনজনে তীরে নামল।

সামনেই বালিয়াড়ি এলাকা। তিনজনে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। বালিতে পা বসে যায়। আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছিল। রোদের তাপ তখনও বাড়েনি। হাওয়ার তোড়ে কিছু ধুলো বালি উড়ছিল। কিছুদূর যেতে দেখল বাড়ি ঘরদোর শুরু হয়েছে। দু পাশে মাঝখান দিয়ে বালি ভর্তি বাস্তু মত চলে গেছে পশ্চিমমুখো। এখানে স্থানীয় লোকজনের ভিড়। দোকানে দোকানে কেনাকাটা চলছে। বোঝা গেল এইটা বাজার এলাকা। স্থানীয় লোকজনের মাথায় লম্বা লম্বা চুল। চূড়ো করে বাঁধা। ঢোলা হাতা নানা রঙের সূতো দিয়ে ফুলপাতা তোলা ঢোলা হাতা পোশাক। কিছু লোকের গায়ে কিছু নেই। গলায় মোটা সূতোর মালার মত। এখন শাঙ্কোর গায়ে জাহাজী পোশাক বাজারের লোকজন অনেকেই বেশ অবাক চোখে বিদেশি পোশাক পরা ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বুঝল না এরা কোথা থেকে এসেছে। কেনই বা এসেছে।

—শাঙ্কো— আটা চিনির দোকান কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—চলো দেখাচ্ছি। আটা চিনির দোকানের সামনে এল ওরা।

—ঠিক আছে। এবার জল কোথায় পাওয়া যায় দেখি চলো। কিছুটা এগোতে দেখল একটা লোক দুটো ভেড়া খুঁটিতে বেঁধে রাস্তার পাশে বসে আছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে লোকটার কাছে গেল। কিনতে হবে ভেড়া দুটো। শাঙ্কোকে বলল—ছোট্ট চাকতি আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। শাঙ্কো কোমরের গাঁট থেকে দেখে দেখে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করল। লোকটা সোনার চাকতি দেখে খুব খুশি। বিদেশি লোকগুলো ভাল দাম দেবে। তখনই শাঙ্কো চাপাস্বরে বলে উঠল —ফ্রান্সিস ডানদিকে দেখ। ফ্রান্সিস আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তিনজন যোদ্ধা ঘোড়ায় চেপে এদিকেই আসছে। বোধ হয় টহল দিতে বেরিয়েছে। যোদ্ধাদের গায়ে আটোসাঁটো সবুজ রঙের মোটা কাপড়ের পোশাক। বেশ ভারিকির ভঙ্গি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—ওদের দিকে তাকিও না। ফ্রান্সিস ভেড়াওয়ালার সঙ্গে

সোনার চাকতি দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে দামের ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু ওদের গয়ে বিদেশি পোশাক। যোদ্ধাদের সজাগ দৃষ্টি ওরা এড়াতে পারল না। এগিয়ে এসে ওদের দলপতি গোছের দাঁড়িগোঁফওয়ালা যোদ্ধাটি ঘোড়ায় বসেই ঐ দেশী ভাষায় কি জিজ্ঞেস করল ফ্রান্সিসরা কথাটা কানেই তুলল না। শাঙ্কো কথাটা আন্দাজে বুঝে নিয়ে বলল—আমরা ভাইকিংদের দেশ থেকে এসেছি। শাঙ্কো স্থানিয় ভাষায় কথাটা বলল। দলনেতা এবার ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল তোরা কেন এসেছিস? ফ্রান্সিস মুখ ঘুরিয়ে বলল—বেড়াতে। তারপর বেশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা ভেড়ার গলায় বাধা দড়ি খুলতে লাগল। এই উপেক্ষাটা দলপতির সহ্য হল না। ওকে সকলে সমীহ করে ভয় করে আর এই বিদেশি ভূতটা ওর দিকে তাকাচ্ছেই না? হেঁকে বলল—অ্যাই আমার দিকে তাকিয়ে বল। ফ্রান্সিস তাকাল না। ক্ষেপে গিয়ে যোদ্ধাটা কোমরের খাপ থেকে দ্রুত তরোয়ালটা খুলল। তরোয়ালের ডগাটা ফ্রান্সিসের কাঁধের কাছে চেপে এক টান দিল। পোশাক কেটে গেল। একটু কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। রক্ত দেখে ফ্রান্সিসের মাথায় রাগ চড়ে গেল। শাঙ্কো ফ্রান্সিস বুঝল সেটা। বাধা দেবার আগেই লাফিয়ে ফ্রান্সিস উঠে দলপতির তরোয়াল ধরা হাতে জোর করে কামড়ে ধরল। এরকম হতে পারে দলপতি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নি। সঙ্গের যোদ্ধা দুজনও অবাক। ওরা এই কাণ্ড দেখে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো চাপাস্বরে ডাকল — ফ্রান্সিস। ফান্সিস কামড় ছেড়ে দিল। কামড়ে দলপতির হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। হাত থেকে তরোয়াল খসে নিচের বালিতে পড়ল। দলপতি ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে ক্ষতস্থান চেপে ধরল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে নিচু হ'য়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর মাথা নিচু করে ঘোড়াটার পেটে জড়িয়ে বাধা আসনের মোটা দড়িটায় তরোয়াল চালাল। দড়িটা কেটে গেল। ঘোড়াটার পেটটাও বেশ কিছুটা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চিঁহি চিঁহি ডেকে উঠে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আসনসুদ্ধ দলপতি নিচে বালির ওপর গড়িয়ে পড়ল। চোখের নিমেষে এত ঘটনা ঘটে গেল। আহত ঘোড়া ছুট লাগাল। সঙ্গী যোদ্ধা দুজন হতবাক হয়ে দেখছিল এসব। ওরা এবার তৎপর হল। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসেই খাপ থেকে তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে গেল। ওদের আক্রমণ করার আগেই ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল দুজনের সঙ্গে একজনের লড়াই। ফ্রান্সিস এগিয়ে পিছিয়ে নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে

লাগল। দুই যোদ্ধাই ফ্রান্সিসের তরোয়ালের আচমকা মার ঠেকাতে ঠেকাতে বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। ফ্রান্সিসের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই করা দুঃসাধ্য। ওদিকে দলপতি আহত হাত কোমরের কাপড়ের ফেট্টি খুলে বাঁধতে বাঁধতে এই লড়াই দেখতে লাগল। এবার শাঙ্কো লক্ষ্য করল ফ্রান্সিস সেই আগের মত বিদ্যুৎগতিতে এদিক ওদিক সরে গিয়ে লড়াই চালাতে পারছে না। কারণটা বোঝাই যাচ্ছে। ফ্রান্সিসের বাঁ পায়ের দুর্বলতা, শাঙ্কো বিনোলার দিকে তাকিয়ে সখেদে বলল ঈস্—তরোয়ালটা আনতে হত। ও উদ্বিগ্ন স্বরে গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস—আমাকে তরোয়ালটা দাও। দুটোকেই নিকেশ করবো। —না তাহলে আরো বিপদে পড়বো। ফ্রান্সিস হাত থেকে তরোয়াল ফেলে দিয়ে দুহাত তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—লড়াই নয়। শাঙ্কো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস—যে কোনদিন তরোয়ালের লড়াইয়ে কারো কাছে হার স্বীকার করেনি যার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কত ধুরন্দর লড়াইয়ে হয় মারা গেছে নয় তো মাথা নিচু করে হার স্বীকার করেছে। সেই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। ফ্রান্সিস আজ হার স্বীকার করল। দঃখে বেদনায় শাঙ্কোর দু'চোখ জল ভিজে গেল। যোদ্ধা দুজন তরোয়াল নামিয়ে তখন হাঁপাচ্ছিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে শাঙ্কোর মনের অবস্থা বুঝতে পারল। অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে মৃদুস্বরে ফ্রান্সিস বলল শাঙ্কো আমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নই। অনর্থক ঝুঁকি নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ওদিকে দলপতি তখন এগিয়ে এল। ফ্রানিসের ফেলে দেওয়া তরোয়ালটা তুলে নিয়ে খাপে ভরতে ভরতে দাঁত চেপে বলল—তোকে কয়েদখানায় ঢোকাবার ব্যবস্থা করছি। চল্। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না। দলপতি যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল, নিয়ে চল সব কটাকে। ফ্রান্সিসের তরোয়ালের ঘা খাওয়া ঘোড়াটার লাগাম ধরে নিয়ে এল। কেউ ঘোড়ায় উঠল না। দলপতি ধমকের সুরে বলল—চল্ বিদেশি ভূতের দল। মজা দেখাচ্ছি।

সামনে ফ্রান্সিসরা পেছনে ঘোড়ার লাগাম ধরে সবাই পশ্চিমমুখো চলল। হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো মৃদুস্বরে বল ফ্রান্সিস—বড্ড রেগে গিয়েছিলে।

—তুই তুই করছিল। মেজাজ ঠিক থাকে? ফ্রান্সিসও মৃদু স্বরে বলল দুধারে ছাড়া ছাড়া বাড়ি ঘর। পাথর কাঠের। ঘাসপাতার ছাউনি। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে মেয়ে পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চা অনেকেই অপরিচিত পোশাকপরা ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। এটা বুঝল যে এই বিদেশিরা নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছে। দলপতি এদের তাই রাজা জোস্তাকের রাজদরবারে বিচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সবাই যেন

আমাকে তরোয়ালটা দাও। দুটোকেই নিকেশ করবো।

কিছুটা ভীত। রাজা জোস্তাকের পাল্লায় যখন পড়েছে তখন এদের কপালে দুঃখ আছে। ওদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে ফ্রান্সিসও বুঝল বেশ বিপদেই পড়তে হল।

রাস্তায় বালিভরা রাস্তা শেষ হয়ে মাটির রাস্তা শুরু হল। রোদের তেজ বাড়ল। গা ঘেমে উঠছে। তবে দূরের সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছিল অবাধেই। তাই হাঁটতে হাঁটতে বিনোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তাহলে আমরা বিপদে পড়লাম।

—বিপদ তো যে কোন সময় আসতে পারে। দেখা যাক এরা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়। তবে আমাদের আদর করে অতিথি আবাসে রাখবে না এটা ঠিক। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল। ওরা হেঁটে চলল। ঘোড়ার লাগাম ধরে ধরে দলপতি আর যোদ্ধা দুজনও চলেছে। ওরা কোন কথাই বলছে না।

কিছু দূরে দেখা গেল বেশ কিছু বাড়িঘর তারপরেই একটা লম্বাটে বড় বাড়ি। পাথরের চাঙড় গেঁথে তৈরি। বাড়িটার মূল ফটকের সামনে এল ওরা। দু'জন প্রহরী। বেশ জমকালো পোশাক গায়ে। মূলপ্রবেশ পথের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খোলা তরোয়াল হাত পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিসরা বুঝল এটাই রাজবাড়ি। প্রহরীদের সামনে ওরা আসতেই প্রহরীরা দলপতির দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নুইয়ে সদর দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। শুধু দলপতির পেছনে পেছনে ওরা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটু চাতাল পার হয়েই রাজসভাকক্ষ। পাথর গেঁথে তৈরি লম্বাটে ঘর। দুটো মাত্র পাথরের জানালা। সভাকক্ষ একটু অন্ধকার অন্ধকার। প্রজাদের বেশ ভিড়। রাজা জোস্তাক কাঠ আর পাথরের তৈরি সিংহাসনে বসে আছে। সিংহাসন ফুল লতা তোলা মোটা কাপড় ঢাকা। দু'দিকের পাথরের দেয়ালের খাঁজে দু'টো বড় মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল রাজা জোস্তাক বয়স্ক মানুষ। মুখে অল্প পাকা দাড়ি গোঁফ। গায়ে পাতলা হলুদ রঙের পোশাক। আলখালা মত। পাশের আসনে বৃদ্ধ মন্ত্রীও বলশালী চেহারার সেনাপতি বসে আছে। রাজসভায় তখন বিচার টিচার চলছিল বোধহয়। সে সব নিয়ে ব্যস্ত রাজা। এক নজর ফ্রান্সিসদের দেখে নিল। বিদেশি। দলপতি ফ্রান্সিসদের নিয়ে সামনে এগিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে দেখার মত কিছু নেই। তাই ফ্রান্সিস এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটাতে লাগল। রাজা বেশ কয়েকবার ভারি গলায় বিচারের রায় শোনাল। তারপর ডান হাত তুলল। আজকের মত বিচার শেষ। সবাই নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে চলে গেল।

এবার রাজা আঙ্গুল নেড়ে ইঙ্গিতে দলপতিকে কাছে আসতে বলল। দলপতি রাজার কাছে গিয়ে মাথা একটু নামিয়ে সম্মান জানিয়ে দেশীয় ভাষায়

বলে গেল। বোধহয় কোথায় ফ্রান্সিসদের দেখা পেয়েছে সেসব। ফ্রান্সিস শুধু ভাইকিং কথাটা বুঝতে পারল। দলপতি রাজাকে হাতের তোড়ে বাঁধা কামড়ের ক্ষত দেখাল। মুখ দিয়ে কামড়াবার ভঙ্গীও করল। রাজা এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় বলল আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। রাজা থেমে থেমে স্পনীয় ভাষায় বলল—নেতা কে?

—আমি? ফ্রান্সিস কথাটা বলে এগিয়ে গেল।

—বিদেশী ভাইকিং — সাহস —দলপতি—কামড়েছো। রাজা ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল।

—আমাকে তুই তুই বলে ডেকে কথা বলছিল। অপমান সহ্য হয় নি। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ়স্বরে বলল।

—শাস্তি পাবে। আমার রাজত্বে এসেছো কেনো? রাজা বলল।

—কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে আসিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আশ্চর্য! বিনা কারণে? রাজা বলল।

—আমরা দ্বীপ দেশ ঘুরে বেড়াই। নতুন নতুন দেশ —কত বিচিত্র মানুষ তাদের ভাষা জীবনযাত্রা ভালো লাগে এসব। সকলের মঙ্গল করার চেষ্টা করি। ফ্রান্সিস বলল।

—শুধু এই? রাজা বেশ অবাক হয়ে বলল।

—এইটুকু কি কম হল? তবে আর একটা কাজও আমরা করি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী? রাজা জানতে চাইল।

—কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেলে সে সব বুদ্ধি খাটিয়ে কোন না কোন সূত্র ধরে উদ্ধার করি। কখনও জীবনের ঝুঁকিও নিয়ে থাকি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা খুক্‌খুক্ করে হেসে উঠল। বলল এইবার আসল কথা — গুপ্তধন নিয়ে পলায়ন—পেশা তোমাদের।

—আমাদের ভুল বুঝবেন না। অনেক গুপ্তধন ভাণ্ডার আমরা উদ্ধার করেছি। — সাংকেতিক চিহ্ন নকশা মানচিত্র দেখে। কিন্তু একটি স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নিইনি। আসল মালিককে দিয়ে দিয়েছি।

—আদর্শবাদী —অ্যাঁ? আবার রাজা খুক্ খুক্ করে হেসে উঠল।

—হ্যাঁ। খুব কম রাজা বা দলপতি আমাদের বিশ্বাস করেছেন। বাকিরা অবিশ্বাস করেছে। আপনিও অবিশ্বাস করছেন। অনুরোধ—আমাদের অবিশ্বাস করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু— কয়েদঘরই তোমাদের আসল জায়গা। আগেও একটা বিদেশী স্পেন থেকে এসেছিল। আমরা স্পেন ভাষা শিখেছিলাম। প্রজাদের বলে বেড়াত যীশু না কে— শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। ব্বাঃ আমি রাজা জোস্তাক — কেউ না? ফুটো নৌকোয় চড়িয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা ভাগ্যবান— বেঁচে তো থাকবে। ফ্রান্সিস এবার রাজা জোস্তাকের মুখের দিকে তাকাল। পাতলা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ক্রুর হাসি। কুড়কুড়ে চোখে বদ মতলব এর কাছে সুবিচার পাওয়া অসম্ভব।

—ঠিক আছে। আমাদের কতদিন কয়েদ হবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যতদিন না স্বীকার করছো তোমরা ঠগ—প্রবঞ্চক—লুঠেরা। রাজা বলল। ফ্রান্সিস ভালো করেই বুঝল এই রাজার হাত থেকে নিস্তার নেই। পালাবার ছক কষতে হবে। তারপর দ্রুত ভাবতে লাগল।—পালাতে কদিন লাগবে কে জানে। সেটা কয়েদঘরে না ঢুকলে পাহারার ব্যবস্থা না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। জাহাজে যা খাদ্য জল আছে কদিন আর যাবে তাতে? তারপর তো মারিয়া হ্যারিদের উপোশ করে থাকতে হবে। বিস্কো নেই। ভেন বয়স্ক। অন্য বন্ধুরা সাহসী ঠিকই কিন্তু তাদের চালনা করবে কে? সিনাত্রা গান গায় ভালো। কিন্তু ভীতু। হ্যারি শরীরের দিক থেকে দুর্বল। কিন্তু খুব বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই। তবে আমি কাছে না থাকলে ও মনের দিক থেকেও দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই চটানো চলবে না। ফ্রান্সিস খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল মহামান্য রাজা আপনার দেওয়া শাস্তি আমরা মাথা পেতে নিলাম। যত দোষ আমাদের এই তিনজনের। আপনার দলপতির হাত কামড়ে দিয়েছি। শাস্তি আমাদের অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু মহামান্য রাজা আমাদের বেশ কিছু বন্ধু আমাদের জাহাজে রয়েছে। তাদের খাদ্য জল ফুরিয়ে গেছে। কাউকে পাঠিয়ে যদি তাদের খাদ্য জল সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন। তাহলে আপনি যে যীশুর চেয়েও মহানুভব সেটা ভালোভাবে প্রমাণিত হবে। ফ্রান্সিস দেখল—কাজ হয়েছে। রাজা জোস্তাক খুশিতে মিটিমিটি হাসছে। মাথা দুলিয়ে রাজা বলল—এ আর বেশি কথা কি। আমার লোক গিয়ে খাদ্য জল দিয়ে আসবে।

—সত্যিই আপনি মহারাজা। ফ্রান্সিস সজোরে বলে উঠল। কিন্তু ভবি ভোলবার না। কয়েদ ঘরে বন্দী থাকার আদেশের নড়চড় হল না। সেনাপতি আসন থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসদের কছে এসে বলল চলো। ফ্রান্সিস মাথা অনেক নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। আগে সেনাপতি। পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সেনাপতি উত্তরমুখো চলল। রাজবাড়ি

এলাকা শেষ হল। তারপর বাদিকে একটা পাথরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। পাথর আর কাঠ দিয়ে বেশ শক্ত গাঁথুনির ঘরটা বোঝা গেল এটা কয়েদঘর। সেনাপতিকে দেখে কোথা থেকে দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ঘরটার দরজার সামনে এস দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল এই দুজনই কয়েদঘর পাহারা দেবে। সেনাপতিকে একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল দু'জনে। একজন কোমরের ফেট্টিতে ঝোলানো একটা বড় লোহার রিং মত খুলে নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে গেল। দরজার বড় কড়ায় ঝুলছিল একটা বেশ বড় গোল তালা। প্রহরীটি রিং থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে দরজাটা খুললে। লোহার দরজাটা বেশ জোরে ঠেলে খুলল। ঢটাং ধাতব শব্দ হল। অন্য প্রহরীটি ফ্রান্সিসদের একে একে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ওরা যখন এক এক করে ঢুকছে তখন প্রহরীটি প্রত্যেককে জোরে ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। ফ্রান্সিসের আবার মেজাজ চড়ে গেল। কিন্তু ও চোখ কুঁচকে নিজেকে সহমত করল। এই অপমানজনক ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করল। নিরুপায় এখন।

এই ভর দুপুরেও ঘরটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। চারপাশে নিরেট পাথুরে দেয়াল। দুজন প্রহরীই ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসদের দুহাত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। কিন্তু পা বাঁধলো না। ফ্রান্সিস স্বস্তির হাঁপ ছাড়ল। দেখা গেল দু'পাশের দেয়ালে দুটো লোহার কড়া গাঁথা। একটা কড়ায় লম্বা একটা মোটা দড়ি ঝুলছিল। একজন প্রহরী সেই দড়ির একটা মাথা এনে ফ্রান্সিসদের দড়ি বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে ওপাশের কড়ায় শক্ত করে বেঁধে দিল দ'হাত তো বাঁধাই। তাঁর মধ্যে দিয়ে লম্বা দড়ি ঢুকিয়ে ফ্রান্সিসদের নড়াচড়াই প্রায় বন্ধ করে দিল। ঘরে ঘুরে বেড়ানো যাবে না। ফ্রান্সিস একটু হেসে এক প্রহরীকে বলল—সত্যিই ভাই— তোমাদের রাজা শুধু মহানই নন— বুদ্ধিমান ধুরন্ধর। প্রহরীরা ফ্রান্সিসের কথা কিছুই বুঝল না। বেরিয়ে গেল। ঢটাং। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরের মেঝেয় শুকনো খড় ঘাসপাতা ছড়ানো। হাত বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিস ঐ মেঝের মধ্যেই শুয়ে পড়ল। বাঁধা হাত বুকের ওপর রেখে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটা দেখতে লাগল। শাঙ্কো আর বিনোলা বসে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখল ঘরটার উত্তর দিকে বেশ কিছু ওপরে একটা জানালা মত। জানালা না বলে ওটাকে খোদলই বলা যায়। এবড়ো-খেবড়ো করে ভাঙা। ওটাই একমাত্র আলো আর হাওয়া চলাচলের পথ। আর কোন ফোকর নেই। হঠাৎ হাওয়ার

ধাক্কায় একটা ডাল এসে ফোকরটায় ঝাপটা মারল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াও। বলল শাঙ্কো তোমরা উঠে দাঁড়াও। আমি দড়িটা টেনে নিয়ে ঐ দেয়ালের কাছে যাবো। শাঙ্কো বিনোলা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ফোকরের দেয়ালের দিকে ঠিক পায়ে পায়ে এগোল। হাতে টানা দড়ি বাঁধা। কাজেই শাঙ্কোদের সেই সঙ্গে এগোতে হল। ফ্রান্সিস মাথা তুলে ফোকরের মধ্যে দিয়ে তাকাল। ফোকরের হাত কয়েক দূরেই একটা মোটামুটি মোটা ডাল বাইরের আলোয় দেখল। আস্তে আস্তে ফিরে এল। শাঙ্কোরাও ফিরে এসে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস আবার শুয়ে পড়ল।

—ফ্রান্সিস—কী দেখছিলে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—মুক্তির পথের ইঙ্গিত। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—অসম্ভব। যা শক্ত দেয়াল। ছাউনিও উঁচুতে। কী করে মুক্তির কথা ভাবছো? বিনোলা একটু অসহায় ভঙ্গীতে বলল।

—ছক কষছি বিনোলা। শাঙ্কো কিছু বলল না। ও ফ্রান্সিসকে ভালো করেই চেনে। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কিছু গভীরভাবে ভাবছে। ঠিক একটা উপায় বের করবেই।

এবার শাঙ্কোও বুকে দুহাত রেখে শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি বিনোলাও কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়ে রইল। ভাবছিল রাজা কথা দিয়েছে। নিশ্চয়ই ওদের জাহাজে খাদ্য ও জল পাঠিয়েছে। মারিয়া আর বন্ধুরা আজ থেকেই পেট ভরে খেতে পাবে। পর্যাপ্ত পানীয় জলও পাবে। একটু তন্দ্রা এল ফ্রান্সিসদের। হঠাৎ ঢং শব্দে ফ্রান্সিসের তন্দ্রা ভেঙে গেল। দরজা খুলে গেল। বগলে লম্বাটে শুকনো বড় পাতা আর হাতে একটা মাটির হাঁড়ি নিয়ে একজন প্রহরী ঢুকল। অন্যজনের হাতে আর একটা মাটির হাঁড়ি। সে সব মেঝেয় রেখে একজন এসে ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধা দড়ি খুলে দিল। ওদের সামনে পাতা পেতে দেওয়া হল। পাতে দেওয়া হল সেদ্ধ দানার খাবার। কিছুটা খেয়ে শাঙ্কো বলল—এই দানা গুলো আমি এনেছিলাম। কালকের সেই বিচিত্র রান্নার রুটিতে দেওয়া হয়েছিল। খেয়ে দেখো ভাল লাগবে। এবার একটা বড় টুকরোর মাছ আর ঝোলমত দেওয়া হল। মাছটা এক কামড় খেয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী সুন্দর স্বাদ। সামুদ্রিক মাছ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস এক প্রহরীকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চুপ করে গেল। ও কিছুই বুঝবে না। সেনাপতি এলে জানতে হবে। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বরাবরের মতই বলল—আজ খুব সুস্বাদু খাবার। বেশি করে খাও।

শরীর তৈরী রাখো।

খাওয়া শেষ। একজন প্রহরী বড় মাটির হাঁড়ি ভর্তি জল নিয়ে ঢুকল। কাঠের গ্লাসও দিল। ওরা হাতমুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিল। ওদের হাত বেঁধে প্রহরীরা চলে গেল। আরো খেতে চাইলে মাথা এপাশ ওপাশ করেছিল। আর নেই। তবু খাওয়া ভালোই হল। কারণ তিনজনই ছিল ক্ষুধার্ত। দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে ওরা চলে গেল। ঘটাং — দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা শুয়ে পড়ল।

বিকেলে সেনাপতি এল। ঘরে ঢুকে একটু হেসে বলল—ভাল?

—ভালো আছি। দুপুরে পেট পুরে খেয়েছি। আচ্ছা মাছটা খুব সুস্বাদু লাগল। সমুদ্রের মাছ, ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তাল্লি মাছ। খাঁড়িতে আসে। ডিম পাড়ে অসংখ্য—বড় জলায় একটু দূরে।

—ও। যাক গে—রাজা কাউকে খাদ্য জল নিয়ে আমাদের জাহাজে পাঠিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—ন্নাঃ। কেউ — ন্না। সেনাপতি মাথা এপাশ-ওপাশ করল। ফ্রান্সিস সবিস্ময়ে বলে উঠল—রাজা যে বললেন। কথা দিলেন। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল।

—রাজা—কত কাজ—মনে নেই— বড় চিন্তা— রাজা মিরান্দার লুকোনো—রাজৈশ্বর্য—রাজা পাগল— খুঁজছে। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহ বোধ করল। বলল —ব্যাপারটা বলুন তো?

—অনেক কথা—ইতিহাস—সময় নেই চলি। ফ্রান্সিস তাকে থামাবার সময়ও পেল না। তার আগেই সেনাপতি চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—গুপ্তধনের ব্যাপার। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার চিন্তা বন্ধুদের জন্য। আর কিছু ভাবতে পারছি না। লোকটা এত নীচ এত হীনমনা।

—কী আর করবে? ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বলল।

—শাঙ্কো—ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল— দ্রুত ছক কষতে হবে। আজ রাতেই পালাতে হবে। রাজা সেনাপতি বা প্রহরীরা জানে না আমার নাম ফ্রান্সিস কোন বাধাই আমার কাছে বাধা নয়। আজ রাতে পালাতে হবে।

—এই ঘর থেকে —প্রহরীদের ধোঁকা দিয়ে?

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যে হল। একজন প্রহরী জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঢুকল। ফোকরের দিককার পাথুরে দেয়ালের খাঁজে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাত হল। চোখ বুঁজেই ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো? শাঙ্কো মুখে শব্দ করল হুঁ।

—যদি আমরা পরস্পরের কাঁধে উঠি — ঐ খোঁদলটার কাছে তুমি পৌঁছতে পারবে না? শাঙ্কো খোঁদলটার উচ্চতা মনে মনে মেপে নিয়ে বলল—

—মনে হয়— পৌঁছোনো যাবে।

—অন্তত তুমি হাতের নাগালে পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে ঐ হাত চারেক খোঁদল। পার হবো কী করে? শাঙ্কো একটু অসহায় ভঙ্গীতে বলল।

—তাহলে তুমি আর নিজেকে দুঃসাহসী ভাইকিং বলে পরিচয় দিও না। ফ্রান্সিস বলল।

—না মানে—। শাঙ্কো কথাটা শেষ করতে পারল না। ফ্রান্সিস বলে উঠল আমরা ভাইকিং —সব কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি। এমন কি কষ্টদায়ক মৃত্যু পর্যন্ত। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল।

বলল—পারবো। কিন্তু সবার নিচে কে থাকবে?

—আমি। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ় স্বরে বলল।—তুমি? বাঁ পা—এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নও তুমি। শাঙ্কো বলল।

—পারবো—পারতেই হবে। ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

—তবে আমিও পারবো। কিন্তু তারপর? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—বাইরে ঐ বুনো গাছটার একটা মোটা ডাল আছে। হাত বাড়িয়ে না পেলেও—ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরা যাবে। চোখ বুঁজেই ফ্রান্সিস কথাগুলো বলে গেল। শাঙ্কো কিছুটা উঠে ভালো করে খোঁদলটা দিয়ে চেয়ে রইল। ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখল সত্যি একটা ডালের আভাস। মশালের অস্পষ্ট আলোতে আরো স্পিষ্ট দেখল।

—রাতে খাওয়া শেষে সব বলবো। এখন হাত পা ছেড়ে স্রেফ বিশ্রাম। কী ভাবে কী করবে ভাবো। অন্য কোন চিন্তা নয়। শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। কী ভাবে খোঁদলে উঠবে কী ভাবে বাইরে বেরোবে ডাল ধরবে এ সব ভাবতে লাগল।

ঢঢাং ঢং— রাতের খাবার দিতে এল প্রহরীরা। সেই দানাসেদ্ধ তাল্লি মাছ। বোঝাই যাচ্ছে তাল্লি মাছ অজস্র পাওয়া যায়। খাওয়া শেষ। প্রহরীরা চলে গেল।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিস চোখ বুজেই মৃদুস্বরে বলতে লাগল। —

শাঙ্কো তোমার ছোরা—দড়ি কাটা—বড় মোটা দড়িটা খুলে কোমরে জড়াবে আমি বসবো কাঁধে উঠবে বিনোলা তার কাঁধে তুমি — খোঁদল ধরবে—শরীর যতটা পারো গুটিয়ে বাইরে বেরোবে—যে ভাবেই পারো মোটা ডালটা ধরবে। দড়ির মাথাটা শক্ত করে ডালে বাঁধবে—। শাঙ্কো চাপা স্বরে বলে উঠল—

—সাবাস ফ্রান্সিস।

—আস্তে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। গায়ে জোর পাবে। ভালো দড়ি বেঁধে সংকেত দেবে। ফ্রান্সিস চোখ বুজে থেকেই বলল।

—মোরগের ডাক? শাঙ্কো বলল।

—পাগল। মোরগরা রাতে ডাকে না। ভোর হলে ডাকে। অন্য যে কোন পাখির ডাক। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল।

—ঘুমোও। ফ্রান্সিস বলল।

রাত গভীর হল। তন্দ্রা ভেঙে ফ্রান্সিস উঠে বসল। ফিস্ ফিস্ করে ডাকল শাঙ্কো বিনোলা। দু'জনেরই ঘুম ভেঙে গেল। দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের খুব কাছে এসে নিচু হল। ফ্রান্সিস দড়ি বাঁধা হাতদুটো শাঙ্কো বুকের কাছ দিয়ে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শাঙ্কোর ছোরাটা বের ক'রে আনল। তারপর ছোরাটা ধরে শাঙ্কোর হাত বাঁধা দড়ির মাঝখানে ঘষতে লাগলো। অনেকটা কেটে গেল। শাঙ্কো এক হ্যাঁচকা টানে দড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর একইভাবে ফ্রান্সিস ও বিনোলার হাতে বাঁধা দড়ি কেটে ফেলল। ফ্রান্সিস—মোটা লম্বা দড়িটা খুলে পাথুরে দেয়ালে গাঁথা কড়ার কাছে গেল। কড়ায় বাঁধা দড়ির দুটো মাথাই কাটল। দড়ির একটা মাথা শাঙ্কো কোমরে বেঁধে নিল। এবার ফ্রান্সিস ঐ খোঁদলটার দিকে নিচে মেঝেয় উঁচু হয়ে বসল। বিনোলে কাঁধের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসল। শাঙ্কো এবার দেয়ালে দু হাতে ভর দিয়ে বিনোলার কাঁধের ওপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু খোঁদলটা তখনও হাতখানেক দূরে। এবার ফ্রান্সিস দেয়ালে দু'হাতে ভর রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এবার শাঙ্কো খোঁদলটা দু'হাতে ধরে ফেলল। তারপর শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে খোঁদলটায় বুক চেপে ঝুলে পড়ল। এই ঝাঁকুনিতে ফ্রান্সিস একটু টাল খেয়েও সামলে নিল। বাঁ পাটা টন টন করছে। কিন্তু ফ্রান্সিস মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ করল ন। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। শাঙ্কোর শরীরের ভার কমে যেতে ফ্রান্সিসের একটু স্বস্তি হল। শাঙ্কো বাইরে মুখ বাড়িয়ে অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় মোটা ডালটা অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পেল।

প্রায় চৌকোনো খোঁদলটায় ভর দিয়ে ও আস্তে আস্তে শরীরটা ঘোরাল। তারপর হাত বাঁড়িয়ে মোটা ডালের গায়ের একটা ছোট ডাল ধরে ভর নিল। তারপর খোঁদলের মধ্যে দিয়ে জোরে শরীরটা টেনে নিয়ে মোটা ডালটা প্রথমে একহাত পরে দুহাতে ধরে ফেলল। তখনও একটু হাঁপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে খোঁদল থেকে দু পা সরিয়ে নিয়ে ডালটায় ঝুলে পড়ল। পরক্ষণেই পাক খেয়ে ডালটার ওপর বসে পড়ল। দেরি করা চলবে না। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। কোমর থেকে দড়ির মাথাটা খুলে খুব কষে ডালটায় বেঁধে ফেলল। শাঙ্কো মৃদু হাসল। ফ্রান্সিসের নিখুঁত ছক। ও এবার দুহাতের তালু মুখে চেপে কুউ কু ঔ পাখির ডাক ডাকল। ঘরে নিশ্চিন্ত ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—বিনোলা দড়ি ধরে ওঠো। বিনোলা দড়ি টেনে ধরে আস্তে আস্তে খোঁদলটায় বুক দিয়ে ঝুলে পড়ল। শাঙ্কোর মতই শরীর ঘুরিয়ে দড়ি টেনে ধরে ডালটায় উঠে এল। ফ্রান্সিস দেয়ালে হাত চেপে হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিল। তারপর দড়ি ধরে উঠতে লাগল। জাহাজের দড়ি ধরে নামা ওঠা ওদের কাছে জল ভাত। একটু উঠে বাঁ হাত দিয়ে জ্বলন্ত মশালটা তুলে নিল। তারপর ডান হাত দিয়ে উরু দিয়ে দড়ি জড়িয়ে খোঁদলের গায়ে ঝুলে পড়ল। ডান হাতে টেনে দড়ির ঝোলানো মাথাটা তুলে নিল। জ্বলন্ত মশালটা মেঝেয় ছুড়ে ফেলেই শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দড়ির সাহায্যে ডালটা ধরে ফেলল। বিনোলা একটু সরে বসল। ফ্রান্সিস ডালের ওপর বসে পড়ল। ওদিকে ঘরের মেঝের খড় ঘাসপাতায় আগুন জ্বলে উঠেছে। খোঁদল দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

—জলদি—নেমে পড়। দড়ি ধরে ঝুলে পড়া শাঙ্কো চাপা স্বরে বলল—ঘরের পেছনে কোন প্রহরী নেই। শাঙ্কোর দড়ির শেষে নেমে এসে নিচে তাকিয়ে দেখল তখনও দুহাত নিচে শুকনো পাতার স্তূপ। আর ফ্রান্সিসকে একই ভাবে নামতে হল। শুকনো পাতার স্তূপে শব্দ হল। খসস্ ওদিকে আগুন সারা কয়েদ ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। দরজার কাছে প্রহরীরা হৈ হৈ ডাকাডাকি শুরু করেছে। চাপাস্বরে ছোটে জাহাজ ঘাটের দিকে। বলেই ফ্রান্সিস এক ছুটে শুকনো ঝরাপাতা ঘাস মাড়িয়ে সামনের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তিনজনেই ঝোপঝাড় ঠেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে চলল।

ওদিকে আরো যোদ্ধা এসে জড়ো হয়েছে সেই জ্বলন্ত কয়েদঘরের কাছে। একটু কাছে জলা থেকে পীপে জলে ভর্তি করে আগুন নেভাতে লাগল।

সৈন্যাবস থেকে আরো সৈন্য ছুটে এল। ততক্ষণে আগুন লেগে গেছে

কয়েদঘরের ছাউনিতে।

দুজন প্রহরী ছুটল সেনাপতিকে খবর দিতে। শয়নকক্ষে তখন সেনাপতির ঘুম ভেঙে গেছে। বুঝে উঠতে পারল না। বাইরে এত চ্যাঁচামেচি কীসের জন্যে। আগুন 'আগুন' চিৎকারটা শুনছিল। সেনাপতি সবে বিছানা থেকে নেমেছে তার বাড়ির প্রহরী ছুটে এল।

—কী ব্যাপার? বাইরে এত গোলমাল কীসের? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আজ্ঞে কয়েদঘরে আগুন লেগেছে। প্রহরী হাঁপধরা গলায় বলল।

—সে কী? কী করে আগুন লাগল? সেনাপতির প্রশ্ন।

—আজ্ঞে — তা তো বলতে পারবো না। প্রহরীটি মাথা নেড়ে বলল।

—তুই যা। রাজা মশাইকে খবর দে। কয়েদ ঘরে আগুন লেগেছে। উনি যেন আসেন। সেনাপতি বলল। প্রহরী ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিস দেখল—ঝোপ জঙ্গল এলাকা শেষ। ডানদিকে কিছু দূর দিয়ে সদর রাস্তা। টানা চলে গেছে জাহাজ ঘাটের দিকে।

ফ্রান্সিস রাস্তার ধারে এসে এক ঝলক পেছনটা দেখে নিল? জ্যোৎস্নার নিষ্প্রভ আলোয় দেখা গেল রাস্তা জনশূন্য। যাক নিশ্চিন্ত। তখনই দেখল কয়েদঘরের ছাউনিতে আগুন লেগে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠেছে আকাশের দিকে। ওরা প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। ঝোপ-জঙ্গলের বাধা নেই। উন্মুক্ত রাস্তায় ওদের চলার গতি বেড়ে গেল। সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া ছুটে আসছে। ধূলো বালি উড়ছে। চোখ কুঁচকে ওরা ছুটল প্রাণপণে।

সেনাপতি দ্রুত কয়েদঘরের দিকে চলল। জ্বলন্ত কয়েদ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি প্রহরীদের জিজ্ঞেস করল—ঘরে তিনজন বিদেশি ছিল। তারা কোথায়?

—বোধহয় পুড়ে মরে গেছে। একজন প্রহরী বলল।

—কী করে বুঝলি? ওদের চিৎকার কান্নাকাটি শুনতে পেয়েছিলি? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আজ্ঞে না। প্রহরীটি মাথা এপাশ ওপাশ করল।

—আগুনে পুড়তে থাকলে নিশ্চয়ই চীৎকার চ্যাঁচামেচি করতো। কথাটা বলে সেনাপতি এগিয়ে পোড়া ঘরের দিকে তাকাল। তখন কয়েদ ঘরের দরজা ভেঙে পড়ে গেছে। ওপরের জ্বলন্ত ছাউনি থেকে কাঠ পাথর ভেঙে পড়ছে। আগুনের আভায় ঘরের ভেতরে ভালো করে দেখল সেনাপতি। না কোন

পোড়া শরীর পড়ে নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল বন্দীরা পালিয়েছে। পালাবার আগে আগুন লাগিয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে পালাল? সেনাপতি পোড়া কয়েদ ঘরের ওপাশে গেল। আগুনের আভায় সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখল পেছনের উঁচু গাছটার একটা মোটা ডাল থেকে কয়েদঘরের মোটা দড়িটা ঝুলছে। তার মানে যে করেই হোক খোঁদল দিয়ে দড়ি ধরে নেমে পালিয়েছে। একটু দূরে দাড়ি গোঁফওয়ালা দলপতি জল ছিটানোর তদারিক করছিল। সেনাপতি ইশারায় তাকে ডাকল। কাছে এসে বলল—যে তিন বিদেশিকে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তাদের জাহাজঘাটায় নোঙর করা আছে—তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দলপতি মাথা ওঠানামা করল।

—বন্দীরা পালিয়েছে। নিশ্চয়ই জাহাজঘাটায় যাবে। তুমি সাতজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য নিয়ে এক্ষুনি এসো। জলদি। জাহাজে ওঠার আগেই ওদের বন্দী করতে হবে। বালির ওপর দিয়ে ওঁরা জোরে ছুটতে পারবে না। ধরা পড়বেই। সেনাপতি বলল।

দলপতি দ্রুত ছুটল সৈন্যবাসের দিকে।

তখনই রাজা জোস্তাক সেখানে এল। দেখল খোলা কয়েদঘরে কাঠামো। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। সেনাপতি রাজার কাছে এল। যে যা ভেবেছে যা করেছে সে সব মৃদুস্বরে বলল। সেই সময় সাতজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য শূন্যে খোলা তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের কাছে এল। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—বিদ্যুৎগতিতে জাহাজঘাটের দিকে ঘোড়া ছোটাও। বন্দীরা ঐ জাহাজ ঘাটের দিকেই পালাচ্ছে। বন্দীদের পাকড়াও করো। সাতজন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছোটাল। এবার সেনাপতি বাকি সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল— তোমরাও যাও। ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের সাহায্য করবে। বন্দীদের ধরা চাই। কিন্তু ওদের দলকে ধরতে জাহাজে উঠবে না। পরে এক ফোঁটা রক্ত না ঝরিয়ে কবজা কব্বে। কাজেই ওদের সঙ্গে এখন লড়াই নয়।

সৈন্যরা দলপতির নেতৃত্বে চিৎকার করতে করতে জাহাজঘাটের দিকে ছুটল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের ছোটার গতি কমে এল। কারণ বালির রাস্তায় এসে পড়েছে তখন। বালিতে পা হড়কে যাচ্ছে। পা চেপে বসছে না। ফ্রান্সিস আবার বাঁ পায়ে তেমন জোর পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই একটু পিছিয়ে পড়ছিল। শাঙ্কো বিনোলা একটু থেমে ফ্রান্সিসের কাছে আসছিল। আবার তিনজন একসঙ্গে ছুটছিল। তিনজনেই তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। ওরই কষ্ট হচ্ছিল বেশি। ফ্রান্সিস দ্রুত একবার পেছন দিকে তাকিয়ে

দেখল—ধূলোবালি উড়িয়ে একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্য ছুটে আসছে। সামনে তাকিয়ে ওদের জাহাজটা দেখল। কিন্তু বেশ দূরে জাহাজঘাট। ফ্রান্সিস হাঁপানো গলায় বলল—জোরে ছোটো। ছুটতে ছুটতে তখন ওরা জাহাজ ঘাটের অনেক কাছে চলে এসেছে। ও আবার পেছন দিকে তাকাল? অশ্বারোহী সৈন্যদল দুরন্ত গতিতে অনেক কাছে চলে এসেছে। বুঝল—শেষ রক্ষা হবে না। জাহাজঘাট পর্যন্ত দূরত্ব আর বেশি বাড়ানো যাবো না। তবু ছুটল। প্রাণপণে। জাহাজঘাটের কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে অশ্বারোহী সৈন্যরা চীৎকার করতে করতে প্রায় ওদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। অশ্বারোহী সৈন্যরা ওদের ধরে ফেলল। জাহাজঘাট তখন হাত কুড়ি দূরে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বালির ওপর বসে পড়ল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতে যথাসাধ্য গলা চড়িয়ে বলে উঠল—শাঙ্কো বিনোলা—দাঁড়াও ছোটার চেষ্টা করো না। ওরা তরোয়াল চালাবে। বসে পড়ো। সত্যি—সৈন্যরা নিরস্ত্র ওদের তরোয়োল চালিয়ে হত্যা করতে পিছু পা হবে না। দুজনেই বালির ওপর বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। তখন পূর্ব আকাশে লাল রং ধরেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। সৈন্যদের চিৎকারের শব্দে জাহাজে তখন ফ্রান্সিস সব বন্ধুদের অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেছে। হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও বাইরে সৈন্যদের চিৎকার হৈ হল্লা শুনতে পেল। বুঝল — নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসরা কোন বিপদে পড়েছে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দিকে ছুটল। চিৎকার করে বলতে লাগল ভাইসব —তরোয়াল নাও। ডেকএ চলো। ফ্রান্সিসরা বিপদে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে উঠতে গিয়ে হ্যারি সিঁড়ির ধাপে পা আটকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। পেছনে থেকে এক বন্ধু ওকে ধরে ফেলল। ভাইকিংরা ছুটে গেল অস্ত্রঘরের দিকে। তরোয়াল নিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক এ উঠে এল। হ্যারি রেলিঙের কাছে ছুটে গেল। তখন সূর্য উঠছে। ভোরের আবছা আলোয় দেখল তীরের কাছে বালিয়াড়িতে কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। একদল সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। গোলের মাঝখানে তিনজন বসে আছে। তখনই সূর্য উঠছে। এবার দেখল সেই তিনজন ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর বিনোলা। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। শাঙ্কো আর বিনোলা সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্য উঠল। সমুদ্রে জাহাজে তীর ভূমিতে আলো ছড়াল। হ্যারি বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। তখনই একজন বন্ধু তরোয়াল হাতে হ্যারির কাছে ছুটে এল। গলা চড়িয়ে বলল—হ্যারি পাটাতন ফেলাই আছে। ফ্রান্সিসদের ওরা বন্দী করেছে। নেমে লড়াই করে ফ্রান্সিসদের মুক্ত করতে

হবে। চলো আর এক মুহূর্ত দেরি নয়।

—একটু দাঁড়াও। ফ্রান্সিস এত কাছে। ও নিশ্চয়ই আমাদের ডেকে কিছু বলবে। তখনই ফ্রান্সিস মুখ তুলে জাহাজের দিকে তাকাল। বন্ধুদের হাতে তরোয়াল দেখেই ও বুঝল বন্ধুরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। ভোরের নরম আলোয় হ্যারি এবার ফ্রান্সিসদের মুখ চোখ স্পষ্ট দেখতে পেল। বুঝল ওরা ভীষণ ক্লান্ত অশ্বারোহী সৈন্যরা ওদের অনেক দূর তাড়া করে এসে ধরেছে। ফ্রান্সিস তখন বুঝতে পেরেছে। বন্ধুরা যে কোন মুহূতে নেমে আসতে পারে। ফ্রান্সিস রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল সৈন্যদল আসছে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফওয়ালা দলপতি। ভীষণ বিপদ সামনে। ও দ্রুত উঠে দাঁড়াল। যথাসাধ্য গলা চড়িয়ে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব আমার কথা শোন। কেউ জাহাজ থেকে নামবে না। লড়াই নয়। আমরা ধরা দিয়েছি। যে করেই হোক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এখন লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না।

হ্যারিও দু'হাত তুলে বলে উঠল, ভাই সব, ফ্রান্সিসের কথা মেনে চলো। বন্ধুরা সব তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

ততক্ষণে খোলা তরোয়াল হাতে দলে দলে সৈন্যরা এসে জাহাজঘাটে জড়ো হলো। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা এবার বুঝতে পারল ফ্রান্সিস সঠিক কথাই বলেছে। এত সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

ওদিকে বেশ কয়েকজন খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে রাজধানীর দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে শুরু করল। ওরা এই ভেবে নিশ্চন্ত হল যে একটা অবধারিত লড়াই এড়ানো গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বিনেলো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, খুব বুদ্ধি করে পালিয়েছিলাম কিন্তু ধরা পড়তে হল। এবার কোথায় আমাদের বন্দী করে দেখি।

নিশ্চয়ই মজবুত কোনো ঘরে আটকাবে। পাহারার কড়াকড়িও বাড়াবে। ওর মধ্যেই পালাবার ছক কষতে হবে।

পারবে? বিনেলো একটু হতাশার সঙ্গেই বলল।

সব দেখিটেখি। উপায় একটা বের করতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের রাজবাড়ির সামনে নিয়ে আসা হল। রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দেখে সেনাপতি দুজন প্রহরীকে কী বলল। প্রহরী দুজন এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। রাজবাড়ির পুব কোনায়

একটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে প্রহরী দুজন দাঁড়াল। একজন প্রহরী কোমরে ঝোলানো চাবির গোল গোছা থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলল। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কয়েকজন এসো। অস্ত্রশস্ত্র বার করতে হবে। বোঝা গেল এটা অস্ত্রঘর। অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলে এই ঘরেই ফ্রান্সিসদের বন্দী করে রাখা হবে। প্রহরী আর সৈন্যরা মিলে ঢাল তরোয়াল বর্শা ঘর থেকে বের করে এনে ঘরের সামনে স্তূপাকার করল। সৈন্যরাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখল সেখানে।

ফাঁকা ঘরে ফ্রান্সিসদের ঢোকানো হল। দমবন্ধ করা ঘর। লোহা আর কাঠ দিয়ে তৈরি দরজা। ফাঁকফোকর বলে কিছু নেই। এই দিনের বেলায়ও ঘর অন্ধকার। ঘরের ভেতরে বেশ গরম। পাথরের মেঝেয় ঘাসপাতা বিছানো নেই। কঠিন পাথরের মেঝেয় ফ্রান্সিস বসে পড়ল। পাশে শাঙ্কো-বিনোলা বসল।

এই ঘরে তো দমবন্ধ হয়ে মরে যাব। শাঙ্কো বলল মৃদুস্বরে।

হুঁ। এখানে কীভাবে পাহারা দেয়, কীভাবে খেতে দেয় এসব দেখি। তারপর পালাবার ছক কষব। তবে পালানো খুব সহজে হবে না। লড়াইও করতে হতে পারে। দেখা যাক। তখনই ওরা দেখল চারজন প্রহরী এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। হাতে খোলা তরোয়াল। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

দুপুরে দরজা খোলা হল। দুজন প্রহরী দরজায় দাঁড়াল। বাকি দুজন বাইরে রইল। দুজন রাঁধুনি খাবার দিয়ে গেল। রুটি, মাছ আর আনাজের ঝোল। ফ্রান্সিসরা খাবার চেয়ে নিয়ে পেট ভরে খেল। সন্ধ্যা হল। প্রহরী একটা মশাল জ্বেলে দিয়ে গেল।

রাতে অসহ্য গুমোট গরমে ফ্রান্সিসদের প্রায় ঘুমই হল না।

ভোর হতে শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, আমরা তো গরমে সেধ হয়ে যাব।

দেখছি। সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সকালে সেনাপতি এলে দরজা খোলা হল।

সেনাপতি দরজায় এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, কয়েদঘরে আগুন লাগিয়ে পার পাবে ভেবেছিলে। এবার এই অস্ত্রঘরে মর।

এখনই মরবার ইচ্ছে নেই। শাঙ্কো বলল।

মরতে হবেই, সেনাপতি বলল।

একটা কথা বলছিলাম, ফ্রান্সিস বলল।

বলো। সেনাপতি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ঘোড়ার আস্তাবলেও জানালা থাকে। এই ঘরে তাও নেই। ফ্রান্সিস বলল।

অস্ত্রঘরে কেউ জানালা রাখে না।

কিন্তু আমরা তো অস্ত্র নেই। মানুষ। আমাদের তো শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়।

তাহলে কি দেয়াল ভেঙে জানালা করে দিতে হবে? সেনাপতি একটু কড়া গলায় বলল।

তাহলে তো খুবই ভালো হয়। শাঙ্কো অমায়িক হেসে বলল।

আবদার! রাজাকে একবার বলে দেখ না। উল্টে তোমাদের হাত-পা বেঁধে রাখার হুকুম দেবে।

ঠিক আছে। এখন তো রাজা রাজসভায় আসবেন। আমাদের নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

কোনো লাভ নেই। সেনাপতি মাথা এপাশ-ওপাশ করে বলল।

তবু। আমাদের সমস্যার কথাটা একবার বলে দেখি।

তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। সেনাপতি একটু থেমে বলল, আজ রাতেই তোমাদের জাহাজের সঙ্গীদের বন্দী করা হবে। সবাইকে এই ঘরে বন্দী করে রাখা হবে।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহলে সেনাপতি অনেকদূর ভেবে রেখেছে।

বন্ধুদের আর সাবধান করার উপায় নেই। ওদের বন্দীদশা মেনে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল, আমাদের বন্দী করার অর্থ কি? আমরা তো রাজা জোস্তাকের কোনো ক্ষতি করিনি।

সে সব বুঝি না। রাজার হুকুম। সেনাপতি কথাটা বলে চলে যেতে উদ্যত হল।

ফ্রান্সিস বলল, আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করব।

বললাম তো, রাজার সঙ্গে দেখা হবে না।

আমাদের অনুরোধ—রাজাকে একবার বলে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। বলছি। সেনাপতি চলে গেল।

শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, এরকম অনুরোধ আর করো না।

উপায় নেই শাঙ্কো, এরা আমাদের জাহাজ আক্রমণ করবে। বন্ধুদের বন্দী করবে। বন্ধুরা অস্ত্র হাতে নেবার সময়ও পাবে না। বন্ধুদের বাঁচাতে রাজার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি অস্ত্রঘরের দরজার সামনে এসে বলল, তোমাদের কাপাল ভালো। রাজা দেখা করবেন। রাজসভায় চলো।

প্রহরীদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির দিকে চলল। রাজসভায় যখন

পৌঁছল তখন সেখানে বিচারপ্রার্থী বেশি নেই। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বিচার পর্ব শেষ হলে সেনাপতি তার আসন থেকে উঠে রাজার কাছে গেল। কিছু বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের রাজার সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গেল।

বলো, তোমাদের কী বলবার আছে। রাজা বেশ গম্ভীর গলায় জানতে চাইল।

মান্যবর রাজা, শুনলাম আমাদের জাহাজের বন্ধুদের বন্দী করার হুকুম দিয়েছেন।

হ্যাঁ, আজ রাতেই সবাইকে বন্দী করে আনা হবে। রাজা বলল।

কিন্তু কেন? আমাদের অপরাধ? ফ্রান্সিস বলল।

কৈফিয়ৎ চাইছ? তোমাদের সাহস তো কম নয়।

আমরা বন্দী। আপনার দয়ায় বেঁচে আছি। আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। শুধু এই অনুরোধ জানাই—বন্ধুদের বন্দী করবেন না।

আমরা পালিয়েছিলাম, কয়েদ ঘরে আগুন লাগিয়েছিলাম। এই অপরাধের জন্যে আমাদের তিনজনকে যে শাস্তি দেবেন মেনে নেব। দয়া করে বন্ধুদের বন্দী করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

না, না। কাউকে রেহাই দেব না। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা মনস্থির করে ফেলেছে। কোনোভাবেই বোঝানো যাবে না। রাজা ওদের জাহাজ আক্রমণ করবেই। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল, ঠিক আছে। একটা অনুরোধ রাখুন। অস্ত্রঘরে একটাও জানালা নেই। দরজা বন্ধ থাকে। দারুণ গরমে বদ্ধ ঘরটায় আমরা আর কিছুদিন থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়ব।

উপায় কি। অস্ত্রঘর তো শোবার ঘর নয়। রাজা বলল।

বলছিলাম, আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখুন। কিন্তু দরজাটা খুলে রাখতে বলুন। প্রহরীর সংখ্যা বাড়ান। আমরা পালাব না।

তোমাদের বিশ্বাস কী? দরজা দিন রাত বন্ধ থাকবে। শুধু খাবার দেবার সময় খোলা হবে। রাজা মাথা এপাশ ওপাশ করল।

ফ্রান্সিস ভালো করেই বুঝল এই রাজাকে কোনো অনুরোধেই রাজি করানো যাবে না। উপায় নেই। পালাবার ছক কষতে হবে।

ফ্রান্সিসরা অস্ত্রঘরে ফিরে এলো। প্রহরীরা দরজা বন্ধ করে দিল। শাঙ্কো মেঝেয় বসতে বসতে বলল, তাহলে বন্ধুদের বন্দী করে এই ঘরেই রাখা হবে।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, আবার পালাতে হবে। কিন্তু যা বুঝছি সেনাপতি খুব ধুরন্ধর মানুষ। ও বন্ধুদের সাবধান হবার সময় দেবে না। মনে হচ্ছে আজ রাতেই আক্রমণ করবে। ওদের আগে থেকে জানাতে পারলে তবু একটা লড়াই হত। কিন্তু সেনাপতি সেই সুযোগ দেবে না।

খাবার দেবার সময় প্রহরীদের কব্জা করা যাবে না? শাঙ্কো জিগ্যেস করল।

সম্ভব নয়। ওরা চার-পাঁচ জন অস্ত্র হাতে পাহারা দেবে। নিরস্ত্র আমরা এই ঘর থেকে বেরোতে পারব হয়তো। কিন্তু পালাতে পারব না। ধরা পড়ে যাব। আহত হব। আমাদের মেরে ফেলতেও কসুর করবে না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো আর কোনো কথা বলল না। বুঝল ভীষণ বিপদে পড়েছে ওরা।

ওদিকে একটু রাত বাড়তেই সেনাপতি সৈন্যদের লম্বাটে ঘরের বারান্দায় এল। সঙ্গে সেই দাড়ি গোঁফওয়ালা সৈন্যটি। সেনাপতি তাকে বলল, যাও, সবাইকে ঘুম থেকে ওঠাও। নতুন অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াতে বলো। দেখবে, বেশি গোলমাল হৈচৈ যেন না হয়।

দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা দলপতি আরও কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সৈন্যদের ঘরে ঢুকে সবার ঘুম ভাঙল। সেনাপতির আদেশের কথা বলল। সৈন্যরা নতুন অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল, বর্শা নিয়ে এসে সৈন্যাবাসের বারান্দায় দাঁড়াল। ঘোড়সওয়ার সৈন্যদেরও খরব দেওয়া হল। একটু পরে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরাও ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সেনাপতি সবাইকে বলল, জাহাজঘাটে বিদেশিদের একটা জাহাজ নোঙর করে আছে। সেই জাহাজ আক্রমণ করে ওখানে যারা আছে তাদের বন্দী করতে হবে। সাবধান, কোনোরকম শব্দ যেন না হয়। নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। চলো সব।

প্রথম ঘোড়সওয়ার, পেছনে অন্য সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে জাহাজঘাটের দিকে চলল। সেনাপতি একটা সাদা ঘোড়ায় উঠে সৈন্যদের পেছনে পেছনে চলল।

সৈন্যরা একেবারে নিঃশব্দে কাজ সারতে পারল না। এতে সৈন্যের চলাচলে মৃদু কথাবার্তায় শব্দ হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও অসহ্য গরমে প্রায় জেগেই ছিল। বুঝল সৈন্যরা ওদের জাহাজ আক্রমণ করতে যাচ্ছে। ও মৃদুস্বরে ডাকল, শাঙ্কো?

জেগে আছি। সেনাপতি তার পরিকল্পনা মতো চলেছে। শাঙ্কো মৃদুস্বরে

'বলল। তারপর উঠে বসে বলল। বন্ধুদের সাবধান করতে পারলাম না। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ আক্রমণ বন্ধুদের হার স্বীকার করতেই হবে।

সবই মেনে নিতে হবে। শুধু ভাবছি—বন্ধুদের এনে এই ঘরে বন্দী করবে। মারিয়া, বয়স্ক ভেনকেও রেহাই দেবে না। এই অসহ্য কষ্ট ওরা দুজন সহ্য করবে কী করে! তাছাড়া সবাইকে নিয়ে পালানোও প্রায় অসম্ভব।

শাঙ্কো মেঝেয় শুয়ে পড়ল। কোনো কথা বলল না। বিনেলোও ততক্ষণে জেগে গেছে। বলল, ফ্রান্সিস, কিছু একটা উপায় বের করো। এইভাবে সবাই এই ছোট ঘরটায় বন্দী হয়ে থাকা—

উপায় নেই বিনেলো। আমার সব চিন্তাভাবনা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছি না। বড় অসহায় অবস্থা আমাদের।

ফ্রান্সিস, তুমি ভেঙে পড়ো না। তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

ওদিকে সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ে জাহাজঘাটে এসে উপস্থিত হল। ম্লান জোৎস্নায় ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ভালো করে দেখল। জাহাজের কোথাও আলো জ্বলছে না। বোঝাই যাচ্ছে বিদেশিরা নিশ্চিন্ত ঘুমে।

সেনাপতি দাড়ি-গোঁফওয়ালা দলপতিকে ডাকল। গলা নামিয়ে বলল, দুজন জলে নামো। ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজটার হালের কাছে ওঠো। কোনো শব্দ না হয় যেন। হাল বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠবে। কেউ কেউ ডেকেও শুয়ে থাকতে পারে। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে কাঠের পাটাতনটা আস্তে আস্তে পেতে দেবে। পাটাতন দিয়ে উঠে সৈন্যরা আক্রমণ করবে। যাও। জলদি।

দাড়ি গোঁফওয়ালা দলপতি সঙ্গী জোগাড় করে সমুদ্রের ধারে এল। জলে কোনো শব্দ না তুলে নামল। ডুব দিল দুজনে। হালের কাছে গিয়ে ভেসে উঠল। হালে পা রেখে রেখে ঝুলন্ত দড়িদড়া ধরে ডেকে উঠে এল। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখল চার-পাঁচজন বিদেশি ডেকে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

দুজনে পা টিপে টিপে সিঁড়িঘরের কাছে এল। পাটাতনটা পড়ে আছে দেখল। দুজনে মিলে পাটাতনটা নিয়ে জাহাজের মাথার কাছে এল। আস্তে আস্তে পাটাতনটা তীরের বালিমাটিতে ঠেকিয়ে পেতে দিল। সমুদ্রের বাতাস জোরে বইছে। সিনেত্রা ও অন্যেরা আরামে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। তাদের মধ্যে নজরদার পেড্রো, জাহাজচালক ফ্লেজারও রয়েছে। হ্যারি কেবিনঘরে ঘুমিয়ে আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে সৈন্যরা একে একে দ্রুত জাহাজের ডেকে উঠে এল। ঘুমন্ত

সিনেত্রাদের ঘিরে দাঁড়াল ওরা। দাড়ি গোঁফওয়ালা এগিয়ে এল। খোলা তরোয়ালের ডগা দিয়ে সিনেত্রাকে খোঁচা দিল। বার তিনেক খোঁচা দিতে সিনেত্রা ধড়মড় করে উঠে বসল। খোলা তরোয়াল হাতে চারদিকে দাঁড়ানো সৈন্যদের দেখে ও তো হতবাক। দাড়ি গোঁফওয়ালা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চাপাস্বরে বলল, চুপ, কোনো শব্দ নয়। সিনেত্রার মুখ দিয়ে আর কোনো শব্দ বেরুল না। সৈন্যরা এবার তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে যে ছ-সাত জন ভাইকিং ডেকে ঘুমোচ্ছিল তাদের জাগাল। সবাই উঠে বসল। তখনও ওদের ঘুমের ভাব কাটেনি। সবাই বুঝল লড়াইয়ের কোনো সুযোগ নেই। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি এভাবে বন্দীদশা মেনে নিতে হবে। দাড়ি-গোঁফওয়ালার নির্দেশে এবার সৈন্যরা সিঁড়িঘরের দিকে গেল। সিঁড়িতে কোনোরকম শব্দ না তুলে ওরা কেবিনঘরগুলোতে ঢুকতে লাগল। ঘুমন্ত ভাইকিংদের ঘুম ভাঙিয়ে ওপরে ডেকে নিয়ে আসতে লাগল। মারিয়া, ভেনও বাদ গেল না। মারিয়াকে দেখে সৈন্যরা অবশ্য একটু অবাকই হল। কিন্তু তাকেও রেহাই দিল না। সবাইকে ডেকে এনে সারি দিয়ে বসানো হল। সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

রাত শেষ হয়ে এল। কালো আকাশে সাদা রং ধরল। একটু পরেই পূবে সূর্য উঠল। সকালের নিস্তেজ রোদ ছড়াল আকাশে সমুদ্রে জাহাজে।

দাড়ি-গোঁফওয়ালা গলা চড়িয়ে বলল, রাজা জোস্তাকের হুকুমে তোমরা সব বন্দী হলে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা ছুটে পালাতে গেলে মরবে। চলো সবাই।

সৈন্যদের প্রহরায় ভাইকিংরা একে একে জাহাজ থেকে নেমে এলো। সৈন্যরা ওদের ঘিরে নিয়ে চলল রাজধানীর দিকে। সমুদ্রের দিক থেকে দমকা হাওয়া ছুটে আসছে। বালি উড়ছে। রোদও চড়েছে। তার মধ্যে দিয়ে ভাইকিংরা চলল।

হাঁটতে হাঁটতে সিনেত্রা হ্যারিকে বলল, ফ্রান্সিসরাও বন্দী। আমরাও বন্দী হলাম। মুক্তির কোনো উপায়ই তো দেখছি না

ফ্রান্সিসের ওপর ভরসা রাখো। ও নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করবে। হ্যারি বলল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকাল। দেখেই বুঝল—এই রোদের মধ্যে গরম বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে রাজকুমারীর বেশ কষ্ট হচ্ছে। ও ভাবল দাড়ি-গোঁফওয়ালাকে রাজকুমারীর এই কষ্টের কথা বলবে। দেখা যাক সৈন্যটি কী বলে?

ও দাড়ি-গোঁফওয়ালার কাছে এল। বলল, একটা কথা বলছিলাম।

কী কথা? সৈন্যটি বেশ গম্ভীর গলায় বলল।

সেনাপতি কি চলে গেছেন? হ্যারি জানতে চাইল।

হ্যাঁ। তাকে কীসের দরকার।

বলছিলাম, ঐ মেয়েটি আমাদের দেশের রাজকুমারী। উনি এই বন্দীদশা, এত কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না।

সহ্য করতে হবে। রাজা জোস্তাকের হুকুম সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে। কারো রেহাই নেই।

রাজকুমারীকে আর বয়স্ক ভেনকে জাহাজে রাখলে ভালো হত। ওঁরা তো আর জলে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে পারবেন না।

কোনো কথা নয়। সবাইকে অস্ত্রঘরে বন্দী থাকতে হবে। তোমার বন্ধুরা আমাদের ফাঁকি দিয়ে একবার পালিয়েছে। বারবার পারবে না। দাড়ি-গোঁফওয়ালা বলল।

হ্যারি আর কোন কথা বলল না। মারিয়ার কাছে এল। বলল, রাজকুমারী, বুঝতে পারছি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। ওদের বললাম সে কথা। কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না।

না না, মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ওদের কোনো অনুরোধ করতে যেও না। তোমরা কষ্ট সহ্য করছ আর আমি পারব না?

ঠিক আছে। এ ব্যাপারে ফ্রান্সিস কী করে দেখি। হ্যারি বলল।

দু'পাশে রাজধানীর বাড়ি-ঘর-দোর দেখা গেল। লোকজন সাগ্রহে ফ্রেজারদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বিশেষ করে মারিয়াকে দেখেই ওরা উৎসুক হল বেশি। এই বিদেশিরা কোত্থেকে এল? এদের বন্দীই বা করা হল কেন? ওরা রাজা জোস্তাককে ভালো করে চেনে। যা বদরাগী রাজা এরা সহজে রেহাই পাবে না।

ফ্রান্সিস অস্ত্রঘরের মেঝেয় শুয়েছিল। বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, সৈনদের চলার শব্দ ওর কানে গেল। ও উঠে বসল। মৃদুস্বরে বলল, শাঙ্কো, বোধহয় বন্ধুদের বন্দী করে আনা হল।

তখনই অস্ত্রঘরের দরজা খুলে গেল। হ্যারিরা একে একে ঢুকতে লাগল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, হ্যারি, লড়াই তো হয়নি?

আমরা তখন গভীর ঘুমে। কথাটা বলতে বলতে হ্যারি এসে ফ্রান্সিসের

পাশে বসল।

একটা বিরাট ভুল হয়েছে আমার। তোমাদের সময়মতো সাবধান করতে পারিনি। পেড্রোকে যদি নজরদারির জন্যে রাখা হত তবে তোমরা এত সহজে বন্দী হতে না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। ভুলের সে মাসুল দিতেই হবে। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বলল, এ কেমন কয়েদঘর? দরজা চেপে বন্ধ করা। একটা জানালাও নেই।

এটা কয়েদঘর নয়। কয়েদঘরটা আমরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি। এটা অস্ত্র রাখার ঘর ছিল।

তাই এরকম দম বন্ধ করা পরিবেশ। হ্যারি বলল।

হ্যাঁ। এখানেই থাকতে হবে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

মারিয়া এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, দাঁড়িয়ে থেকো না। বসো। বিশ্রাম করো। মারিয়া ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। মৃদুস্বরে বলল, এ তো অন্ধকূপ-হত্যা।

বন্দীদশা এরকমই হয়। বলে মারিয়ার শ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার শরীর ভালো আছে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি আমার জন্যে ভেবো না। মারিয়া ম্লান হাসল।

হ্যারি বলল, জান, রাজকুমারী আর ভেনকে জাহাজেই রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গোঁফ ওয়ালা লোকটা আমার কথা কানেই তুলল না।

ওকে বলে কিছু হবে না। রাজা জোস্তাককে বলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা জোস্তাক আবার কেমন মানুষ কে জানে। হ্যারি বলল।

দেখা যাক। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

বন্ধুদের মধ্যে তখন গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ছোট ঘরে বেশ গাদাগাদি করে বসতে হয়েছে সবাইকে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। তখনই ফ্রেজার বলল, ফ্রান্সিস, এই ঘরে থাকলে আমরা বোধহয় বাঁচব না। যা হোক করে মুক্তির উপায় ভাবো।

ভাবছি। পাহারার ব্যবস্থাটা ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। তারপর পালানোর ছক কষতে হবে।

সন্ধ্যেবেলা সেনাপতি এল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গলা বাড়িয়ে হেসে বলল, শুনেছি তোমরা নাকি খুব কষ্ট সহিষ্ণু, বীর জাতি। এই অস্ত্রঘরে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

খুব ভালো আছি আমরা। এখনও দম বন্ধ হয়ে মরে যায়নি। হ্যারি গলা নামিয়ে বলল।

সেনাপতি কথাটা ঠিক বুঝল না। বলল, কী বললে?

ফ্রান্সিস বলে উঠল, কিছু না। একটা দরকারি কথা বলছিলাম।

কী বলবে বলো।

বলছিলাম রাজা জোস্তাকের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

আগেই বলেছি কোন লাভ নেই। রাজা জোস্তাক এককথার মানুষ। তোমাদের মুক্তি দেবে না। সেনাপতি বলল।

ঠিক আছে। অন্তত একবার বলে দেখুন। আমরা মুক্তি চাই না। এভাবে দমবন্ধ হয়ে মরতে চাই না। বলবেন দরকারি কয়েকটা কথা বলব। ফ্রান্সিস বলল।

অত করে বলছ। ঠিক আছে, রাজাকে বলব। সেনাপতি চলে গেল, দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল।

রাতের খাওয়াটা ভালোই হল। পাখির মাংস, রুটি আর আনাজের ঝোল। ক্ষুধার্ত ভাইকিংরা পেট পুরে খেল। কিন্তু রাতটা কাটল বেশ কষ্টে। কারো প্রায় ঘুমই হল না। ফ্রান্সিস খুবই চিন্তায় পড়ল। বিশেষ করে মারিয়ার জন্যে। এভাবে কতদিন চলবে? হ্যারিরও সহ্যক্ষমতা কম।

'সবে সকালের খাবার খাওয়া হয়েছে সেনাপতি এল। বলল , রাজা জোস্তাক খুবই দয়ালু। তোমার কথা শুনতে রাজি হয়েছেন। তবে আগেই বলেছি আজে -বাজে কথা একদম বলবে না। রাজা চটে গেলে কিন্তু তোমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

চলে এসো। রাজসভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। চারজন সৈন্য এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

ওরা সৈন্যদের পাহারায় সভাকক্ষে ঢুকল। তখন কোনো বিচার চলছিল না। দুদিকে পাথরের জানালা থাকা সত্ত্বেও সভাকক্ষ বেশ অন্ধকার। পাথরের সিংহাসনে রাজা বসে আছে। দু'পাশের আসনে সেনাপতি ও মন্ত্রী। সভাকক্ষে প্রজাদের বেশ ভিড়। সিংহাসনে বসেই রাজা একনাগাড়ে বলে চলেছে, কাজেই আমাদের সাবধান হবার সময় এসেছে। দক্ষিণের রাজ্যের জংলীদের সর্দার যে কোনোদিন আমার রাজত্ব আক্রমণ করতে পারে। ঐ দলপতি রাজা মিলিন্দার

গোপন ধনৈশ্বর্যের সংবাদ জানে। ওদের লক্ষ্য সেই ধনৈশ্বর্য উদ্ধার করা। এই জন্যেই ওরা আমার রাজত্ব দখল করতে চায়। তখন লড়াই হবে। আমার সৈন্যবাহিনী রয়েছে। কিন্তু তোমাদেরও লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজা থামল। উপস্থিত প্রজারা ধ্বনি তুলল, রাজা জোস্তাকের জয় হোক।

রাজা জোস্তাকের কথা শুনে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। এই রাজত্বের কোথাও গুপ্ত ধনৈশ্বর্য আছে এটা ও প্রথম শুনল না। সেনাপতিও বলেছিল। রাজা জোস্তাক আর কিছু বলল না। গুপ্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ফ্রান্সিস আর কিছু জানতে পারল না। দরবারকক্ষ থেকে প্রজারা বেরিয়ে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরবার কক্ষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ল।

রাজা ফ্রান্সিসদের দেখল। সেনাপতি আসন থেকে উঠে রাজার কাছে এল। কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে গেল। রাজা বলল, তোমরা বিদেশি—ভাইকিং।

হ্যাঁ। এ তো আগেই বলেছি। ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে গিয়ে বলল।

কী বলতে চাও তোমরা? রাজা জানতে চাইল।

কয়েদঘর নয় অস্ত্রঘরে আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। ঘরে একটা জানালাও নেই। কোনো ফোকরও নেই। দরজা সবসময় বন্ধ করে রাখা হয়। আমরা এতজন একসঙ্গে আছি। দম বন্ধ হয়ে আসে।

কয়েদঘর তোমরাই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছ। এবার তার ফল ভোগ কর। রাজা বলল।

একটা আর্জি। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। বলো।

আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের দেশের রাজকুমারী আর একজন বয়স্ক বৈদ্য। তারা দুজন এত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। তাদের অন্য কোথাও বন্দী করে রাখা হোক।

না, সবাইকে ঐ অস্ত্রঘরে থাকতে হবে। তোমাদের এভাবে আমার রাজত্বে আসা সন্দেহজনক। নিশ্চয়ই তোমাদের কোন উদ্দেশ্য আছে রাজা বলল।

কোন উদ্দেশ্য নেই। আগেও বলেছি এখনও বলছি জাহাজ চালাতে চালাতে এসে পড়েছি। আমরা এরকমই কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই দ্বীপে দ্বীপে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আপনাকে আগেই বলেছি আরো একটা কাজ আমরা করি। গুপ্তধন ভাণ্ডারের খোঁজ পেলে কোন সূত্র ধরে চিন্তা আর বুদ্ধি খাটিয়ে আমি আর বীর বন্ধুরা সেসব উদ্ধার করি।

—যাকগে সে সব নিয়ে জাহাজে চড়ে পালাও।

—আর সে সব নিয়ে জাহাজে চড়ে পালাও। রাজা গম্ভীর হয়ে বলল।

—না। আগেও বলেছি —যথার্থ মালিককে সব দিয়ে দি। দু-একবার পোশাক খাদ্য কেনার জন্য তাঁর সম্মতি নিয়ে কিছু স্বর্ণমুদ্র নিয়েছি। বাঁচতে হবে তো। নইলে কিছুই নিই নি। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ় স্বরে বলল। রাজা ফ্রান্সিসের এই আত্মপ্রত্যয় দেখে খুব খুশি হল। দেখা যাক এদের দিয়ে কার্যোদ্ধার হয় কিনা। বেশ ভাবান্তর ঘটল রাজার। সাগ্রহে বলল—এই রাজত্বের কোথাও গোপনে রাখা আছে অতীতের এক রাজা মিরান্দার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার। পারবে উদ্ধার করতে। ফ্রান্সিস একটু চমকে রাজার মুখের দিকে তাকাল। মনে পড়ল সেনাপতিও এই গুপ্তধনের কথা কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস বিশেষ আগ্রহ দেখল না। রাজাকে বিশ্বাস নেই। বলল—চেষ্টা করতে পারি।

—উঁহু। তোমরা কাল থেকেই লেগে পড়ো। রাজার লোভর্তি চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝল রাজা সত্যিই গুপ্তধনের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। আবার ভাবল—অস্ত্রঘরের নরকযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে গেলে যত শিগগির সম্ভব গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে। বলল—দেখুন গুপ্ত ঐশ্বর্য সন্ধান করে উদ্ধার করতে পারবো এরকম কথা দিতে পারবো না। তবে রাজ্যের চারদিকে দেখে শুনে চিন্তা ভাবনা করে তবেই উদ্ধার করতে পারবো। তারপর বলল—যদি অনুমতি দেন তবে কাল থেকেই লাগতে পারি।

—খুব ভালো কথা। রাজা হেসে বলে উঠলেন।

—কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো বলো সাগ্রহে রাজা বলল।

—শুধু আমরা তিনজন থাকবো। বাকি সব বন্ধুদের মুক্তি দিয়ে জাহাজে চলে যেতে দিতে হবে।

—উঁহু। তা হবে। গুপ্ত ঐশ্বর্য উদ্ধার করলে তবেই তোমরা মুক্তি পাবে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারিও চাপাস্বরে বলল—এ সুযোগ হাতছাড়া করো না। কাজ হয়ে যাবে।

—বেশ—ফ্রান্সিস বলল—আমাদের তিনজনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। খোঁজখবর নিতে যে কোন জায়গায় আমাদের যেতে দিতে হবে। কোন শর্ত চাপানো চলবে না।

—আপত্তি নেই। খোঁজ খবর সেরে ঐ অস্ত্রঘরেই ফিরে আসতে হবে। একটা কথা—তোমাদের সঙ্গে সব সময় থাকবে—এক বিশ্বস্ত যোদ্ধা—রাজা বলল।

—কেন?

—তোমরা পালিয়ে যেতে পারো। রাজা বলল।

—রাজকুমারীকে, বন্ধুদের বন্দী রেখে আমরা পালিয়ে যাবো? এটা আপনিও ভাবতে পারেন—আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। কাল থেকে কাজে লেগে পেড়ো। তবে ঐ গুপ্ত ঐশ্বর্য—পারবে না উদ্ধার করতে। রাজা মিলিন্দার পরে যারা রাজা হয়েছিল—তারা অনেকদিন চেষ্টা করেও পারেনি। তাদের তো লোকবল কিছু কম ছিল না।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস মাথা উঠানামা করে বলল।

ফ্রান্সিসরা সৈন্যদের পাহারায় অস্ত্র ঘরে ফিরে এল। ওদের দুজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মারিয়ার বন্ধুরা গভীর আগ্রহে ফ্রান্সিসদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বলল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—কিছু সুরাহা হল? হ্যারি মাথা নাড়ল। তারপর রাজার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার রাজার শর্ত সব বলল। সকলেই শুনল সে সবকথা। বুঝল—এই দমবন্ধ করা বন্দী দশা থেকে আপাতত মুক্তি নেই। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গুপ্তধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে।

—সে আর বলতে। তবে এরকম পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়িনি। খোঁজ খবর চালাতে হবে। দ্রুত। বিশ্রাম টিশ্রাম কপালে নেই। যত তাড়াতাড়ি ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো তত তাড়তাড়ি মুক্তি পাবো। ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল—কিন্তু হ্যারি ঐ ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে তেমন কোন তথ্যই এখানো জোগাড় করতে পারেনি। যা হোক—দুপুরের খাবার খেয়েই কাজে নামতে হবে।

—প্রথম কী ভাবে খোঁজ খবর শুরু করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—প্রথম রাজবাড়ির ভেতরটা দেখবো। তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। দেখি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই কিনা।

—না পেলে? হ্যারি প্রশ্ন করল।

রাজা জোস্তাকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। গুপ্তধন সম্পর্কে সে কতটা জানে তা জানতে হবে। সেই গুপ্তধন কোথায় থাকতে পারে বলে তার ধারণা। রাজাও তো এই ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর করেছে, ভেবেছে। দেখা যাক সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

হবে। রাজার কী অনুমান সেটা জানতে হবে।

তাহলে তো কালকে রাজসভায় যেতে হবে। হ্যারি বলল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে বলল, রাজবাড়িতে চলো।

মারিয়া বলে উঠল, আমিও যাব।

বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো উঠে গিয়ে দরজায় জোরে ধাক্কা মারল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। প্রহরী মুখ বাড়িয়ে বলল, দরজা ধাকাচ্ছ কেন?

সেনাপতিকে ডেকে দাও। কথা আছে। শাঙ্কো বলল।

হুঁ। প্রহরী পাল্লা বন্ধ করে চলে গেল।

কিছু পরে সেনাপতি এল। দরজার দুটো পাল্লা খুলে বলল, কী ব্যাপার?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল, রাজা জোস্তাকের সঙ্গে আমার কী কী কথাবার্তা হয়েছে তা আপনি শুনেছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। সেনাপতি মাথা কাত করল।

আমরা রাজবাড়িতে খোঁজটোজ করতে যাব।

বেশ, সেনাপতি বলল। তারপর পেছন ফিরে দাঁড়ি গোঁফওয়ালা সেই সৈন্যটিকে বলল, এরা তিনজন রাজবাড়িতে খোঁজাখুঁজি করতে যাবে। এদের কড়া পাহারায় রাখতে হবে। যেন পালাতে না পারে।

কে কে আসবে এস। দাড়ি গোঁফওয়ালা বলল।

মারিয়া, হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে ফ্রান্সিস অস্ত্রঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দাঁড়ি-গোঁফওয়ালার পাহারায় রাজবাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে ফ্রান্সিস বলল, আমরা খোঁজটোজ করব। আর তুমি আমাদের পাহারায় থাকবে। কাজেই তোমার নামটা তো জানা দরকার।

সৈন্যটি দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমার নাম লার্দো।

বাঃ সুন্দর নাম, হ্যারি হাসি চেপে বলল। লার্দো দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে হাসল। বলল, লার্দো মানে হল মোটা।

নামটা কে দিয়েছিল? শাঙ্কো জিগ্যেস করল।

দিদিমা। ছোটবেলায় খুম মোটা ছিলাম তো, লার্দো বলল।

এখনও কিছু কম যাও না। হ্যারি মুখ টিপে বলল। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল।

চোপ! কোনো বাজে কথা না। লার্দো বলল, বেশ ধমকের সুরে।

তরোয়ালটা খাপে ভরে ফেলো। শাঙ্কো নিরীহ ভঙ্গিতে বলল।

না-না। সেনাপতির হুকুম, কোনো রকম বেচাল দেখলে তরোয়াল চালাবে, লার্দো বলল।

ফ্রান্সিসরা আর কিছু বলল না। সবাই সদর দেউড়ি পার হয়ে রাজ বাড়িতে ঢুকল। অন্দরমহলের দরজায় দুজন প্রহরী বর্শাহাতে পাহারা দিচ্ছে। লার্দো এগিয়ে গিয়ে বলল, এই বিদেশিদের রাজা অনুমতি দিয়েছেন। এরা অন্দরমহল ঘুরে দেখবে। মাননীয়া রানিকে বলো গে। একজন প্রহরী চলে গেল। কিছু পরে ফিরে এল। বলল, যাও,। তবে মাননীয়া রানি হুকুম দিয়েছেন তোমরা বেশিক্ষণ থাকবে না।

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই অন্দরমহলে ঢুকল। পাথরের ঘর-দোর খুব সুসজ্জিত। দামি কাঠের আসবাবপত্র। বিছানায় দামি কাপড়ের সজ্জা। ফ্রান্সিস অবশ্য সে সব দেখছিল না। দেখছিল পাথরের দেয়াল, ছাদ। দেয়ালে রঙিন ছবি আঁকা। পাথরের দেয়াল নিরেট। দেয়ালের মধ্যে কোন গোপন কুঠুরি থাকার সম্ভাবনা নেই।

ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে সব ঘর দেখল। কোথাও কোন সাংকেতিক চিহ্ন পেল না। ঘরগুলো, দেয়ালগুলো খুব পরিচ্ছন্ন। ফ্রান্সিসের কেমন মনে হল রাজবাড়িটা খুব বেশিদিন তৈরি হয়নি। তবু লার্দোকে জিজ্ঞেস করল, এই রাজবাড়িতে কোনো পুরোনো পরিত্যক্ত ঘর বা পাথরের মেঝের নীচে ঘর আছে?

না, এই রাজবাড়ি বেশিদিনের নয়। রাজা জোস্তাকের পিতার আমলের তৈরি। লার্দো বলল।

এটা আমারও মনে হয়েছে। আচ্ছা রাজা মিলিন্দার আমলে রাজবাড়ি কোথায় ছিল, ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—সে তো উত্তর দিকের টিলার নিচে। এখন ধ্বংসাব শেষ। লার্দো বলল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—ওটাই দেখবো। চলো।

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা উত্তরমুখো চলল। দূর থেকেই একটা ঝোপ জঙ্গল ঢাকা টিলা দেখল। কাছাকাছি আসতে দেখল টিলার নিচেই পুরনো রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। ওরা পাথরের ভাঙা পাটা ছড়ানো জায়গাটায় এল। এখন আর ঐ ধ্বংসাবশেষ দেখে বোঝার উপায় নেই

কোথায় ছিল সদর দেউড়ি কোথায় ছিল রাজসভা অন্দরমহল বা বারান্দা জানালা দরজা। স্তূপাকার পাথরের পাটা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিছুক্ষণ সেই ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে থেকে ফ্রান্সিস বলল—সব কিছু ভালোভাবে দেখতে হবে। চলো ধ্বংসস্তূপের ওপরে ওঠা যাক।

—এখানে দেখার কী আছে? সবই তো ভেঙে শেষ। লার্দো বলল।

—রাজসভা দরজা অন্দরমহল দেখে দেখে এসব বুঝে নিতে হবে। তুমি বরং নিচে থাকো। তুমি তো একটু মোটা মানুষ। তুমি পারবে না।

—না-না। রাজার হুকুম। তোমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে। লার্দো মাথা নেড়ে বলল।

—তাহলে এসো। শাঙ্কো বলল।

সবাই সাবধানে ভাঙা পাথরের ওপর পা রেখে ধ্বংসস্তূপের একেবারে ওপরে উঠে এল। ভাঙা পাথরের মধ্যে বুনো গাছগাছালি গজিয়েছে। অনেক জায়গায় জংলা ঝোপঝাড়। পাথরে শ্যাওলার মোটা ছোপ। ফার্ণ গাছ।

এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে একটা ধ্বসে যাওয়া অংশের কাছে এল। ধ্বসের পাশেই একটা গহ্বর মত। ফ্রান্সিস গহ্বরটার মাথায় হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মুখ নিচু করে তাকাল। গহ্বরের উত্তর দিকে ধ্বসে গেছে বলে গহ্বরটায় রোদ পড়েছে। তবু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আবছা দেখল একটা ভাঙা ঘরের অংশ। ওর মনে প্রশ্ন — এই অংশটাতেই কি রাজবাড়ির অন্দর মহল ছিল। এই ভাঙা অংশ দিয়ে নেমে দেখতে হবে। এমনি ধ্বসে যাওয়া আরো ঘর হয়তো পাওয়া যাবে। ঠিক তখনই ভাঙা পাথরে পিছনে হ্যারি পড়ে যেতে যেতে একটা বুনো ঝোপে আটকে গেল। ফ্রান্সিস্ ভাঙা পাথরে ভারসাম্য রেখে যতটা দ্রুত সম্ভব হ্যারির কাছে। হ্যারিকে টেনে তুলে দাঁড় করালো। তেমন কিছু আঘাত নয়। হ্যারি হেসে বলল—আমি ঠিক আছি। তোমরা যা দেখার দেখ। হ্যারির হাঁটু কনুই ছেড়ে গেছে। অল্প রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

—আজ বেলা হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। চলো ফিরি। কালকে আসবো ফ্রান্সিস বলল।

চার জনে ভারসাম্য রেখে আস্তে আস্তে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস বলল হ্যারি চলো আগে রাজার সঙ্গে কথা বলে নি। তারপর পুরনো রাজবাড়ির দিকে যাবো।

ওরা যখন রাজসভায় এল তখন দেখল রাজা মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে। রাজসভায় আজ ভিড় কম। কথাবার্তা শেষ করে রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। বলল—কী? কিছু হদিশ করতে পারলে?

—সবে তো খোঁজ শুরু করেছি। এতদিন আগে গোপন রাখা ধনসম্পদ—কিছু দিন তো সময় লাগবে। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছি। এই গুপ্তধন কোথায় থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী করে বলি। রাজা বলল।

—তবু—আপনার অনুমান? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজবাড়ির কোথাও। রাজা বলল।

না। রাজবাড়ি আমি তন্নতন্ন করে দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল

—তাহলে এই রাজত্বেরই কোথাও। রাজা বলল।

—আচ্ছা—প্রাচীন রাজবাড়িতে? ফ্রান্সিস বলল।

—ও তো ধ্বংসস্তূপ! রাজা বলল।

—কিন্তু রাজা মিলিন্দা তো ঐ রাজবাড়িতেই থাকতেন। ফ্রান্সিস বলল

—হ্যাঁ শেষ জীবনে ঐ বাড়িতে ছিলেন। রাজা বলল।

—উনি কী ভাবে মারা গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। রাজা বলল।

—এমনও তো হতে পারে উনি মৃত্যুর আগে কাউকে বলে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—রানি আগেই মারা গিয়েছিলেন। রানি ছাড়া আর কাকে ব'লে যাবেন। রাজা বলল।

—ছেলেমেয়ের কাউকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো গোপনীয় কিছুই থাকতো না। রাজা বলল।

—যা হোক—যা বুঝতে পারছি প্রাচীন ভাঙা রাজবাড়িতেই কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল।

লার্দোর পাহারায় ওরা প্রাচীন ভাঙা প্রাসাদের কাছে এল। ফ্রান্সিস ঘুরে টিলার দিকে গেল। ওপর থেকে যে গহ্বরটা দেখেছিল তার পাশে এল। একটা আধভাঙা দেয়ালের ওপাশেই গহ্বরটা। ও পাথরের পাটার খাঁজে

খাঁজে পা রেখে রেখে দেয়ালে উঠল। তরপর দেয়ালের ওপাশে একই ভাবে নামল। গহ্বরের ভাঙা অংশে রোদ পড়েছে। অস্পষ্ট হলেও ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে নেমে এল। দেখল ভাঙা পাথরের পাটায় ঢাকা একটা মেঝে মত। চারপাশে তাকিয়ে আন্দাজ করে বুঝল এখানে একটা বড় ঘর ছিল। খুব সম্ভব অন্দরমহলের ঘর। মেঝের ওপর জমে থাকা পাথরের ভাঙা পাটাতন সরাতে পারলে ঘরটা দেখা যাবে। ও মুখ উঁচু করে ডাকল—শাঙ্কো শাঙ্কো।

—বলো। শাঙ্কোর গলা শুনল। ও বলল—আমার মত দেয়াল ধরে ধরে এখানে নেমে এসো। লার্দোকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। হ্যারি পারবে না। হ্যারি থাক্।

কিছু পরে শাঙ্কো আর লার্দো নেমে এল। ফ্রান্সিস বলল—হাত লাগাও। সব ভাঙা পাথরের পাটা সরাতে হবে।

তিনজন মিলে পাথরের ভাঙা পাটা তুলে তুলে একপাশে জড়ো করতে লাগল। গহ্বরে শব্দ হতে লাগল। খট্ খট্ খটাৎ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের মেঝেটা দেখা গেল। সেই স্বল্পালোকে ফ্রান্সিস মেঝেটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কোন বিশেষ চিহ্ন কিছু দেখল না। দক্ষিণ কোণায় গিয়ে দেখল এদিকটায় ধ্বস নেমেছে। সেখানে একটা কিছুর কোনা বেরিয়ে আছে। ফ্রান্সিস ডাকল শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ দেখ। একটা চৌকোনো ফোকর। ওখানকার পাথর সরাও। তিনজনে ওখানকার পাথর সরাতে লাগল। জায়গাটা পরিষ্কার হল। দেখা গেল একটা চৌকোনো গর্ত মত। গর্তের গা মসৃণ পাথরের। বোঝাই যাচ্ছে এই চৌকোনো গর্তে কছু রাখা ছিল। ফ্রান্সিস গর্তটার চারপাশ ভালো করে দেখতে দেখতে বলল—শাঙ্কো এইখানে রাজকোষ ছিল। নিশ্চয়ই কোন কাঠের অথবা লোহার বাক্স এখানে ছিল। রাজা মিলিন্দার আমলে।

—তাহলে কোথায় গেল সেই বাক্স? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই প্রশ্ন মনে হয় রাজা মিলিন্দা সেই রাজকোষ অন্য কোথাও গোপনে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু ফ্রান্সিস —এও তো হতে পারে যে পরের কোন রাজা সেটা পেয়েছিলেন। শাঙ্কো বলল।

—উঁহু। তাহলে সেটা গোপন থাকতো না। সবাই জানতো। সন্দেহ নেই—এখান থেকে রাজকোষ অন্যত্র কোথাও সরানো হয়েছিল—কাজেই

এখানে আর দেখার কিছু নেই। এখানে সব ভেঙেচুরে গেছে এই অংশটুকুই যা মোটামুটি আস্ত আছে। এবার অন্য জায়গাগুলো দেখতে হবে। চলো টিলাটা ভালো করে দেখি।

তিনজনে ভাঙা দেয়ালে পা রেখে রেখে উঠে এল। হ্যারি বলল—কিছু হদিশ পেলে? ফ্রান্সিস সব বলল। হ্যারি বলল—বোঝাই যাচ্ছে রাজা মিলিন্দার রাজকোষ অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় রেখেছেন।

চারজন ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে টিলার ওপরে উঠল। টিলার মাথাটা নিরেট পাথরের। টিলার মাথা থেকে ফ্রান্সিস চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু লুকিয়ে রাখার মত কোন গুহা বা গর্ত দেখতে পেল না।

এখানে কালকে আবার আসবো ফান্সিস বলল। জঙ্গল এলাকাটা দেখতে হবে। বেলা হয়েছে। ফিরে চলো এখন।

চারজন ফিরে এল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি চলো রাজার কাছে যাবো। প্রাচীন রাজাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ যা দেখলাম সে সব নিয়ে কথা বলবো। তখন বন্ধুরা কয়েকজন এগিয়ে এসে বলল—ফ্রান্সিস এভাবে বন্ধ ঘরে অসহ্য গরমে রাতদিন —তুমি রাজাকে বলো এভাবে থাকলে আমরা বাঁচবো না। ফ্রান্সিস বলল—আমার চিন্তা মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে। তোমরা তবু সহ্য করতে পারবে অন্তত কিছুদিন। কিন্তু মারিয়া আর হ্যারি কতদিন পারবে সেটাই চিন্তার। কাল থেকে দিন রাত ধরে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুপ্তধন ভাণ্ডার উদ্ধার করবো। তাহলেই আমাদের মুক্তি। অনুরোধ — ধৈর্য হারিও না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। বন্ধুরা আর কিছু বলল না।

তখনই লার্দো এসে হাজির। বন্ধ দরজার একটা পাল্লা খুলে ও মুখ বাড়াল। বলল কী? তোমরা বেরোবে নাকি?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো আর হ্যারি তৈরিই ছিল।

লার্দোর পাহারায় ওরা রাজবাড়ি চলল।

রাজসভায় আজ বিচার চলছিল। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় বিচার শেষ হল। রাজা ডান হাত তুলে অপরাধীকে দেখিয়ে বলে উঠল — একে অভিশপ্ত দ্বীপে রেখে আয়। বিচারের শাস্তির কথা

শুনে অপরাধী লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল—

—আমাকে এই শাস্তি দেবেন না মহামান্য রাজা। আমাকে অন্য শাস্তি দিন। অপরাধী বার বার বলতে লাগল।

—না। অভিশপ্ত দ্বীপে নির্বাসন যা। রাজা মাথা নেড়ে বলল। দুজন সৈন্য এগিয়ে এসে অপরাধীকে টেনে ধরে নিয়ে চলল। অপরাধী চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। সৈন্য দুজন ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। লোকটা তখনও তারস্বরে কেঁদে চলেছে।

ফ্রান্সিস এই প্রথম অভিশপ্ত দ্বীপের কথাটা বলল। ও বুঝল না এরকম নাম একটা দ্বীপের? কেন? ফ্রান্সিস কথাটা ভাবছে তখনই সেনাপতি বলল তোমরা এগিয়ে এসো। কী বলতে চাও বলো। ফ্রান্সিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ধ্বংপ্রাপ্ত পুরনো রাজাপ্রাসাদে কী ঘটল সব বলল। সবশেষে বলল—যতদূর বুঝতে পারছি রাজা মিলিন্দার রাজকোষ ঐ প্রাসাদেই ছিল। উনি পরে মন পরিবর্তন করে অন্য কোন গোপন স্থানে রেখেছেন।

—হুঁ। তা এখন কী করতে চাও? রাজা জোস্তাক বলল।

—অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ খুঁজে। রাজা বলল।

—একটা কথা বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বলল।

—অভিশপ্ত দ্বীপ কি একটা দ্বীপ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ ছোট দ্বীপ একটা। রাজা বলল।

—অভিশপ্ত বলা হচ্ছে কেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—ঐ দ্বীপে নামলে কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারে না। রাজা বলল

—কেন? ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ঐ দ্বীপে তর্নার নামে এক রকমের বিষাক্ত গাছ আছে। সেই গাছের পাতার রং সবসময়ই হলদু। বসন্তকালে সেই গাছে টকটকে লাল রঙের ফুল হয়। গাছ-ফুল সবই বিষাক্ত। ঐ দ্বীপে নামলেই অবধারিত মৃত্যু। ঐ অভিশপ্ত দীপের ধারে কাছেও কেউ যায় না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে ঐ দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া হয়। দু'হাত-পা বেঁধে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কারণ ঐ দ্বীপের মাটিও বিষাক্ত।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, আমরা ঐ দ্বীপ দেখতে যাব।

ঐ দ্বীপের ধারেকাছেও যেও না। মরবে। রাজা বলল।

দূর থেকেই দেখব। একটা নৌকো দেবেন? ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। একটা ডোঙা নৌকো পাবে। রাজা বলল।

আর একটা কথা—গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

এমনভাবে বলছ যেন গুপ্তধন উদ্ধার করে ফেলেছ। রাজা বাঁকা হাসি হাসল।

আমি ওভাবেই কথা বলি। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। তোমাদের তারপরে মুক্তি দেওয়া হবে।

আর খাবার জল আর খাদ্য দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দেখা যাক, আগে উদ্ধারকাজ সারো।

সেনাপতি আসন থেকে উঠে এগিয়ে এল। বলল, চলো।

সেনাপতির সঙ্গে ওরা রাজবাড়ির বাইরে এল। পেছনে লার্দো।

কখন যাবে? সেনাপতি জানতে চাইল।

এক্ষুনি যাব। ফ্রান্সিস বলল।

অত তাড়া কীসের? সেনাপতি বলল।

আপনি বুঝবেন না।

সেনাপতি লার্দোকে বলল, যাও, ওদের একটা ডোঙা নৌকা, দাঁড় দাও। জেলেপাড়ায় পাবে। সেনাপতি চলে গেল।

লার্দোর সঙ্গে ওরা দক্ষিণমুখো চলল। কিছু পরে একটা খাঁড়ির কাছে এল। খাঁড়ির তীরে কিছু বাড়িঘর। বোঝা গেল জেলেপাড়া। তীরভূমির কাছে কিছু গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি নৌকো ভাসছে। লার্দো একটা ডোঙা নৌকো নিয়ে এল। দূরে অভিশপ্ত দ্বীপটা দেখাল সে। তীরভূমি থেকে খুব একটা দূরে নয়।

ফ্রান্সিস ডোঙা নৌকো দেখে বলল, হ্যারি, তুমি থাকো। ডোঙা নৌকো বেশি লোক নিয়ে যেতে পারবে না। লার্দো তো পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।

শাঙ্কো আর লার্দোকে নিয়ে ফ্রান্সিস ডোঙা নৌকোয় উঠল। দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকো চালাল অভিশপ্ত দ্বীপের দিকে।

খাঁড়ির জল শান্ত। নৌকো বেশ জোরেই চলল। দ্বীপের কাছাকাছি এসে

লার্দো বলে উঠল, বেশি কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। নৌকো এখানেই থামাও। ফ্রান্সিস নৌকো থামাল। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে স্পষ্ট দেখা গেল অভিশপ্ত দ্বীপ। পাঁচ-ছ'সাত উঁচু তর্নার গাছ। হলুদ লম্বা লম্বা পাতা। লাল টকটকে ফুল ফুটে আছে। সমুদ্রের হাওয়ায় গাছগুলো মাথা দোলাচ্ছে। এত সুন্দর গাছগুলো অথচ বিষাক্ত।

কিছুটা এগোতেই দ্বীপের দিক থেকে হাওয়া ছুটে এল। ওদের গা জ্বালা করে উঠল। তাহলে গাছ-ছোঁয়া হাওয়াও বিষাক্ত। শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ফিরে চলো।

তর্নার গাছগুলোর জন্যে দ্বীপের মাটি ভালো দেখা যাচ্ছে না। ভালো ভাবে দেখতে গেলে অন্য উপায় নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

কী সেটা? শাঙ্কো বলল।

আমার ছক কষা হয়ে গেছে। আজ ফিরে চলো। কাল দুপুরে তৈরি হয়ে আসব।

আবার কালকে আসবে? লার্দো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, ভালোভাবে সব দেখতে হবে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

ফ্রান্সিস নৌকোর মুখ ঘোরাল। চলল তীরভূমির দিকে।

তীরে ভিড়ল নৌকো। ফ্রান্সিসরা নেমে এল। একটা বড় গাছের তলায় হ্যারি বসেছিল। ফ্রান্সিসের দেখে বলল, ফ্রান্সিস, একটা জিনিস দেখলাম।

কী দেখলে?

ঐ দেখ খাঁড়ির তীরে দুটো বড় পাথরের ধাপ।

ফ্রান্সিস দেখল সেটা। একটু চমকাল। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, নৌকোয় ওঠার ব্যবস্থা, আগে লক্ষ করিনি। তার মানে এখান দিয়ে অভিশপ্ত দ্বীপের দিকে যাওয়া হয়।তাহলে জীবন বিপন্ন না করেও ঐ দ্বীপের মাটিতে ওঠা যায়। কথা শেষে দ্বীপের কী কী দেখেছে সব বলল হ্যারিকে।

জেলেপাড়ায় ডোঙা নৌকো ফিরিয়ে দিয়ে ওরা অস্ত্রঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢোকার আগে ফ্রান্সিস বলল, লার্দো, আজকে আমরা আর টিলার নীচের জঙ্গলে যাব না। কাজেই আমাদের পাহারা দেবার জন্যে তোমাকে আর আসতে হবে না। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ? লার্দো জানতে চাইল।

কাল সকালে ভালো করে তেলে-ভেজানো দুটো মশাল আনতে হবে।

মশাল? দিনের বেলা? লার্দো তো অবাক।

হ্যাঁ। তুমি নিয়ে আসবে। ফ্রান্সিস বলল।

ঘরে ঢুকতে মারিয়া, বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো তখন অভিশপ্ত দ্বীপের কথা, তর্নার গাছের কথা, গা জ্বলুনির কথা সব বলতে লাগল। ওরা শুনে অবাক হয়ে গেল। মারিয়া বলে উঠল, ফ্রান্সিস, ঐ সাংঘাতিক দ্বীপে আবার যাবে নাকি?

হ্যাঁ, ঐ অভিশপ্ত দ্বীপ হচ্ছে ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত জায়গা।

কী বলছ তুমি? সমস্ত দীপটাই তো বিষাক্ত? মারিয়া বলল।

দেখি, দ্বীপের বিষ এড়ানো যায় কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া জানে কৃতসংকল্প ফ্রান্সিসকে নিরস্ত করা যাবে না। কাজেই ও আর কোনো কথা বলল না।

রাতে ফ্রান্সিসের ঘুম হল না। একে অসহ্য গরমে গাদাগাদি করে থাকা, তার ওপর যে ছক করেছে তা কতটা ফলপ্রসূ হবে সে নিয়েও চিন্তা। ছটফট করতে করতে ভোর হয়ে গেল।

বেলা বাড়তে রাঁধুনিরা সকালের খাবার নিয়ে এল। প্রহরীরা পাহারায় রইল। খাবার খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, শাঙ্কো, চেয়ে নিয়ে পেট পুরে খাও। ওখানে কতক্ষণ থাকতে হয় কে জানে! তিনজনেই চেয়ে চেয়ে খাবার খেল।

খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, সিনাত্রার কাছ থেকে চকমকি পাথর আর লোহার টুকরো নাও। শাঙ্কো সিনাত্রার কাছ থেকে সেসব নিল। তারপর কোমরে গুঁজল।

কিছু পরে লার্দো দুটো মশাল নিয়ে এল। সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল খাঁড়ির দিকে। লার্দো ডোঙা নৌকো নিয়ে এল। খাটের মতো পাতা পাথরের ওপর দিয়েই তিনজন নৌকোয় উঠল। হ্যারি গিয়ে গাছের নীচে বসল।

নৌকোয় ওঠার আগে ফ্রান্সিস একমুঠো বালি নিয়ে শূন্যে ওড়াল। বুঝল হাওয়ার গতি উত্তরমুখো। বলল, আমাদের দ্বীপের দক্ষিণ দিকে মানে ওপাশে যেতে হবে। হাওয়ার গতির উল্টোদিকে যাব আমরা।

ফ্রান্সিস দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকো ছাড়ল। প্রায় শান্ত সমুদ্রের খাঁড়ি দিয়ে নৌকো চলল। অভিশপ্ত দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে দ্বীপ ঘুরে দক্ষিণ দিকে এল। দ্বীপের কাছাকাছি নিয়ে এল নৌকোটা। নৌকো থামাল। হাওয়া

উল্টোদিকে বইছে। কাজেই গা জ্বালা করল না। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, মশাল জ্বালো। শাঙ্কো চকমকি পাথরে লোহা ঠুকে ঠুকে দুটো মশালই জ্বালাল। ফ্রান্সিস বলল, উঠে দাঁড়াও। দুজনে নৌকোয় উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল, যত জোরে পারো মশাল ছোঁড়ো ঐ তর্নার গাছগুলোর মধ্যে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে তর্নার গাছের ওপর ছুঁড়ে দিল। শাঙ্কোও জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, সাবাস ফ্রান্সিস।

মুহূর্তে তর্নার গাছের জঙ্গলে আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। ফ্রান্সিস দ্রুত বসে পড়তে পড়তে বলল, এই তল্লাট ছেড়ে সরে যেতে হবে। ধোঁয়া উঠবে। যদিও বাতাস আমাদের উল্টোদিকে বইছে তবু সাবধানের মার নেই। ধোঁয়াও বিষাক্ত। জ্বলন্ত তর্নার গাছ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি উঠল। ধোঁয়া উড়ে যেতে লাগল উত্তর দিকে। উল্টোদিকে ফ্রান্সিস দ্রুত নৌকো চালিয়ে বেশ কিছু দূরে চলে এল।

আগুন জ্বলতে লাগল। কালো ধোঁয়াও উঠতে লাগল ওপরের দিকে। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভে এল। ধোঁয়া ওঠাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দ্বীপের কালো কুচকুচে মাটি।

কী করবে এখন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

দ্বীপে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো ভীষণবাবে চমকে উঠল। বলল, মাথা খারাপ! বিষাক্ত গাছ না হয় নেই। কিন্তু ওখানকার ঐ কালচে মাটিও তো বিষাক্ত।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল, শাঙ্কো, খাঁড়ির তীরে দুটো বড় পাথর পোঁতা আছে দেখে এসেছ?

হ্যাঁ, নৌকোয় ওঠার জন্যে। শাঙ্কো বলল।

যদি আমার অনুমান সত্যি হয় তাহলে ঐ দ্বীপেও এরকম পাথরে ধাপ আছে। যদি পাথরের ধাপ থাকে তাহলে রাজা মিলিন্দার গুপ্ত ধনভাণ্ডার পোঁতা আছে ওখানেই। যে বা যারা ওখানে গুপ্তধন রেখে এসেছে, সে বা তারা ঐ ধাপের ওপর দিয়েই হেঁটে গিয়েছিল। বিষাক্ত মাটি স্পর্শও করেনি।

শাঙ্কো কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, আবার সাবাস, ফ্রান্সিস। কিন্তু তোমার অনুমান সত্যি হবে যদি—

ওকে থামিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল, হ্যাঁ, যদি ওখানে পাথরের ধাপ

পাওয়া যায়। সেটাই দেখতে যেতে হবে।

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। নৌকো চালাল অভিশপ্ত দ্বীপের দিকে।

আস্তে আস্তে নৌকো তীরের একেবারে কাছে আসতে দেখা গেল সত্যিই কালো মাটির ওপরে পর পর কয়েকটা পাথরের ধাপ গাঁথা, যেমন আছে খাঁড়ির তীরের ভূমিতেও।

দুপুরের চড়া রোদ পড়েছে দ্বীপে। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাঁড় রেখে দিল। তীরের পাথরে পা রেখে সাবধানে নামল। কিছু আগে আগুন জ্বলেছিল। কাজেই পাথরটা বেশ গরম। তারপর শরীরের ভারসাম্য রেখে পরের পাথরে পা রাখল। মাটিতে পা রাখার উপায় নেই। পাথরে পা না পড়ে তাও হিসেবে রাখতে হচ্ছে। গুনে গুনে আটটা পাথরের ধাপ পার হতেই উজ্জ্বল রোদে দেখল একটা হাতলওয়ালা কালো কাঠের বাক্স একটা বড় পাথরের ওপর রাখা। ফ্রান্সিস শরীরের ভারসাম্য রেখে আস্তে আস্তে বাক্সটার হাতল ধরল। খুব সাবধানে বাক্সটা তুলে নিল। ওটা বেশ ভারী। ও বাক্স খোলার ঝুঁকি নিল না। আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। একটা ভারী জিনিস নিয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখতে হচ্ছে। কাজেই খুব সাবধানে পাথরে পা রেখে রেখে নৌকোর কাছে ফিরে এল। বাক্সের ভারে শরীরের ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বাক্সটা এগিয়ে ধরে বলল, শাঙ্কো, এটা নৌকোয় রাখো। দুজনেই ধরো।

লার্দো হতবাক—এই সাংঘাতিক দ্বীপে বাক্স রেখে গেছে কে? সে কি মানুষ না দৈত্য?

দুজনে ধরাধরি করে বাক্সটা নিয়ে নৌকোয় রাখল। ফ্রান্সিস সাবধানে নৌকোয় উঠে এল। তারপর দাঁড় তুলে নিল। নৌকো চালাল তীরেরভূমির দিকে।

এই বাক্সেই কি আছে রাজা মিলিন্দার গুপ্তধন? শাঙ্কোর মনে তখনও সংশয়।

খুলে দেখো। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে বাইতে বলল।

শাঙ্কো বাক্সের গায়ে হাতড়ে তালার গর্তে হাত দিয়ে দেখল একটা ছোট্ট চাবি আটকানো। ও চাবিটা ডানদিকে মোচড় দিল। কট করে একটা শব্দ হল। ও হাতল ধরে টানল। বাক্সের ওপরের ডালা খুলে গেল। বাক্সভর্তি

সোনার অলঙ্কার, হীরে-মুক্তো, মণিমাণিক্য। উজ্জ্বল রোদে সব ঝকঝক করতে লাগল। লার্দো এসব দেখে চিৎকার করে উঠল, ওঁ-ওঁ-ওঁ। এরকম দৃশ্য ফ্রান্সিস, শাঙ্কো অতীতেও দেখেছে। তবু ... শাঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল, ও হো হো। তীরে গাছের তলায় বসে-থাকা হ্যারি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাহলে ফ্রান্সিস গুপ্তধন উদ্ধার করতে পেরেছে। হ্যারিও ধ্বনি তুলল, ও হো হো।

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। তারপর আস্তে আস্তে নৌকো তীরে ভেড়াল। শাঙ্কো বাক্সটা কাঁধে তুলে নিল। তিনজনে চলল নগরের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো বলল, আচ্ছা ফ্রান্সিস, এই গুপ্তধনের বাক্স তো কারো না কারো নজরে পড়তে পারত।

না, পারত না। প্রথম ঐ অভিশপ্ত দ্বীপের ধারেকাছে কেউ যেত না। তর্নার গাছের আড়ালে ছিল ঐ বাক্স।

রাজা মিলিন্দা কীভাবে ওখানে বাক্সটা রেখেছিলেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

রাজা মিলিন্দা একজন বা দুজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে সকলের অগোচরে ওখানে নৌকোয় করে বাক্স সহ পাঠিয়েছিলেন। রাজার নির্দেশ ছিল সাত আটটা পাথরের ধাপও নিয়ে যাবার। কয়েক দফায় ওরা নৌকোয় করে পাথরের ধাপগুলো নিয়ে গিয়েছিল। দ্বীপের মাটিতে সেগুলো গেঁথে ধাপের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বাক্স রেখেছিল। কিন্তু তর্নার গাছের ছোঁয়া ওরা এড়াতে পারেনি। ওখানেই বিষাক্ত মাটিতে মিশে গেছে ওদের দেহ।

তাহলে রাজা মিলিন্দা কি পরে গুপ্তধনের বাক্সটা আনবেন ভেবেছিলেন? শাঙ্কো বলল।

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাহলে জীবিত অবস্থায় কীভাবে আনতেন?

যে ভাবে আমি এনেছি, ফ্রান্সিস বলল, বিষাক্ত তর্নার গাছ পুড়িয়ে ফেলে। খাঁড়ির তীরে দুটো বড় পাথর দেখেই আমার কাছে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুটো পাথর ছিল ঠিক দ্বীপের পাথরের উল্টোদিকে। তাই দিক ঠিক রাখতে পেরেছিলাম।

রাজবাড়ির সামনে এসে পৌঁছল ওরা। ফ্রান্সিস লার্দোকে বলল, যাও, রাজার সঙ্গে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও। লার্দোর হতভম্ব ভাব

তখনও সবটা কাটেনি। ফ্রান্সিস বলল, বলবে যে গুপ্তধন উদ্ধার হয়েছে। উনি যেন সেটা বুঝে নেন।

লার্দো চলে গেল। একটু পরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রাজসভায় চলো। ওখানেই রাজা আসবেন।

ফ্রান্সিসরা রাজসভায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে রাজা জোস্তাক এসে সিংহাসনে বসল। শাঙ্কো কাঁধ থেকে বাক্স নামিয়ে রাজার পায়ের কাছে রাখল। তারপর হাতল টেনে ওপরের ডালা খুলল। অত স্বর্ণলঙ্কার হীরে, মণি, মুক্তো দেখে রাজা জোস্তাকের মুখে আর কথা নেই। কিছু পরে অভিভূতের মতো বলল, কী করে উদ্ধার করলে? ফ্রান্সিস সংক্ষেপে সব বলল। তারাপর রাজাকে অনুরোধ করল, এবার আপনার শর্ত রাখুন। ঐ বদ্ধ ঘর থেকে আমাদের মুক্তি দিন। আমরা জাহাজে ফিরে যাব।

বেশ। কিন্তু এত দামি অলঙ্কার, মণি, মুক্তো, তোমরা কিন্তু কিছু দাবি করবে না। রাজা বলল।

আমরা একটা রুপোর টাকাও নেব না। আপনার প্রহরীদের হুকুম দিন। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই সেনাপতি এসে হাজির হল। লার্দো শুধু সেনাপতিকেই খবরটা দেয়নি, রাাস্তায় যাকে দেখেছে তাকেই এই গুপ্তধন উদ্ধারের কথা বলেছে। দলে দলে লোক ছুটে আসতে শুরু করল রাজবাড়ির দিকে। রাজা সেনাপতিকে হুকুম দিল ওদের ছেড়ে দিতে। সেনাপতি বলল, চলো তোমরা।

অস্ত্রঘরের সামনে এল সবাই। সেনাপতি প্রহরীদের বলল, এদের ছেড়ে দাও। রাজার হুকুম। প্রহরী দরজা খুলে দিল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলে উঠল, বাইরে বেরিয়ে এসো। ফ্রান্সিস গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। এবার জাহাজে চলো। সব ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল, ও হো হো। তারা বাইরে বেরিয়ে এল।

শাঙ্কো বলল, বেলা অনেক হয়েছে। এখানে খেয়ে গেলে হত না?

না, ফ্রান্সিস বলল, এই অন্ধকূপে আর এক মূহূর্তও থাকব না। আমাদের জাহাজেই রান্না সেরে খাব। এখন চলো। মারিয়া হাসতে হাসতে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। সবাই দল বেঁধে চলল জাহাজঘাটের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, ফ্রান্সিস, খাবার জল আর খাদ্য নিতে হবে যে।

সে সব কাল সকালে শাঙ্কোরা এসে নিয়ে যাবে। গত কয়েক রাত ঘুমোতেই পারিনি। আজ রাতে মড়ার মতো ঘুমোব। ফ্রান্সিস বলল।

শুধু তোমার নয়, আমাদেরও এক হাল। হ্যারি বলল।

রাজা ম্যাগনামের পাণ্ডুলিপি
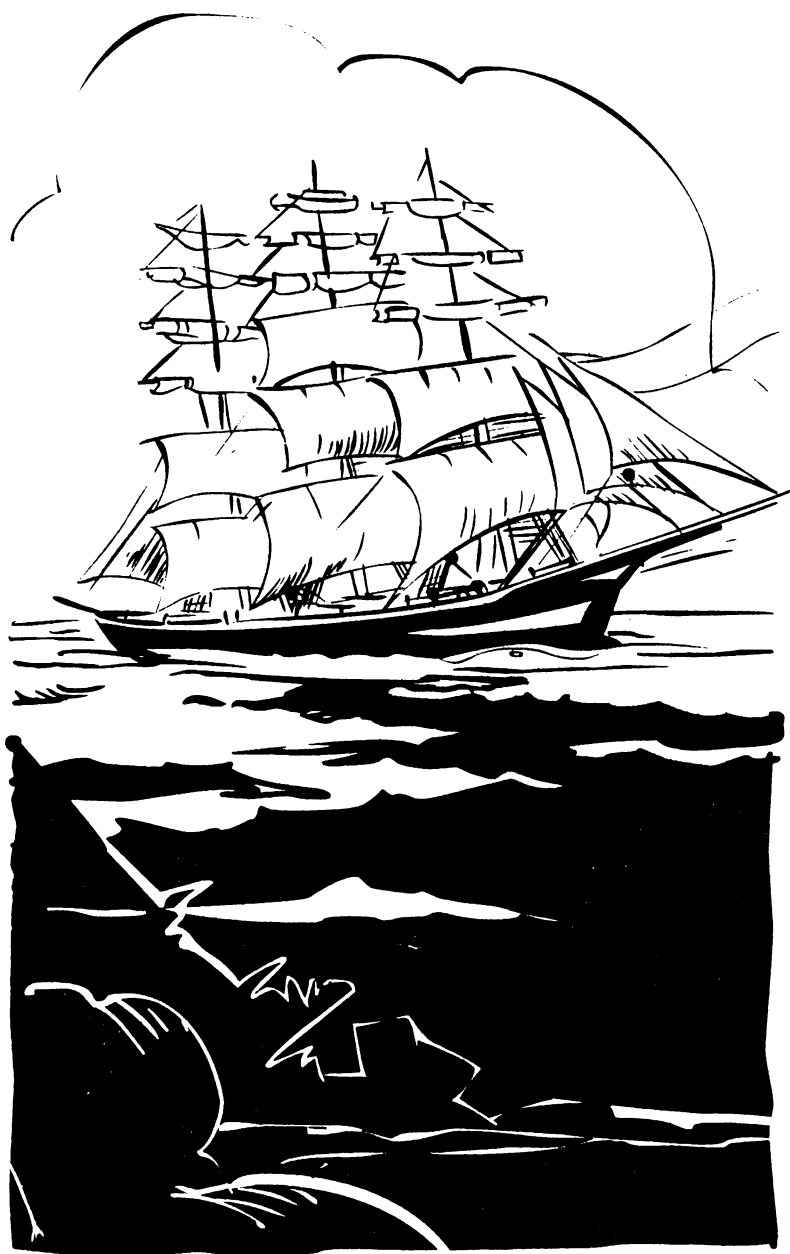
কতদিন হয়ে গেল ফ্রান্সিস মারিয়া আর ভাইকিং বন্ধুরা দেশছাড়া। কত দ্বীপ, দেশ ঘোরা হল। কত মানুষ, কত বিচিত্র তাদের ভাষা, জীবনযাত্রা। কতবার বন্দী হল ওরা। কখনও লড়াই করে, কখনও বুদ্ধি খাটিয়ে পালাতে হল। মৃত্যু হল কয়েকজন বন্ধুর। বিস্কো তো আর ফিরেই এল না। ওদের মাঝে মাঝেই মন খারাপ হয়। দেশের কথা মনে পড়ে। বিশেস করে সিনেত্রা যখন দেশের গান গায়। কত বীর ওরা। কত শক্ত মন ওদের। তবু সেই সব গান শুনে ওদের অনেকের চোখেই জল আসে। ফ্রান্সিসেরও মন খারাপ হয়। প্রয়াত মার কথা মনে পড়ে। বাবার কথা, দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে। সবচেয়ে ব্যাকুল হয় মারিয়ার মন। তখন ও একেবারে গুম হয়ে থাকে। ফ্রান্সিস বোঝে সেটা। বেশ কষ্ট করে মারিয়ার মনকে শান্ত করে।

সেদিন ফ্রান্সিসদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এসেছে। তখন পশ্চিম দিকের আকাশ অস্তগামী সূর্যের শেষ গাঢ় কমলা রঙে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। বরাবরের মতো মারিয়া সূর্যাস্ত দেখছে—জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কী এক গভীর দুঃখে মারিয়ার মন ভরে উঠল। চোখে উপচে এল জল। লম্বা হাতা জামায় চোখ মুঝতে গিয়ে দেখল হাতার কাপড়টা ছেঁড়া। সেলাই করা হয়নি। এবার ভালো করে নিজের ময়লা পোশাকটার দিকে তাকাল। এ কী শ্রী হয়েছে ওর! কোথায় সেই রাজবাড়ির আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সুবেশা নরনারীর মাঝে সম্রাজ্ঞীর মতো সে ঘুরবে ফিরবে তা নয় ভিখারিনির বেশে জাহাজে চড়ে অকূল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে! মারিয়া রেলিঙে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ঠিক তখনই হ্যারি যাচ্ছিল জাহাজচালক ফ্লেজারের সঙ্গে কথা বলতে। মারিয়াকে কাঁদতে দেখে ও তাড়াতাড়ি ওর কাছে এল। বলে উঠল, রাজকুমারী, কী হয়েছে? আপনার শরীর ভালো তো?

মারিয়া মাথা নাড়তে নাড়তে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

ডেকের একপাশে শাঙ্কোরা কয়েকজন বসেছিল। মারিয়াকে কাঁদতে দেখে ছুটে এল। হ্যারি বুঝল এক্ষুনি ফ্রান্সিসকে নিয়ে আসতে হবে। নইলে

রাজকুমারীকে কেউ শান্ত করতে পারবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফ্রান্সিসকে নিয়ে এল। মারিয়া তখনও কেঁদে চলেছে। ফ্রান্সিস এসে মারিয়ার মাথায় হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল, মারিয়া শান্ত হও। তুমি অস্থির হয়ে পড়লে আমরাই বা স্থির থাকব কী করে? বলো, কী হয়েছে? কেন মন খারাপ করছ?

মারিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, দেশের কথা মনে পড়ছে, বাবা-মাকে ভীষণ দেখতে.. মারিয়া কথাটা শেষ না করে আবার কাঁদতে শুরু করল।

ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরা মারিয়ার দুঃখ দেখে দেশ বিচলিত হল। প্রায় সবাই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। রাজকুমারী হলেও মারিয়ার ব্যবহারে, আচার-আচরণে এতটুকু আভিজাত্যের গর্ব কেউ কোনোদিন দেখেনি। আপন বোনের মতো ওরা সবাই মারিয়াকে ভালোবাসে। ওদের অসুখ-বিসুখে মারিয়া কখনও কখনও রাত জেগেও সেবা শুশ্রূষা করেছে। বৈদ্য ভেন বলে, আমার ওষুধে কাজ হয় অর্ধেক। বাকিটা রাজকুমারীর সেবা-শুশ্রূষা।

এবার ফ্রান্সিস বন্ধুদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ডাকল, হ্যারি!

বলো? হ্যারি এগিয়ে এল।

আমরা দেশে ফিরব।

হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল, ফ্রান্সিস তোমার কথাই তো আমাদের কাছে শেষ কথা। তাহলে ফ্লেজারকে ডাকি?

ডাকো।

হ্যারি জাহাজচালক ফ্লেজারের কাছে চলে গেল।

ফ্রান্সিসের কথায় গভীর নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছিল জাহাজে। শুধু কানে আসছিল সমুদ্রের দুরন্ত হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ আচমকা শাঙ্কো ধ্বনি তুলল— ও হো হো। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত ধ্বনি উঠল। হো হো হো। দেশে ফেরার আনন্দে ওরা তখন মাতোরায়া। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল, আমার ওপরে নিশ্চয়ই তোমার রাগ হয়েছে।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, না। আমিই সবসময়ই চাই, তুমি সুখী হও। আনন্দে থাক। তখনই হ্যারি ফ্লেজারকে নিয়ে এল।

ফ্লেজার, ফ্রান্সিস বলল, মোটামুটি উত্তর দিকটা ঠিক রেখে জাহাজ চালাও। এবার দেশে ফিরব আমরা।

ঠিক আছে। ধ্রুব নক্ষত্রই আমার ভরসা। মনে হয় দিকভুল হবে না। তবে কতদিনে য়ুরোপে পৌঁছব জানি না।

ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, যাও বিশ্রাম করো গে।

মারিয়া আর কোনো কথা বলল না। চলে গেল ওর কেবিনের দিকে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে পূর্ণ গতিতে। দিন যায়। রাত যায়। রাতে বন্ধুরা জাহাজের ডেকে নাচগানের আসর বসায়। সিনাত্রা গান গায়। বন্ধুরা ছোট ছোট দল বেঁধে নাচে। সিনাত্রা কখনও গায় ওদের দেশের বিয়ের গান, কখনও মেষপালকদের গান, কখনও বা রাজসভার গান।

নাচ গানের আসরে ফ্রান্সিস মারিয়াও যোগ দেয়।

দু'দুবার ঝড়-বৃষ্টির পাল্লায় পড়তে হল। সেই আকাশ অন্ধকার করে মেঘজমা, বিদ্যুতের ঝলকানি যেন ফালা ফালা করে দিচ্ছে আকাশ। সেই সঙ্গে বজ্রনির্ঘোষ আর মুষলধারায় বৃষ্টি। পালের কাঠামোর দড়িদড়া ধরে ভাইকিংদের লড়াই চলে ঝড়ের বিরুদ্ধে।

জাহাজ চলার পথে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় বন্দর পেল ওরা। কিন্তু জাহাজ ভেড়ানো হল না। শুধু পাল দড়ি মেরামতের জন্যে একটা বন্দরে থামতে হয়েছিল। অন্য একটা বড় বন্দরে খাবার আর জলসংগ্রহের জন্যে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছিল। নজরদার পেড্রোর কাজও হালকা হয়ে গেছে। শুধু রাত পর্যন্ত মাস্তুলের ওপরে উঠে নজরদারি করে সে।

সেদিন সকালে ফ্রান্সিস-মারিয়া সবে সকালের খাওয়া শেষ করেছে, হ্যারি ছুটে এল। বলল, ফ্রান্সিস, একটা জাহাজ আসছে দেখলাম। মাস্তুলের মথায় স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার পতাকা উড়ছে। মনে হচ্ছে আমরা দেশের কাছে চলে এসেছি।

তাহলে তো ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, ফ্রান্সিস উঠে দঁড়াল। মারিয়া উঠল। তিনজনে ডেকে উঠে এল। উজ্জ্বল রোদে আকাশ ঝলমল করছে দেখা গেল। জাহাজটা অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। ফ্রান্সিস পতাকাটা দেখল। হ্যারিকে বলল, যাও। ফ্লেজারকে বলো ঐ জাহাজটার কাছে যেতে। হ্যারি চলে গেল। শাঙ্কোরা কয়েকজন এগিয়ে এল। ওদের জাহাজটা আস্তে আস্তে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার জাহাজের গায়ের কাছে এল। ঐ জাহাজের লোকেরাও ততক্ষণে ওদের জাহাজের রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিসদের দেখছে।

কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

ওদের জাহাজে যাব।

একাই যাবে? দূর থেকে কথা বলা যাবে না?

না

ফ্রান্সিসদের জাহাজ আস্তে আস্তে ঐ জাহাজের গায়ে এসে লাগল। জোর ঝাঁকুনি খেল ফ্রান্সিসদের জাহাজটা। ঝাঁকুনি সামলে ফ্রান্সিস লাফিয়ে ঐ জাহাজের ডেকে উঠে এল।

জাহাজে উঠে বুঝল যাত্রী জাহাজ নয়। জাহাজের লোকেদের পরনে যোদ্ধার পোশাক। ফ্রান্সিস বুঝল, ওরা কোথাও যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। যোদ্ধাদের কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। ভাইকিংদের দেশীয় ভাষায় জিগ্যেস করল, তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে ভাইকিং।

হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং। তোমাদের দলপতির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

দুজন গিয়ে দলপতিকে ডেকে আনল। দলপতির পরনে বেশ দামি পোশাক। কোমরে তরোয়াল ঝুলছে। ফ্রান্সিসদের সেলাই করা ময়লা পোশাক দেখে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে দলপতি বলল, শুনলাম তোমরা আমাদের দেশের মানুষ।

হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং।

কিন্তু আসছ কোত্থেকে? চেহারা পোশাকে তো দেখছি একেবারে ভিখিরি।

মন্তব্য শুনে ফ্রান্সিস মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও নিজেকে সংযত করল। ও তখন জনতে ব্যস্ত কোথায় ওরা এসেছে। তাই বলল, আমরা অনেকদিন আগে দেশ থেকে বেরিয়েছি। অতলান্তিক সাগরে, ভূমধ্য মহাসাগরে ভেসে বেড়িয়ে অনেক দ্বীপ দেশ ঘুরে দেখেছি।

এমনি এমনি এত দেশ ভ্রমণ করেছ?

কতকটা তাই। তবে কিছু গুপ্ত ধনভাণ্ডারও বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি।

তাহলে তোমাদের এই দুর্দশা কেন? দলপতি হেসে বলল।

ওসব কথা থাক। আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

ব্রিটেনে। রৌয়েন বন্দর থেকে ফিরছি।

ব্রিটেনে কেন গিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

ব্যবসা করতে। সীলমাছের চর্বি, পশুর লোমের পোশাক—এসব।

ফ্রান্সিস একটু চমকাল। দলপতি মিথ্যে কথা বলছে। এবারও ভালো করে দলপতির মুখের দিকে তাকাল। ধূর্ত দৃষ্টি। কিন্তু মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই মিথ্যে কথা বলছে। দলপতির দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেই ব্যবসায়ীদের মতো নিরীহ চেহারার মানুষ নয় ওরা।

দেশের কোন বন্দরে যাবেন?

দোরস্তাদ। ওখানে কিছুদিন থেকে—কিন্তু এত কথা জিগ্যেস করছ কেন?

অনেকদিন পরে দেশের মানুষদের দেখছি, কথা বলছি—দেশের বন্দরের নাম শুনছি, কত কাছে চলে্ এসেছি— ভালো লাগছে বন্ধুর মতো কথা বলতে। চলুন না একসঙ্গে ফিরি।

ঠিক আছে। চলো। কিন্তু তার আগে জানতে হয় তুমিই কি দলপতি?

হ্যাঁ।

নামটা?

ফ্রান্সিস।

অ্যাঁ। দলপতি বেশ চমকে উঠল। বলল, মানে—আপনিই কি সেই ফ্রান্সিস যে সোনার ঘণ্টা, হাঁসের ডিমের মতো মুক্তো—

হ্যাঁ, আমিই সেই ফ্রান্সিস। সঙ্গে আমার বীর বন্ধুরা।

ও। তা—এ তো আনন্দের কথা। চলুন। একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

চলুন। ফ্রান্সিস রেলিং ধরে লাফিয়ে নিজেদের জাহাজে চলে এল। হ্যারিরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওদের সব কথা বলল। সবাই চলে গেল। হ্যারি আর মারিয়ার সঙ্গে ফিরে আসতে আসতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল, হ্যারি!

হ্যারি ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস একইভাবে বলল, ওদের দলপতি বলল বটে ওরা ব্যবসায়ী কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ওরা ব্রিটেনে এমন কিছু করতে গিয়েছিল যা করতে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন। নিছক ব্যবসার ব্যাপার নয়। স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওরা কিছু গোপন করছে। ওদের কাউকে জিগ্যেস করে দলপতির নামটা জেনো তো। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। জানি তো আমাদের দেশের কিছু বিপথগামী মানুষের দল আছে। জাহাজে চড়ে এদিকে ব্রিটেন ওদিকে স্থলপথে রাশিয়া পর্যন্ত গিয়ে ব্যবসার নামে দস্যুতা করে। ধনসম্পদ লুঠ করে আনে। বিক্রির জন্য ধনী ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে তাদের। এরা তেমনি একদল বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ফ্রান্সি আর কিছু বলল না। কিন্তু স্থির করল ওদের জাহাজটা ভালো করে দেখবে।

হ্যারি চলে গেল। ঘরে ঢুকে মারিয়া বলল, হ্যারিকে চুপিচুপি কী বলছিলে?

তোমাকে পরে বলব। এখনও বলার মতো কিছু ঘটেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যারি এল। বলল, ওদের দলপতির নাম হ্যারল্ড।

হুঁ। হ্যারল্ডের জাহাজটা যেভাবে হোক ভালো করে দেখতে হবে। হ্যারল্ড অনেক কিছু গোপন করছে।

কিন্তু বেশ ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে না? যদি সত্যি ওরা দস্যু হয়? হ্যারি আশঙ্কা প্রকাশ করল।

সবদিক ভেবেই কাজে নামব। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল।

পরের দিন সন্ধেবেলা ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। শাঙ্কো মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে বসেছিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কাছে এল। আস্তে আস্তে বলল, শাঙ্কো, একটা জরুরি কাজ আছে। শোনো। শাঙ্কো উঠে এল। ফ্রান্সিস বলল, ঐ জাহাজের দলপতির নাম হ্যারল্ড। আজ গভীর রাতে ঐ জাহাজে যাবে। লুকিয়ে জাহাজটা ঘুরে ভালোভাবে সবকিছু দেখবে। ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

তরোয়াল নিয়ে যাব?

না। পরে দরকার পড়লে লড়াই করা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

তুমি গেলে ভালো হত না?

না। যদি ধরা পড়ে যাও তাহলে বলতে পারবে, আমাদের জাহাজে শুয়ে বড্ড অসুবিধে হচ্ছে তাই দেখতে এসেছিলাম আমাদের কয়েকজন এখানে এসে রাতটা থাকতে পারব কিনা। তোমাদের দলপতি হিসাবে আমার এই অনুরোধ করাটা ওরা সন্দেহের চোখে দেখতে পারে। তুমি বললে ওদের কোনো সন্দেহ হবে না।

রাত হল। শাঙ্কো ডেকে এসে হালের কাছে শুয়ে পড়ল। দু'চারজন বন্ধু ওকে ওদের কাছে এসে শুতে বলল। শাঙ্কো গেল না।

আকাশে আধভাঙা চাঁদ অনেকটা উজ্জ্বল। জোর হাওয়া বইছে। রাত বাড়তে লাগল। চাঁদের আলোয় হ্যারল্ডের জাহাজের দিকে ও তাকিয়ে রইল। দেখল, মাস্তুলের ওপর কোনো নজরদার নেই। উঠে বসল। রেলিঙের ধারেও কেউ নেই। ওরা শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। ঘুমুচ্ছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে গড়িয়ে হালের কাছে এল। উঠে দাঁড়াল। হালের দড়িদড়া ধরে আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল। যেটুকু আওয়াজ হল বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দে ঢাকা পড়ে গেল। ও ডুব সাঁতার দিয়ে হ্যারল্ডের জাহাজের কাছে গিয়ে ভেসে উঠল। হাঁ করে শ্বাস নিল। তারপর হ্যারল্ডের জাহাজের হালের কাছে গেল। দড়িদড়া ধরে নিঃশব্দে জাহাজের ডেকে উঠে এল। দেখল কেউ পাহারা দিচ্ছে না। ডেকের এখানে-ওখানে দু'তিনজন ঘুমুচ্ছে। শাঙ্কো চারদিকে তাকাল। মাস্তুল-পাল-দড়িদড়া। নজরে পড়ার মতো কিছু নেই। আর পাঁচটা জাহাজে যেমন থাকে। ও নিঃশব্দে সিঁড়িঘরের কাছে এল। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে নীচে

নামল। এখানে-ওখানে বাতি ঝুলছে। দু'পাশের ছোট ছোট কেবিন পার হল। সামনেই একটা ঘর। বেশ বড়। অল্প আলোয় দেখল। সেই ঘরের দরজা লোহার গরাদের। ভিতরে কোনো আলো নেই। গরাদের গায়ে একটা বড় তালা ঝুলছে। শাঙ্কো হামাগুড়ি দিয়ে তালাটার কাছে গেল। উঁকি দিয়ে দেখল, অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় ব্যবসার মালপত্র রাখা হয়। তখনই হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলার মৃদু শব্দ শুনল। শাঙ্কো চমকে উঠল। তাহলে ভেতরে মানুষ আছে। স্পষ্ট শুনল কেউ যেন পাশ ফিরল। ও আবার তাকাল। খুব অস্পষ্ট দেখল শুয়ে থাকা মানুষ। ক'জন বুঝল না। কোনায় একটা লম্বাটে সিন্দুকের আভাস। শাঙ্কো বুঝল এটা কয়েদঘর। ও দ্রুত পিছিয়ে এল। তারপর পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছে চলে এল। আস্তে আস্তে সিঁড়ির মাথায় আসতে ও ডেকে শুয়ে থাকা একজনের বিরক্তি ভরা কথা শুনল, অ্যাই, চাদরটা নিয়েছিস কেন?

বেশ করেছি। অন্যজনের ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর। শাঙ্কো মাথা তুলতে গিয়েই নামিয়ে ফেলল। তবু যে লোকটা ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল সে ওর মাথাটা দেখে ফেলেছে। সতর্ক কণ্ঠে বেশ জোর গলায় বলে উঠল—কে রে ওখানে? অ্যাই—?

শাঙ্কো বুঝল ধরা পড়ে গেছে। ও আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। ডেকে উঠেই দ্রুত ছুটে গিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা দু'একজন কিছু বুঝে ওঠার আগে ঘটে গেল ঘটনাটা। ওরা অবাক। শাঙ্কো ডুব সাঁতার দিয়ে ওদের জাহাজের কাছে এসে আস্তে মাথা তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে দু'হাতে জল ঠেলে হালের কাছে চলে এল। হাল ধরে চুপ করে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওরা ততক্ষণে ডেকে ছুটোছুটি করে চারদিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু শাঙ্কোকে দেখতে পেল না। শাঙ্কোর মাথা তখন হালের আড়ালে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা হতাশ হয়ে ডেকে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একজন ছুটে গেল হ্যারল্ডের কাছে, খবরটা দলপতিকে জানাতে। দলপতি কিছু পরে ডেকে উঠে এল। চারদিকে সমুদ্রের জল দেখল। সব শুনল। তারপর ফিরে গেল। শাঙ্কো অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিক আকাশে চাঁদ ম্লান হয়ে আসছে। পুব আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। শাঙ্কো আর অপেক্ষা করল না। ডেকে উঠে এসে ভেজা পোশাকেই শুয়ে পড়ল। আর ওদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

সকাল হল। ডেক থেকে শাঙ্কো নেমে এল নিজেদের কেবিনে। বন্ধুরা ওর ভেজা পোশাক দেখে বলল, কী রে—জলে নেমেছিলি কেন?

গরম লাগছিল। স্নান করলাম। শাঙ্কো ভেজা পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বলল।

সকালের খাবার খেয়ে শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস ওর জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তখনই হ্যারিও এল। হ্যারি এ সময় প্রায় নিয়মিত ফ্রান্সিসের কাছে আসে কথা বলতে। জাহাজের কাজকর্ম ঠিক চলছে কিনা, কারও অসুখ-বিসুখ হল কিনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা—এসব নিয়ে কথা হয় দুজনের।

শাঙ্কো কী দেখলে বলো, ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব বলে গেল। দুই বন্ধু শুনল সব।

যাক নির্বিঘ্নে পালাতে পেরেছ। এখন কথা হল, কেন কয়েদঘর আছে ঐ জাহাজে। কেন কিছু মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে? হ্যারি, কী বলো?

এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেল যে হ্যারল্ডরা ব্যবসায়ী নয়। তবে এও হতে পারে শৃঙ্খলা ভাঙায় বা দলবিরোধী কিছু করেছিল বলে ওদের বন্দী করে রাখা হয়েছে।

উহুঁ। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। হ্যারি, ব্যাপারটা অত সহজ সরল নয়। ভুলে যেও না ইংল্যান্ডে গিয়ে আমাদের দেশের কিছু দুরাচারী মানুষ লুঠপাট করে ধনসম্পদ নিয়ে এসেছে। আমরা দুর্নামের ভাগী হয়েছি। কাজেই খুব পরিষ্কার—হ্যারল্ডরা ডাকাতের দল। যারা এসবের বিরোধিতা করেছে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। এবার শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, সিন্দুকের মতো কিছু দেখেছ বলছিলে।

হ্যাঁ। অন্ধকারে তো স্পষ্ট দেখতে পাইনি, খুব আবছা দেখেছি।

লুঠের ধনসম্পদ ওটাতেই রাখা আছে, হ্যারি বলল।

হুঁ। এখন আমরা কী করব? ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল।

চুপ করে থাকব। দোরস্তাদ বন্দরে নেমে ওদের রাজার সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দেব, হ্যারি বলল।

অত সহজে হবে না। ডাকাত লুঠেরার দল। বিপদ আঁচ করতে পারলে আমাদের মেরে ফেলতেও এদের হাত কাঁপবে না। এবার আমাদের সাবধান হবার সময় এসেছে।

উহুঁ, বেশি সাবধান হতে গেলে তামাদের আচার-আচরণে, কথাবার্তায় অস্বাভাবিকতা এসে যাবে। জানলাম শুধু আমরা চারজন। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ঘটনাক্রমে তুমিও সব জানলে। সাবধান, এইসব নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবে না।

হ্যারিরা চলে গেল।

দিন দুয়েক পরের কথা। সকালের দিকে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, হ্যারল্ড তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে বিশেষ দরকার।

দুজনে ডেকে উঠে এল। দেখা গেল হ্যারল্ডের জাহাজটা ঘুরিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে লাগানো হয়েছে। ঐ জাহাজের রেলিং ধরে হ্যারল্ড দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস, হ্যারি এগিয়ে গিয়ে হ্যারল্ডের মুখোমুখি দাঁড়াল। হ্যারল্ড বলল, খুব সমস্যায় পড়েছি। আপনাদের জাহাজে কোনো বৈদ্য আছে?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

আমাদের একজন সঙ্গী বৃদ্ধ। খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যদি আপনাদের বৈদ্য তাকে দেখে ওষুধ-টষুধের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে খুবই উপকার হয়। হ্যারল্ড বলল।

মুশকিল হয়েছে আমাদের বৈদ্য ভেনও প্রৌঢ়। রোগী দেখতে হবে, ওষুধ দিতে হবে, ওষুধে কাজ হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ভেন তো বারবার আপনাদের জাহাজে যাওয়া-আসা করতে পারবে না। তাও এই মাঝ সমুদ্রে। তার চেয়ে ভালো হয় আপনার রোগী আমাদের জাহাজে এসে থাকুক। চিকিৎসা সেবা-শুশ্রূষার কোনো গাফিলতি হবে না, কথা দিচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারল্ড কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, হুঁ। এছাড়া তো উপায় দেখছি না। তবে একটা কথা বলছি, বৃদ্ধটি মানে ক্রেভান বেশ ছিটগ্রস্ত। প্রায় পাগলই। আজেবাজে বকে। ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না। যত আজগুবি কথাবার্তা।

বেশ, ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে ক্রেভানকে পৌঁছে দিচ্ছি আপনাদের জাহাজে।

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো, সিনাত্রা আর দু'একজন বন্ধুকে ডাকল। হ্যারল্ডের জাহাজের কয়েকজন বৃদ্ধ ক্রেভানকে কাঁধে করে রেলিঙের ধারে নিয়ে এল। শাঙ্কোরা এগিয়ে গেল। ওরা ক্রেভানকে শোয়া অবস্থাতেই আস্তে

আস্তে এগিয়ে দিল শাঙ্কোদের দিকে। শাঙ্কোরা ক্রেভানকে ধরে ধরে নিয়ে এল।

শাঙ্কো, ক্রেভানকে আমার কেবিনে নিয়ে যাও আর ভেনকে আসতে বলো। শাঙ্কোদের কাঁধে ক্রেভান দু'চোখ বুজে শুয়ে আছে। রোগজীর্ণ চোখমুখ। সারা মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ। মাথার ঝাঁকড়া চুলও সাদা ধবধবে। শাঙ্কোরা ক্রেভানকে নিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে নিজের কেবিনে এল। ক্রেভানকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সিস ক্রেভানের কাছে এল। দু'চোখ বোজা। শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, ক্রেভান। ক্রেভান চুপ। ফ্রান্সিস আবার ডাকল, ক্রেভান, শুনছেন? ক্রেভান এবার আস্তে আস্তে চোখ খুলল।

কী কষ্ট আপনার?

ব—ড়—দু—র্ব—ল। ক্রেভান মৃদুস্বরে টেনে টেনে বলল।

আমাদের বৈদ্য ভেন ওষুধ দেবে। ও খুব ভালো বৈদ্য। ওষুধ খাবেন। মারিয়া আপনার সেবা-শুশ্রূষর করবে। কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবেন।

তখনই ভেন ওর ওষুধের বোয়াম নিয়ে এল। ক্রেভানের পাশে বসল। চোখের নীচে টেনে, কপালে গলায় হাত দিয়ে যেমন করে রোগী পরীক্ষা করে তেমনি করে পরীক্ষা করল। ভেন জিগ্যেস করল, দেখছি জ্বর আছে। ক'দিন জ্বর হয়েছে আপনার?

জানি না, তবে সা—ত—আ—ট—দিন—বেশিও—

হুঁ। আর কী কষ্ট?

মাথা—য়—অ—স—হ্য—ব্য—আথা। বলতে বলতে ক্রেভানের শরীর খুব জোরে কেঁপে উঠল। বু—কেও ক—কষ্ট। ক্রেভান খুব আস্তে আস্তে বলল।

হুঁ। ভেন ওর ঝোলা থেকে বোয়ামগুলো বের করে পাথরের বাটিতে কীসের শেকড়ের টুকরো নিয়ে ঘষতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেনের ওষুধ তৈরি হয়ে গেল। ভেন এবার মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিই তো সেবা-শুশ্রূষা করবেন। ওষুধ-পথ্যি বুঝে নিন। ভেন মারিয়াকে সব বুঝিয়ে দিল।

কেমন দেখলে ভেন? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জানতে চাইল।

রোগীর শরীরের ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে। ভালো খাওয়া জোটেনি,

ঠাণ্ডা লেগে বুকে সাংঘাতিক কফ জমেছে। বলতে গেলে কোনো চিকিৎসাই হয়নি। সুস্থ হতে সময় লাগবে। ভেন বলল।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারল্ড ফ্রান্সিসের কেবিনে এল। বৈদ্য কেমন দেখল, ওষুধ দিয়েছে কিনা, কবে নাগাদ সুস্থ হবে এসব কথা জিগ্যেস করল। তারপর বলল, সেবা-শুশ্রূষার জন্যে লোক পাঠাব?

দরকার নেই। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল, উনিই সব করবেন।

এতক্ষণ হ্যারল্ড মারিয়াকে বারবার দেখছিল। কৌতূহল চেপে ছিল। এবার বলল, মানে—ইনি কে?

রাজকুমারী মারিয়া, হ্যারি বলল।

কিন্তু উনি রাজকুমারী হয়ে মানে—

ও প্রসঙ্গ থাক। ফ্রান্সিস বলে উঠল।

হ্যারল্ড ক্রেভানের দিকে তাকিয়ে বলল, বুড়ো, চুপ করে শুয়ে থাকবে। একেবারে আজেবাজে বকবে না। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, মাথায় ছিট আছে, পাগলের মতো বকে। ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না।

হ্যাঁ, আপনি বলেছেন আগে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারল্ড চলে গেল।

দু'দিন কাটল। এর মধ্যে হ্যারল্ড এসেছে। বারবার একই কথা বলে গেছে, পাগল, ক্ষ্যাপা।

ওষুধ, সেবা-শুশ্রূষায় ক্রেভান অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। এর মধ্যে ক্রেভান কখনও পথ্য খাবার সময়, কখনও ঘুমের ঘোরে নানা অসংলগ্ন কথা বলেছে—কত দেশ ঘুরলাম... বাড়িছাড়া দেশছাড়া... রাজা ম্যাগনাম... কী সংঘাতিক ঝড়... ডুবে গেল... সব ডুবে গেল।

ফ্রান্সিস ভেনকে এসব কথা বলেছে। তারপর জিগ্যেস করেছে, তোমার কি মনে হয় লোকটা পাগল?

ভেন মাথা নেড়ে বলেছে, জ্বরের ঘোরে অনেকে আবোল-তাবোল বকে। ঘুমের মধ্যে কথা বলাও অনেকের অভ্যেস। তবে রোগীর সঙ্গে আমার যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে তাতে বুঝেছি, কোনো কারণেই হোক ও খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না। তাই বলে ওকে পাগল বলা যায় না। মনে হয় ওর সঙ্গে নির্দয় আচরণ করা হয়েছে। ভেন ক্রেভানকে দেখে-টেখে কিছু জিগ্যেস-টিগ্যেস করে মারিয়াকে নির্দেশ দিয়ে চলে যাবার আগে বলল, রোগী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ভেন বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ ক্রেভান বলে উঠল, উঠে বসি।

ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে এল। বলল, না না, শুয়ে থাকুন।

ক্রেভান মৃদু হেসে বলল, বদ্ধ ঘরে মেঝেয় শুয়েই তো থাকতাম সবসময়। ইচ্ছে করে খেতাম না। মরতেই চেয়েছিলাম... কিন্তু... ক্রেভান থেমে গেল।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল, এ তো পাগলের কথা নয়। ও ক্রেভানকে ধরে আস্তে আস্তে বসাল। ক্রেভানের মুখের দিকে তাকাল। বৃদ্ধের চোখে-মুখে বেশ উজ্জ্বলতা। ক্রেভান অল্পক্ষণ বসে থেকে বলল, দাঁড়াব।

না-না, একদিনে এতটা পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

পারব। শুধু একটা শর্ত, হ্যারল্ডের হাতে আমাকে ছেড়ে দেবেন না। ক্রেভান কাতর দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল।

কেন বলুন তো?

সে অনেক কথা। অত কথা এক নাগাড়ে বলতে পারব না। আর একটু সুস্থ হলে—।

ফ্রান্সিস দ্রুত মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়াও ক্রেভানের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

শীগগির হ্যারিকে ডাকো। মারিয়া চমক ভেঙে দ্রুত উঠে গেল। একটু পরেই হ্যারি ছুটে এল।

ক্রেভান বলল, কথা দিন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না। আমি ফ্রান্সিস। সঙ্গে আমার বীর বন্ধুরা। কোনো অন্যায় অবিচার অত্যাচার আমরা সহ্য করি না।

ক্রেভান একটু থেমে থেমে বলতে শুরু করল—

তবে শুনুন। সংক্ষেপে বলি। চিরকাল বাউণ্ডুলে আমি। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করেছি এদেশ-ওদেশে—নরওয়ে থেকে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত। একটু থামল ক্রেভান। বলল, জল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাচের গ্লাসে জল নিয়ে এল। জল খেয়ে যেন একটু ধাতস্থ হল। তারপর ফের শুরু করল, নরওয়ের রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে একটা সূত্র পেয়েছিলাম। পুরোনোকালের এক ইতিহাসবিদের লেখা বই, কাগজের মতো পাতলা চামড়ায়। প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থা তার। বইতে ছিল অতীতের এক রাজা ম্যাগনামের কথা। সাতটা জাহাজে দুর্ধর্ষ সব সৈন্যদের নিয়ে সাধারণ পোশাক পরে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ওদের কাছে নিজের

পরিচয় দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী বলে। ক্রেভান থামল। একটু জিরিয়ে বলতে লাগল, তীরের কাছাকাছি বড় বড় মঠ-গির্জা লুঠ করেছিলেন। নরহত্যা থেকে শুরু করে সব রকম অত্যাচার করেছিলেন। যা হোক ফিরে এলেন জাহাজঘাটায়। নৌযুদ্ধে ইংল্যান্ডের লোকেরা অত্যন্ত দক্ষ। রাজা ম্যাগনামের একটা মাত্র জাহাজ ডুবে গেল না। সেই জাহাজেই প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে আসছে যে বন্দরে, হ্যারল্ডের জাহাজও যাবে সেই দোরস্তাদ বন্দরে, নোঙর করবে বলে—উঠল প্রচণ্ড ঝড়। জাহাজডুবি হয়ে রাজা ম্যাগনাম মারা গেলেন।

আর সেই ধনসম্পদ? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

সলিল সমাধি।

কোথায়?

উত্তরের খাঁড়িতে। কিন্তু সেই ইতিহাসবিদ সবশেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন—রাজা ম্যাগনাম মারা যাননি, যদিও সবাই জানত যে রাজা বেঁচে ফেরেননি।

সেই ইতিহাসবিদ জানলেন কী করে?

তিনি ফুটনোটে এই কথাগুলি খুব অস্পষ্ট অক্ষরে লিখেছিলেন, ঠিক এই কথা—'সেই খাঁড়ির ধারে, স্লাভিয়া গিয়েছিলাম, একপাটি জুতো পেয়েছিলাম, দামি, অভিজাত—।' ব্যস—পরের পাতা নেই। হয়তো কিছু লেখা ছিল। ক্রেভান থামল। একটু হাঁপাতে লাগল। দম নিয়ে বলল, একটু ধরো তো উঠে দাঁড়াব। পায়ের জোর দেখি, পালাতে হলে—। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এসে দু'দিক থেকে ক্রেভানকে ধরল। আস্তে আস্তে উঠিয়ে দাঁড় করাল। ক্রেভানের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। সে পা ফেলে দু'তিন পা হাঁটল। হেসে বলল, একটু জোর পাচ্ছি। তখনই দরজার বাইরে শাঙ্কোর গলা শোনা গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু ভালো আছেন।

হুঁ। তাহলে তো নিয়ে যেতে হয়। হ্যারল্ডের গলা। হ্যারল্ডের গলা শোনামাত্র আতঙ্কে ক্রেভানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ফ্রান্সিসদের হাত ছাড়িয়ে এক ছুটে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। দ্রুত হাতে কম্বলটা টেনে নিল। হ্যারল্ড ঢুকল।

এই যে বুড়ো, শুনলাম ভালো আছ। কাষ্ঠহাসি হেসে বলল হ্যারল্ড। ক্রেভান কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস তখন ভাবছে ক্রেভান এতটা

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর ব্যাপার আছে।

ফ্রান্সিস বলল, তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। আমাদের বৈদ্য বলছিল, 'দু'চার দিন না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না।

না-না। আর এখানে ফেলে রাখা যায় না।

ঠিক আছে। বৈদ্য ভেন কী বলে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

বসতে পারছে? দাঁড়াতে পারছে? হ্যারল্ড জানতে চাইল।

না, এসে অব্দি তো শুয়েই থাকেন। ফ্রান্সিস বলল।

ও। কাল সকালে খবর নিতে আসব। দেখি কেমন থাকে।

হঠাৎই ক্রেভান বলতে লাগল, কালো অন্ধকার আকাশ... পাথরের মতো জমাট মেঘ... বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে... ঝড় ধেয়ে এল... প্রচণ্ড ঝড়... হাল ভেঙে গেল।

ঐ শুনুন। একে পাগল ছাড়া কী বলবেন? যত আজগুবি প্রলাপ। বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। হ্যারল্ড হাত নেড়ে বলল।

বিকেল হল। ক্রেভানকে ওষুধ খাইয়ে মারিয়া সূর্য্যাস্ত দেখতে চলে গেল। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল, খুব সময়ে এসেছ। এবার চোখ বুজে থাকা ক্রেভানের মুখের ওপর ঝুঁকে ফ্রান্সিস ডাকল, ক্রেভান শুনছেন? ক্রেভান চোখ খুলে তাকাল।

আপনার যদি কষ্ট না হয় তাহলে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

বলো।

হ্যারল্ডের সঙ্গে আপনার কীভাবে পরিচয় হল? হ্যারল্ডকে আপনি এত ভয় পান কেন? মরে যেতে চান কেন?

ক্রেভান একটু চুপ করে থেকে বলল, সব বলছি সংক্ষেপে, তাই থেকে বুঝে নাও। তারপর বলতে লাগল, অনেক বছর এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে বয়েসের ভারে আর পারছিলাম না। জাহাজ থেকে নামলাম ঐ দোরস্তাদ বন্দরে। মনে পড়ে গেল সেই ইতিহাসবিদের বইয়ের কথা। লোভ হল, ধনসম্পত্তির তৃষ্ণা। দেখিই না রাজা ম্যাগনামের ডুবে-যাওয়া জাহাজের হদিস পাই কি না। স্লাভিয়া গেলাম। খোঁজ—খোঁজ। কয়েক বছর ধরে খুঁজছি। একটা কৃষকের বাড়িতে গেলাম, যত্ন করে রেখেছিল এক পাটি জুতো। দেখেই বুঝেছিলাম। সোনার কাজ ছিল, দামি পাথর-টাথর বসানো ছিল। রাজাদের জুতোই। বুঝলাম, রাজা ম্যাগনামের জাহাজ পাশের খাঁড়ি এই স্লাভিয়া পর্যন্ত এসেছিল। খাঁড়ি, খাঁড়ির

আশপাশ, দু'পাশের এলাকা চষে বেড়ালাম। কাটল বেশ কিছুদিন। মনে পড়ল, বইয়ের লেখা... ইংল্যান্ডের রউয়েন বন্দর থেকে লয়ের উপত্যকার মঠ-গির্জার ধন-সম্পদ... লুঠ... হত্যা। একটু থামল ক্রেভান।

আপনি লয়ের উপত্যকায় গিয়েছিলেন?

ঠিক ধরেছ। দোরস্তাদ বন্দরে হ্যারল্ডের দলের সঙ্গে পরিচয়। ব্যবসায়ী, কিন্তু—লয়ের উপত্যকায় পৌঁছে স্বমূর্তি। লুঠ, হত্যা। দস্যুর দল, পালাতে পারলাম না। হ্যারল্ডকে রাজা ম্যাগনামের জাহাজডুবি, খাঁড়িতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদের কথা সব বলেছিলাম। ওরা আমাকে বন্দী করল। কী অত্যাচার! মরতে চাইলাম, মরতে দিল না। ক্রেভান দম নেবার জন্যে থামল।

মনে হয় আরো কিছু লোক বন্দী।

হ্যাঁ, ক্রীতদাস ওরা। ধনী মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করবে। লুণ্ঠিত সম্পদ, বিক্রির দাম কত কত রি্কা, আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা—

এবার ফ্রান্সিস চমকে উঠল—ক্রীতদাস!

ফ্রান্সিস, হ্যারল্ড কী জঘন্য মানুষ! হ্যারি বলে উঠল।

ক্রেভান বলতে লাগল, স্লাভিয়ার সেই বাড়িতে বহু পুরোনো পাণ্ডুলিপি—রাজা ম্যাগনামের লেখা পেয়েছিলাম। হ্যারল্ডকে দেখিয়েছিলাম। সেটাই কাল হল। ছিনিয়ে নিল। অনেক কষ্টে পড়ে পড়ে মুখস্থ করল। কিন্তু অসম্পূর্ণ। হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে।

সেই পাণ্ডুলিপির সবটা মনে আছে আপনার? ফ্রান্সিস তখন উত্তেজিত। সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ।

বলুন।

প্রথমে লুঠপাটের কথা। সেসব থাক, দরকারি জায়গাটা বলছি। একটু থেমে বলতে লাগল, 'ইংল্যান্ডবাসীরা জাহাজ ডোবাল। একটা জাহাজেই ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসতে লাগলাম। লক্ষ্য দোরস্তাদ বন্দর। ব্যবসায়ীর পোশাক ছেড়ে লুকোনো রাজপরিচ্ছদ পরলাম। জাহাজ চলল তীরবেগে। দু'রাত জেগে আনন্দ হৈ-হল্লা নাচগান চলল। দোরস্তাদ বন্দরের কাছে এলাম।' আবার একটু থামল ক্রেভান। তারপর বলল, 'ঝড় শুরু হল। প্রচণ্ড ঝড়।' ফের বিরতি। তারপর বলল, এখান থেকে অক্ষর-গুলো আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করেছি, 'আমি লিখে চলেছি, কী দেখছি

লিখছি। বুঝলাম খাঁড়িতে ঢুকে পড়েছি। মুষলধারে বৃষ্টি। দু'পাশে টাল খেতে খেতে... আর লিখতে পারছি না, প্রচণ্ড ধাক্কা। কে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, সামনে, সাদাটে—' ক্রেভান বলল, এখানেই পাণ্ডুলিপির শেষ, তার পরই ছেঁড়া। জানি না আরও কিছু লেখা ছিল কিনা।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্রেভানের কথা শুনছিল। এবার বলল, বোঝা গেল রাজা ম্যাগনামের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। আপনার কি মনে হয় রাজা ম্যাগনামের ডুবে-যাওয়া জাহাজে ধনৈশ্বর্য ছিল?

অবশ্যই। শুধু খুঁজে উদ্ধার করা। ক্রেভান বলল।

আমাকে আরও কিছু জানতে হবে। তার জন্য স্লাভিয়ার গ্রামে যেতে হবে। তার আগে আপনাকে আর হ্যারল্ডের জাহাজে বন্দী ক্রীতদাসের মুক্ত করতে হবে।

ক্রেভান ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, হ্যারল্ড সাংঘাতিক লোক—নিষ্ঠুর, নৃশংস। তোমাদের হত্যা—

ফ্রান্সিস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, দেখা যাক।

হ্যারল্ড পরদিন সকালেই এসে হাজির। দেঁতো হাসি হেসে বলল, অ্যাই বুড়ো খুব আয়েস করেছিস, চল্ এবার।

ফ্রান্সিস দেখল হ্যারল্ড তিন-চারজন সঙ্গী নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে সোজা হ্যারল্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বলল, ক্রেভান যাবে না। হ্যারি চমকে উঠে চাপাস্বরে বলে উঠল, ফ্রান্সিস! হ্যারল্ড এরকম কথা বোধহয় আশা করেনি। চোখ কুঁচকে বলল, কেন বলুন তো? ক্রেভান আমাদের সঙ্গে ইংল্যান্ডে এসেছে, আমাদের সঙ্গেই ফিরবে।

ক্রেভান বলেছে, ও ইচ্ছে করে কম খেত। কারণ ও মরে যেতে চেয়েছিল।

বলেছিলাম না পাগল। আর কী বলেছে ও?

আপনারা ব্যবসায়ী সেজে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তারপর ওখানকার মঠ-গির্জার সঞ্চিত ধনৈশ্বর্য লুঠ করে এনেছেন। নরহত্যা, অত্যাচার—

বদ্ধ পাগল। বলেছিলাম না—। হ্যারল্ড চড়া গলায় বলে উঠল।

শুধু তাই নয়, আরবীয় ধনী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করবেন বলে ক্রীতদাসের মতো ইংরেজদের বন্দী করে এনেছেন।

পাগলের প্রলাপ। হ্যারল্ড হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, আপনি ভালো করে দেখুন আমরা সশস্ত্র।

আমি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস হাত বাড়াল, হ্যারি তরোয়ালটা দাও। দুজনের কথা চলতে চলতে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কেউ ভাবেনি এক ফ্রান্সিস ছাড়া।

ফ্রান্সিস, শান্ত হও, ভয়ার্ত গলায় মারিয়া বলে উঠল।

কাঁপা কাঁপা গলায় ক্রেভান বলল, ফ্রান্সিস, আমার জন্যে—

শুধু আপনার জন্যে নয়। সমস্ত ভাইকিং জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে আমাকে লড়তেই হবে। হ্যারি ততক্ষণে ফ্রান্সিসের বিছানার নীচ থেকে ফ্রান্সিসের তরোয়ালটা নিয়ে এসেছে। হ্যারল্ড কেমন নিরীহের মতো বলল, দেখুন, এইসব লড়াই, রক্তপাত, আমি পছন্দ করি না। তার চেয়ে আপনি আমার জাহাজে আসুন, সব নিজের চোখে দেখবেন। ক্রেভান কতবড় মিথ্যেবাদী সেটাও বুঝতে পারবেন।

বেশ চলুন। কিন্তু আপনাকে নিরস্ত্র যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ভালো কথা। হ্যারল্ড কোমরবন্ধনী থেকে তরোয়াল খুলে একজন সঙ্গীর হাতে দিল। তারপর বলল, কিন্তু আপনাকে একা যেতে হবে। তরোয়াল রেখে দিন।

বেশ। তাই যাব। ফ্রান্সিস মাথা তুলে বলল। তারপর হ্যারিকে তরোয়ালটা দিয়ে দিল।

সবার আগে হ্যারল্ড চলল সিঁড়ির দিকে। শাঙ্কো বন্ধু কয়েকজনকে নিয়ে তার আগেই দ্রুত ডেকে উঠে এল। শাঙ্কোর মনে তখন আশঙ্কা। হাঙরের কামড়ে আহত ফ্রান্সিস এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। তরোয়ালের লড়াইয়ে আগের মতো বিদুৎগতিতে আক্রমণ করতে পারে না। দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলে ফ্রান্সিস জয়ী হলেও অক্ষত থাকবে না। ও নিঃশব্দে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে অস্ত্রঘরে চলে এল। ডেকে উঠে এল সবাই। জাহাজ দুটো গায়ে গায়ে লাগানো রয়েছে। প্রথমে হ্যারল্ডের সঙ্গীরা লাফ দিয়ে ওদের জাহাজে গিয়ে উঠল। পেছনে হ্যারল্ড আর ফ্রান্সিস। হ্যারল্ড ডেকের চারদিক হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, কোথায় ধনসম্পদ? কোথায় বন্দী ক্রীতদাস?

ও সব ডেকে কেউ সাজিয়ে রাখে না। ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধ হলেও মৃদু হাসল। বলল, সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলুন। সিঁড়ির ধারে এসে হ্যারল্ড ফিরে দাঁড়াল। ওর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, আগে তোরা নেমে যা। যে সঙ্গীটি হ্যারল্ডের তরোয়ালটার হাতল ধরে ঝুলিয়ে আসছিল সে এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল, সবাই তরোয়াল ডেকে রেখে যাবে। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই হ্যারল্ড দ্রুত হাতে সঙ্গীর হাত থেকে তরোয়ালটা ছিনিয়ে নিল। সতর্ক ফ্রান্সিস শরীরের এক ঝটকায় কয়েক পা পিছিয়ে এল। কিন্তু একটু কমজোরি বাঁ পাটার জন্যে ভারসাম্য রাখতে পারল না। ডেকের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। মুখে ক্রুর হাসি হত্যাকারীর জ্বলন্ত চোখ নিয়ে হ্যারল্ড এক লাফে উদ্যত তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস গড়িয়ে গেল। বিদুৎবেগে পাক খেয়ে ছুটে এল শাঙ্কোর ছোঁড়া ছোরাটা। হ্যারল্ডের বুকে লাগল না। ওর ডান কাঁধ ছুঁয়ে গেল। এইটুকু বাধাতেই হ্যারল্ড আর ফ্রান্সিসের শরীর লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাতে পারল না। ও একটু থমকাল।

ততক্ষণ হ্যারিও জোরগলায় 'ফ্রান্সিস' ডাক দিয়ে তার দিকে তরোয়াল ছুঁড়ে দিয়েছে। ফ্রান্সিস দ্রুত মুখ তুলে তরোয়ালের ফলাটা ধরে ফেলল। ওর হাতের তালু ও আঙুল কিছুটা কেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল। তরোয়ালের হাতলটা ধরে ও দ্রুত উঠে দাঁড়াল। কাঁধে ছোরার ক্ষত নিয়ে হ্যারল্ড তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়ালের প্রথম মারটা ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস একটু পিছিয়ে এল। তারপর রুখে দাঁড়াল। শুরু হল দুজনের লড়াই। হ্যারল্ড তরোয়াল চালাতে চালাতে চড়া গলায় বলে উঠল, সবাইকে ডাকো। খতম করো এগুলোকে। ওদিকে শাঙ্কো, বিনোলারা খোলা তরোয়াল হাতে উঠে এসেছে হ্যারল্ডের জাহাজে। হ্যারল্ডের বাকি সঙ্গীরাও কেবিন থেকে ডেকে উঠে এসেছে।

লড়াই শুরু হয়ে গেল। অল্পক্ষণ লড়াই চালিয়েই হ্যারল্ডের দলের যোদ্ধারা বুঝল, ফ্রান্সিসের বন্ধুরা তরোয়ালের লড়াইয়ে কতটা নিপুণ, কত অভিজ্ঞ। ওরা আহত হতে লাগল। কমজোরি পাটা নিয়ে ফ্রান্সিসের লড়াই চালাতে অসুবিধেই হচ্ছিল। তবু ফ্রান্সিস হ্যারল্ডের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে তরোয়াল চালাতে লাগল। ও এটা বুঝতে পারল হ্যারল্ডের উদ্দেশ্য দলপতি হিসেবে ফ্রান্সিসকে মারাত্মক আহত করে জাহাজে চড়ে পালানো। স্লাভিয়া গিয়ে রাজা ম্যাগনামের নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডারের উদ্ধারের চেষ্টা করবে—এটা ও ভেবেছিল। কিন্তু যার সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব নয় সেই ক্রেভানকে তো পাওয়া যাবে না। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ভেবে নিয়েছে হ্যারল্ডকে হত্যা করতে হবে। ওকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। ও মারা গেলে ওর সঙ্গীরা সহজেই

হ্যারল্ডের বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল।

পরাজয় স্বীকার করবে। বেশি রক্তপাত এড়ানো যাবে। কাজেই ফ্রান্সিস হ্যারল্ডের তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। হ্যারল্ডকে ক্লান্ত করতে লাগল। একসময় হ্যারল্ড বেশ ক্লান্ত হল। জোরে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগ কাজে লাগাল। হঠাৎই দ্রুত দু'পা এগিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে তরোয়াল চালাল। হ্যারল্ড সেই মার ঠেকাল বটে কিন্তু ওর হাতের তরোয়াল নেমে এল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। হ্যারাল্ডের বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। হ্যারাল্ডের মুখ থেকে কাতরধ্বনি ছিটকে গেল। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। দু'হাতে বুকে বেঁধা তরোয়াল খুলে আনতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কাত হয়ে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। আস্তে আস্তে ওর দেহ স্থির হয়ে গেল।

ওদিকে হ্যারল্ডের সঙ্গীদের বেশ কয়েকজন মারা গেছে। আহতের সংখ্যাও কম না। ফ্রান্সিসের বন্ধুরাও দু'তিনজন আহত হল। একজন মারাও গেল। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, ভাইসব, লড়াই নয়। হ্যারল্ডের সঙ্গীরা শোনো। হ্যারল্ড মারা গেছে। তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো। আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। হ্যারল্ডের সঙ্গীরাও ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে লড়াই করে জেতা যাবে না। ওরা আস্তে আস্তে তরোয়াল ডেকের ওপর ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা তরোয়াল উঁচিয়ে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস ডাকল, হ্যারি—শাঙ্কো। হ্যারি আর শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। দু'পাশের কয়েকটা কেবিন পার হয়ে সেই তালাবন্ধ কয়েদঘরের কাছে এল। বড় তালা ঝুলছে। ফ্রান্সিস ডাকল, শাঙ্কো।

শাঙ্কো এদিক-ওদিক খুঁজে একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে এল। তারপর প্রচণ্ড জোরে তালাটায় ঘা মারল। তিন-চারটে ঘা পড়তেই তালা ভেঙে ঝুলে পড়ল। ততক্ষণে বন্দীরা এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শাঙ্কো দু'হাতে ঠেলে দরজা খুলে ফেলল। ক্যাঁচকোঁচ ধাতব শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। প্রায় অন্ধকার ঘর থেকে বন্দীরা বেরিয়ে এল। শাঙ্কো দেখল, বন্দীরা সকলেই বেশ সুস্থ-সবল। তবে পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন। একটু অবাক হয়েই শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, এরা তো ভালোই আছে দেখছি।

সেটাই তো স্বাভাবিক। অসুস্থ ক্রীতদাসকে কে কিনবে? ফ্রান্সিস বলল।

একজন বন্দী বলে উঠল, আমরা খেতে না চাইলে জোর করে খাইয়েছে।

ভাই, তোমরা মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পারো। ফ্রান্সিস বলল।

আমরা ইংল্যান্ডে—আমদের দেশে ফিরে যেতে চাই। কয়েকজন বলল।

বেশ। আমরা দোরস্তাদ বন্দরে যাচ্ছি। ওখানে নেমে তোমাদের দেশে যাওয়ার জাহাজে উঠে চলে যেও। তোমরা ডেকে উঠে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস ঘরটার চারদিকে তাকাতে লাগল। অন্ধকার ভাবটা অনেকটা সয়ে এসেছে। দেখল, এককোণে কালো কাঠের লম্বাটে সিন্দুকের মতো রয়েছে। তাহলে শাঙ্কো ঠিকই দেখেছিল! সিন্দুকের ডালায় দুটো বড় বড় তালা ঝুলছে। ওটা তো খুলতে হবে। ফ্রান্সিস ডাকল, শাঙ্কো। শাঙ্কো বাইরে থেকে হাতুড়িটা নিয়ে এল। একটা তালায় দমাদম হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। তালা ভেঙে ছিট্‌কে গেল। অন্যটাও একইভাবে ঘা মেরে ভাঙল। হ্যারি আর ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। হাতুড়ি রেখে শাঙ্কো ডালা ধরে চার পাঁচবার হ্যাঁচকা টান দিল। ডালা নড়ল। ফ্রান্সিসও হাত লাগাল। টেনে দুজনে ডালা খুলল। অন্ধকারেও দেখা গেল অনেক স্বর্ণমুদ্রা ও গয়নাগাটিও রয়েছে। তবে দামি পাথর নেই। একপাশে বেশ কিছু আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা, রুপোর বাট।

হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদ। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর শাঙ্কোকে বলল, বিনোলা আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এসো। এই সিন্দুক আমাদের জাহাজে নিয়ে চলো। শাঙ্কো চলে গেল। বিনোলারা কয়েকজন এল। সিন্দুকটা কাঁধে নিয়ে ওপরে ডেকে উঠে এল। ওপরে এসে ফ্রান্সিস দেখল, ভেন আহতদের ওষুধ দিচ্ছে। ক্ষতস্থান বেঁধে দিচ্ছে মারিয়া। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। কাজ সেরে মারিয়া ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, শাঙ্কোরা কী নিয়ে গেল?

সব বলছি। চলো।

ওরা নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। নিজের কেবিনে ঢুকে ফ্রান্সিস মারিয়াকে সব কথা বলল। হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদের লম্বা সিন্দুকটা শাঙ্কোরা রেখেছিল কোনার দিকে কাঠ, পাল আর যন্ত্রপাতি রাখার জায়গাটাতে। মারিয়া সাগ্রহে সে-সব দেখতে ছুটল।

ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হল। হাতের কাটা জায়গাটায় তখনও রক্ত জমে আছে। শরীরের নানা জায়গায় বিশেষ করে বুকে তরোয়ালের খোঁচা লেগে কেটে গেছে। হ্যারি পাশে বসল। বলল, ভেনকে ডাকব?

না-না। যারা বেশি আহত হয়েছে ভেন তাদের দেখুক। আমি তেমন কিছু আহত হইনি।

এখন কী করবে?

কোন ব্যাপারে?

ঐ সব ধনসম্পদ। ও সবই তো ইংরেজদের নিজেদের দেশের। ওদেরই দিয়ে দাও। ওদের দেশের সম্পদ ওরা নিয়ে যাক। হ্যারি বলল।

হ্যারি, ফ্রান্সিস হেসে বলল, কথাটা কি খুব ভেবে বললে?

কেন বলো তো?

বিনা পরিশ্রমে পাওয়া ধনসম্পদের লোভ বড় সাংঘাতিক। ঐ ধনসম্পদ নিয়ে যে জাহাজে চড়ে ওরা দেশে ফিরবে সেই জাহাজে মাঝসমুদ্রেই ওদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে। তাতে অন্য যাত্রীরাও জড়িয়ে পড়বে। তা ছাড়া সত্যিকারের দাবিদার কোন মঠ বা গির্জা তা কে খুঁজে বের করবে?

হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার যুক্তি অকাট্য, আমি অত ভেবে বলিনি। পাশে শুয়ে-থাকা ক্রেভান এবার আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল, তোমার বন্ধুদের মুখে সব শুনলাম। দোরস্তাদ বন্দরে আমাকে নামিয়ে দিও। ওখান থেকেই হেঁটে বিরকা চলে যাব।

কিন্তু স্লাভিয়ার রাজা ম্যাগনামের নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডার—তার কী হবে? ফ্রান্সিস বলল।

ওটার ওপর আমার আর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। তুমি কি ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে যাবে?

অবশ্যই যাব।

অনেক ধনসম্পদ তো পেলে। আর কেন? ক্রেভান একটু বিরক্তির সুরেই বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, এই ধনসম্পদ সব আমাদের রাজাকে দিয়ে দেব। উনি প্রজাদের কল্যাণের কাজে লাগাবেন। ক্রেভান একটু অবাক হল। ফ্রান্সিসকে সে আর পাঁচজন মানুষের মতোই অর্থলোভী ভেবেছিল।

ক্রেভান, ঐ নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডারের খোঁজ করতে গেলে আপনার সাহায্য ছাড়া এক পাও এগোনো যাবে না। আমাদের সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে। কাজের শেষে আপনাকে আমরা বিরকায় পৌঁছে দেব।

কতদিন আগের কথা। কীভাবে কোথায় পড়ে আছে সেই ধনভাণ্ডার। এখন কি আর সেটার হদিস পাবে?

আগে তো এরকম গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছি। এবারও দেখি চেষ্টা করে। এখন আপনার শরীর কেমন? ফ্রান্সিস বলল।

প্রায় সুস্থ। একটু আগেই হেঁটে দেখলাম। শরীরটা একটু কাঁপছে বটে তবে মনে হয় দু'একদিনের মধ্যেই সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারব।

আমি সেটাই চাই। স্লাভিয়ায় গিয়ে আপনাকে তো আমার সঙ্গে একটু হাঁটাহাঁটি করতেই হবে। পারবেন তো?

মনে হয় পারব।

ঠিক আছে। শুয়ে পড়ুন। বিশ্রাম করুন। ভালো কথা, দোরস্তাদ বন্দরটা ঠিক কোনদিকে পড়বে?

উত্তর-পশ্চিম দিকে কোনাকুনি।

হ্যারি, ফ্লেজারকে ঐ দিকেই জাহাজ চালাতে বলো।

আচ্ছা। হ্যারি উঠে চলে গেল। তখনই মারিয়া ঢুকল। বলল, সোনা-রুপোর গয়না-টয়নাও আছে দেখলাম।

হ্যাঁ। ভক্তরা মঠে, গির্জায় মূল্যবান জিনিস যীশুর নামে উৎসর্গ করে থাকে। এটা তো একদিনের ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিন চলে আসছে। সঞ্চিত হয়েছে। আচ্ছা ক্রেভান, স্লাভিয়া তো একটা গ্রাম?

হ্যাঁ, খাঁড়ি থেকে উঠে যাওয়া ঢালের গায়ে। ক্রেভান বলল।

ভালো কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল, আচ্ছা, রাজা ম্যাগনামের পাণ্ডুলিপিটা কি হ্যারল্ড নষ্ট করে ফেলেছিল?

বলতে পারব না। তবে আমার তো পড়ে, পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে।

উঁহু। ঐ পাণ্ডুলিপিটা খুঁজতে হবে। ওটা পেলে কিছু না কিছু সূত্র পাব। ফ্রান্সিস দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া ক্রেভানকে ওষুধ খাওয়াতে বসল।

হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারল্ডের জাহাজে এল। দেখল হ্যারল্ডের নিরস্ত্র সঙ্গীরা ও যারা বন্দী ছিল তারাও কয়েকজন ডেকের এখানে-ওখানে বসে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নীচে নেমে এল। প্রথমেই হ্যারল্ডের কেবিনে গেল। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় দেখল ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। একপাশে দামি পোশাক-টোশাক গুছিয়ে রাখা। বিছানাটা দামি চাদরে ঢাকা। বোঝা গেল হ্যারল্ড একটু শৌখিন ছিল। একপাশে কয়েকটা মরক্কো চামড়ার ঝোলানো ব্যাগ। ফ্রান্সিস ব্যাগগুলো খুলতে লাগল। হ্যারিও হাত লাগাল। কাগজপত্র বিশেষ কিছু পেল না। কাপড়-টাপড়, সোনার কাজ করা কোমরবন্ধনী, এসব পেল। সব কটা ঝোলাই দেখা হল। সেই ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল না।

ফ্রান্সিস, মনে হয় হ্যারল্ড সেটা বেছে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। হ্যারি বলল।

উঁহু। হ্যারল্ডের লক্ষ্য ছিল দোরস্তাদ বন্দরের পাশের খাঁড়ি দিয়ে স্লাভিয়া যাওয়া। ঐ পাণ্ডুলিপি আর ক্রেভানের সাহায্যে রাজা ম্যাগনামের নিরুদ্দিষ্ট ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে। আরো সম্পদ চাই, আরো ঐশ্বর্য। এ বড় সাংঘাতিক তৃষ্ণা। ফ্রান্সিস আবছা আলোয় চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল। হঠাৎ ও খুব অস্পষ্ট দেখল, একেবারে নীচে কাঠের কিছুটা চৌকোনো কাঠ উঁচু হয়ে আছে। চামড়ার ঝোলাগুলো সরিয়ে আনতে ওটা দেখা গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসল। উঁচু হওয়া কাঠটা টানতেই খুলে এল। দেখা গেল কারুকাজ করা একটা চৌকো চামড়ার থলিমতো। ফ্রান্সিস থলিটা নিয়ে হ্যারির কাছে এল। হ্যারিও থলিটা দেখে অবাক হল। ফ্রান্সিস থলিটা খুলল। কাগজের মতো পাতলা ভাঁজ করা দুটো চামড়া। একটা খুব পুরোনো। বিবর্ণ। অন্যটা পরিষ্কার। ফ্রান্সিস দুটোই হ্যারিকে দিয়ে বলল, দ্যাখো তো? হ্যারি প্রথমে পরিষ্কার চামড়াটার ভাঁজ খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ বলে উঠল, ফ্রান্সিস, এটা একটা হাতে আঁকা মানচিত্র।

কোন দেশের?

দেখছি... লন্ডন। তার মানে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের?

কোনো চিহ্ন দেখছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ছোট ফুটকি আর ত্রিভুজ মতো।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ভাবল। মাথা তুলে বলে উঠল, গুনে দেখো ফুটকির সংখ্যা কম, ত্রিভুজের সংখ্যা বেশি। একটু দেখেই হ্যারি বলল, ঠিক বলেছ।

সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ত্রিভুজগুলো হল মাঠের চিহ্ন, ফুটকিগুলো গির্জার চিহ্ন। সংখ্যায় গির্জা কমই হবে। হ্যারল্ড আটঘাট বেঁধেই লুঠ করার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ। রউয়েন বন্দরের নাম রয়েছে। হ্যারল্ড ঐ বন্দর থেকেই জাহাজ চালিয়ে ফিরছিল।

এবার অন্যটা দেখো। ভাঁজ খুলে ঐ বিবর্ণ চামড়াটা দেখতে দেখতে হ্যারি বলল, খুব অস্পষ্ট। আঁকাবাঁকা পুরোনো স্ক্যান্ডিনেভীয় দ্বীপ এটা বুঝতে পারছি কিন্তু পড়তে সময় লাগবে। তবে অসম্পূর্ণ। এই দেখো নীচের দিকে ছেঁড়া।

চলো। সব ভালো করে দেখতে হবে।

দুজনে জাহাজে উঠতেই শাঙ্কোরা কয়েকজন এগিয়ে এল।

দুজনে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস ক্রেভানকে পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে বলল, দেখুন তো এটাই সেই রাজা ম্যাগনামের পাণ্ডুলিপি কিনা?

ওটা দেখেই ক্রেভান বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই। কিন্তু আরও কিছু পাতা ছিল। আলো জ্বালো—দেখি।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখতে গেছে। হ্যারিই চকমকি পাথর ঘষে মোমবাতিটা জ্বালল। সেই আলোয় চোখ কুঁচকে দু'এক লাইন পড়ে ক্রেভান বলে উঠল, হ্যাঁ, এটাই শেষ পাতা। বাকি পাতাগুলো হ্যারল্ড ছিঁড়ে ফেলেছে। ঠিক বুঝেছিল এই পাতাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দু'তিন দিন পরে। সেদিন সকালের খাবার খেয়ে শাঙ্কো ডেকএ উঠে এল। আকাশ পরিষ্কার। রোদ উজ্জ্বল। শাঙ্কো পূবদিকে তাকাতেই সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় দূরে বেশ কয়েকটা জাহাজের মাস্তুল দেখল। মাস্তুলের মাথায় বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে। শাঙ্কো একটু গলা চড়িয়ে বিনোলাকে ডাকল। বিনোলা কাছে এলে বলল—ফ্রান্সিসকে গিয়ে বলো—একটা বন্দর দেখা যাচ্ছে। বোধহয় ওটাই দোরস্তাদ বন্দর। খবর পেয়ে ফ্রান্সিস এসে রেলিং ধ'রে দাঁড়াল। জাহাজ তখন সেই বন্দরের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। কিছু পরে জাহাজে বাড়িঘর দেখা গেল। তখনই হ্যারি সেখানে এল। বলল—এটাই দোরস্তাদ বন্দর। ক্রেভানের নির্দেশমতই তো ফ্লেজার জাহাজ চালিয়েছিল।

কাছে গেলেই বোঝা যাবে।

—তবু। নামবার আগে তো জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ক্রেভানকে এখানে আনতে পারলে ভালো হ'ত। হ্যারি বলল।

—না-না। ক্রেভানকে এখন বেশি টানাটানি করা ঠিক হবে না। ও বিশ্রাম করুক। বরং তুমি ওকে জিজ্ঞেস করে এসো একটা বড় বন্দরের কাছে আমরা এসেছি। সেই বন্দরে বেশ কয়েকটা জাহাজ নঙর ক'রে আছে। সেটা কোন বন্দর ঠিক বুঝতে পারছি না—ফ্রান্সিস বলল।

—ক্রেভানকে বলছি। হ্যারি চলে গেল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরের অনেক কাছে চলে এসেছে। লোকজন, বাড়িঘর, গাছপালা, নোঙরকরা জাহাজ সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই হ্যারি ফিরে এল। বলল—ক্রেভান বলছে—বন্দর এলাকার ডানদিকে একটা বড় গাছের পাশে একটা গীর্জার উঁচু চূড়ো দেখা যাবে। মাথায় পেতলের ক্রুশ।

—ঐ তো। ফ্রান্সিস আঙুল তুলে বলল।

—হ্যাঁ। গাদাগীর্জার ক্রশ বসানো চূড়ো। এটাই দোরস্তাদ বন্দর। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যারি কতদিন পর পরম নিশ্চিন্তে একটা বন্দরে নামতে পারবো। কত বন্দরে ঘাটে কত দুশ্চিন্তা নিয়ে হঠাৎ আক্রান্ত হবার আশঙ্কা নিয়ে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে। নামতে হয়েছে। পানীয় জল খাদ্য সংগ্রহের জন্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—সভ্য দেশেই নামছি সত্য কিন্তু এখানেও বিপদে পড়তে পারি। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বিপদ সব জায়গাতেই হতে পারে। তবে মানুষ ভাষা পরিবেশতো মোটামুটি পরিচিত। বিপদ আঁচ করা অনেক সহজ। কঙ্কাল দ্বীপ বা রেসিকের মত ??????? দ্বীপ রাজ্য তো নয়। কথাটা ব'লে ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্লেজারের কাছে গেল। বলল—ফ্লেজার জাহাজ ভেড়াও। ফ্লেজার জাহাজের হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বন্দরে জাহাজ ভেড়াল। শাঙ্কো আর বিনোলা গিয়ে পাটাতন পেতে দিল পাথুরে জাহাজ ঘাটে। একে তো দেশে ফেরার আনন্দ সেই সঙ্গে কতদিন পরে ইউরোপের ডাঙা। সুসজ্জিত ভদ্র মানুষদের ভিড়। রঙ বেরঙের পোশাকপরা মহিলারা পরিচিত ভদ্র মানুষদের মুখ। শহরের কত আনন্দ উচ্ছাসের হাতছানি। কয়েকজন বন্ধু মিলে উৎসাহের সঙ্গে হ্যারির কাছে ছুটে এল। বলল চলো এখনই নামি। একটু ঘুরেফিরে আসী হ্যারি হেসে বলল—তোমাদের মনে খুব আনন্দ উৎসাহ। স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্রান্সিস কী বলে দেখি। তারপর নামা। শহর দেখা। ঘুরে বেড়ানো।

—তাহলে রাজকুমারীকে বলি গিয়ে। ওরা বলল।

—কোন লাভ নেই। ফ্রান্সিস না বলা পর্যন্ত কেউ রাজকুমারীকে গিয়ে বিরক্ত করবে না। ডাঙায় নামবে না। হ্যারির কথায় ওদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। দেখা যাক—ফ্রান্সিস কী বলে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। মারিয়াও যেন বিছানার একপাশে এসে ছেঁড়া পোশাক সেলাই করছিল। দেখে হ্যারি বেশ দুঃখ পেল। বলল—রাজকুমারী—আমরা একটা বড় বন্দর শহরে এসেছি। ছেঁড়া পোশাক টোশাক আর সেলাই করবেন না। নতুন পোশাক কিনতে নামবো আমরা। মারিয়া হেসে বলল—হ্যারি—পুরোনো পোশাকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক স্মৃতি। কোন পোশাক

পরে জাহাজে রাতের নাচগানের আসরে গেছি। কোন পোশাক পরে কোন বিদেশি রাজার অন্দরমহলে থেকেছি বা কয়েদগারে থেকেছি। এইসব স্মৃতি কি ভোলা যায়? ফ্রান্সিস সপ্রশংস দৃষ্টিতে মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মৃদু হাসল। কিছু বলল না। একপাশে সে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। এবার মাথা নেড়ে পাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল—বড় সুন্দর কথা বলেছেন।

—ক্রেভান—এই আমাদের রাজকুমারী। আমাদের এই ছন্নছাড়া জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা মা বোনেদের স্নেহ সাহচর্য পাই ওঁর কাছেই। হ্যারি বলল ফ্রান্সিস অমনি উঠে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি চলো হ্যারল্ডের জাহাজে যাবো। কিছু কাজ বাকি আছে।

—কিন্তু বন্ধুরা তো এখনই এখানে নামতে চাইছে। শহরটা ঘুরেফিরে— । কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—উঁহু, এখন না। বাকি কাজগুলো সেরে তারপর।

দু'জনে ডেকএ উঠে এল। দেখল—শাঙ্কোরা অনেকে দল বেঁধে রেলিং ধরে দোরস্তাদ শহরের দিকে আগ্রহে তাকিয়ে আছে।

—শাঙ্কো শোনো। ফ্রান্সিস ডাকল। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

—যাও। হ্যারল্ডের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা কেটে দাও। আর ওদের জাহাজ চালককে বলো ওদের জাহাজটাকে বন্দরে ভেড়ায়। পাটাতন ফেলো আমরা ওদের জাহাজে যাবো। ফ্রান্সিস চলল। শাঙ্কো চলে গেল। জামার তলা থেকে ওর ছোরাটা বের করে বাঁধা দড়িটা কেটে দিল। হ্যারল্ডের জাহাজ চালককে ডেকে—ওদের জাহাজের পাশেই জাহাজ ভেড়াতে বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজ থেকে নেমে পাতা পাটাতন দিয়ে হ্যারল্ডের জাহাজে গিয়ে উঠল। দেখল ইংরেজ বন্দীরা খুব উৎসাহ নিয়ে জাহাজের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের কাছে তো এটা নতুন দেশ। কিন্তু হ্যারল্ডের লুঠেরা সঙ্গীরা চুপ করে ডেকে বসে আছে। ওদের কাছে এটা নতুন জায়গা নয়। এর আগেও এখানে এসেছে ওরা। মাস কয়েক আগেও ওরা এই বন্দর থেকেই ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিল। একজনের হাতে কাঁধে কাপড়ের পট্টি বাঁধা দেখা গেল। তরোয়ালের লড়াইয়ের সময় কেটে ছড়ে যাওয়া ওরা গায়ে মাখে না। সমুদ্রের লবণাক্ত জলই এসবের ভালো ওষুধ। বেশি কেটে গেলে বেশি রক্তপাত হলে তবেই সঙ্গী বৈদ্যরা চিকিৎসা করে ওষুধ দেয়। ভাইকিংদের ক্ষেত্রেও এই রীতিই চলে আসছে।

ওদের দু'জনকে দেখে ইংরেজ বন্দীরা এগিয়ে এল। দু'একজন হাসি মুখে বারবার বলতে লাগল—আপনাদের কী ব'লে ধন্যবাদ জানাবো। ক্রীতদাসত্বের দুঃসহ জীবন থেকে আমাদের বাঁচালেন। আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। কথাগুলো ব'লে ওরা একে একে এসে ফ্রান্সিস ও হ্যারিকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঠিক আছে—ঠিক আছে। এখন বলো তোমরা কী করবে। একজন বলল—আমরা ঠিক করেছি এই জাহাজে চড়েই আমরা ইংল্যান্ডে ফিরে যাবো।

—ভালো কথা। তাই করো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে নিয়ে সেই ভাইকিং লুঠেরার দলের কাছে এল। ওরা চুপ করে ডেকে বসেছিল। একজন এসে ফ্রান্সিসের সামনে দাঁড়াল বলল—আমরা আপনাদের সঙ্গে দেশে ফিরে যাবো।

—তোমার নাম কী? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—চার্মান্ত। লোকটি বলল।

—না। তা হবে না। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা ইংল্যান্ডে গিয়ে লুঠপাট করেছো নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছো। ভাইকিং জাতির কলঙ্ক তোমরা।

—আমরা তো হ্যারল্ডের নির্দেশেই এইসব করতে বাধ্য হয়েছি। চার্মান্ত বলল।

—এটা একটা যুক্তি হল? হ্যারি বলল—হ্যারল্ড তো একটা কুলাঙ্গার। সে বলল আর তোমরা নির্বিবাদে নরহত্যা করলে।

—আমরা তো আপনাদের স্বজাত, আপনাদের স্বদেশবাসী। চার্মান্ত বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না-না। তোমাদের মত ঘাতকদের কোন দায়িত্ব আমরা নেব না। তোমাদের এই বন্দরেই নেমে যেতে হবে। তারপর বাঁচো মরো—তোমাদের ব্যাপার।

—হ্যারল্ডের ধনসম্পদ তো আপনারা নিয়ে গেছেন। সেখান থেকেই আমাদের খাওয়া পরা জাহাজের ভাড়ার জন্য— কথার শেষ করতে না দিয়েই ফ্রান্সিস বলল—ঐ সম্পদ তোমাদের না। ঐ সম্পদ ইংল্যান্ডবাসীদের। দিতে হলে ঐ ইংরেজ বন্দীদেরই দেব। তোমাদের নয়।

চার্মান্ত ভালো করেই বুঝল স্বজাতি হলেও ফ্রান্সিসরা ওদের কোনরকম সাহায্য করবে না। ও চুপ করে রইল। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। দুজনে ইংরেজ বন্দীদের কাছে ফিরে এল। বলল—তাহ'লে তোমরা কখন দেশের দিকে জাহাজ চালাবে?

—কত দিনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছি। অন্তত একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরবো ভাবছি। একজন বলল। অন্যজন বলল—

—কিন্তু আমাদের জামা কাপড়ের অবস্থা তো দেখছেন। আমরা কপর্দকশূন্য। পথে খাদ্যও তো লাগবে।

—ঠিক আছে। ভাই আমরাও ধনী নই। দু'একজন রাজা খুশি হ'য়ে আমাদের সোনার চাকতি কিছু কিছু দিয়েছে। আমি কিছু তোমাদের পাঠিয়ে দেব। এই বিদেশে পড়ে থেকো না। এখানে তোমাদের কে চেনে যে খাদ্য আশ্রয় দেবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যাবো। একজন বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শাঙ্কো দু'জনের কাছে এল। ফ্রান্সিস ওদের মুখ দেখেই বুঝল—ওরা কী বলতে চাইছে। হেসে বলল—দুপুরে খাওয়া শেষ ক'রে আমরা এই বন্দর শহরে যাবো। ঠিক আছে। বন্ধুরা খুশিতে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। কেবিন ঘরে ঢুকলে মারিয়া বলল—বন্ধুরা খুশির ধ্বনি তুলল। কী ব্যাপার?

—দুপুরে এইখানে নামবে। ঘরেটুরে আনন্দ করবে। ফ্রান্সিস বলল খুশি হ'য়ে মারিয়া বলল—সত্যি?

—হ্যাঁ। বড় শহর। অনেক কিছু পাওয়া যাবে। দু'দুবার জাহাজ লুঠ হয়েছে। অন্তত কাপড় জামা তো কটা বানাতে হবে। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতে বলল। মারিয়া খুশিতে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিল। মারিয়াকে এত খুশি দেখে ফ্রান্সিস নিজেও খুশি হল। মারিয়ার বিমর্ষ ভাবনা অনেকটা কেটে গেছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরেই সবাই পোশাক পাল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নতুন পোশাকগুলো তো সব ডাকাতরা নিয়ে গেছে। বাকি পোশাক যেগুলো একটু ভালো অবস্থায় আছে সেসব পরে ওরা একে একে ডেকে এসে জড়ো হ'ল। ক্রেভানের দেখাশুনার জন্যে বৈদ্য ভেনকে রেখে ফ্রান্সিস আর মারিয়া ডেকে উঠে এল। দু'জনের গায়েই ভালো পোশাক। মারিয়া একটা হালকা নীল রঙের পোশাক পরেছে। গলার নেকলেসটা ডাকাতরা নিয়ে নিয়েছে। সবচেয়ে দামি নেকলেসটা পরেছে। মাথার চুল বেঁধেছে টান টান করে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে রাজকুমারীকে। সবাই পরস্পর দৃষ্টিতে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারিও নতুন পোশাক পরে ততক্ষণে এসে গেছে।

সবাই পাটাতন দিয়ে হেঁটে হেঁটে পাথুরে তীরে নামল। সবাই একত্র হলে হ্যারি বলল—শোন—আমাদের জামা কাপড় তো ডাকাতি হয়ে গেছে। সবার আগে আমরা কোন দর্জির দোকানে যাবো। কাপড় বেছে মাপটাপ দেব। তারপর তোমাদের হাতে সোনার চাকতি দেওয়া হবে। সবাই ঘুরে ঘুরে শহর দেখবে। শহরের বাইরে দূরে যাবে না। আনন্দ করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আঙুল তুলে উঁচু গীর্জাটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—সবাই ঐ গীর্জাটার নিচে এসে জড়ো হবে। বেশি দেরি করবে না। সবাই বড় রাস্তাটায় এল। দু'দিকে বাড়িঘর লোকজন দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল। দু'চারটে বেশ শৌখিন ঘোড়ার গাড়ি দেখল। সুবেশ পুরুষ মহিলাদের দেখল।

হ্যারল্ডের জাহাজের ডেক-এ বসেছিল লুটেরা ভাইকিংরা। চার্মান্তই ওদের দলনেতা। হ্যারল্ডের ডান হাত। ফ্রান্সিসরা ওদের লুঠ করা ধনসম্পদ নিজেদের জাহাজে নিয়ে গেল এটা ওদের সহ্য হচ্ছিল না। ওরা একই সঙ্গে নিষ্ঠুর আর মিথ্যেবাদী। চার্মান্ত এবার বন্ধুদের বলল—শোন—স্বজাতি স্বদেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্সিস আমাদের জন্যে কিছুই করতে চাইল না। বরং এই জাহাজের আশ্রয় থেকেও আমাদের বিতাড়িত করতে চাইল। একটু থেমে বলল—থাক সেসব—হ্যারল্ডের সঙ্গে এই বন্দরে ঐ শহরে বেশ ঘুরেছি। কয়েকটা আস্তানা জানা আছে আমার। এই দারস্তানে আছে ইউসুফ। লোকে ওকে অন্য নামে চেনে। ইউসুফ আসলে আরবদেশের মানুষ। বাইরে ব্যবসায়ী। আসলে ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসা। বেশ ধনী। ওর বাড়িতেও আমি গেছি। বাইরে থেকে সাদামাটা বড় বাড়ি। ভেতরে আছে গরাদ দেওয়া কয়েদ ঘর। আমরা য়ুরোপের ইংলন্ডের সাদা মানুষ ধরে আমাদের জাহাজে আটকে রেখে এখানে আসি। গভীর রাতে তাদের ইয়ুসুফের বাড়িতে নিয়ে যাই। ইয়ুসুফের কয়েদঘরে ওদের বন্দী ক'রে রাখা হয়। হ্যারল্ড তাদের বিক্রি করে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চলে আসে। ইয়ুসুফ আরো বেশি কুফি মানে আরবীয় স্বর্ণমুদ্রায় তাদের বিক্রি করে। চার্মান্তের সঙ্গীরা এতসব খবর জানতো না। হেরল্ডের নির্দেশমত নরহত্যা লুঠপাট করতো। একজন দলের লোক বলে উঠল—এসব ভেতরের খবর শুনে আমাদের কী হবে। আমরা দেশেও ফিরে যেতে পারবো না। ফ্রান্সিস আমাদের রাজার খুব প্রিয়পাত্র। কোনভাবে আমাদের কথা জানতে পারলে আমাদের হয় মেরে ফাঁসি দেবেন নয়তো দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। না খেয়ে মরবো আমরা—সেইজন্যেই সবদিক ভেবে বলছি—হ্যারল্ড তো

মারা গেছে। ও যা করে স্বর্ণমুদ্রা পেতো আমরা তাই করবো। চার্মান্ত বলল। সঙ্গী লুঠেরারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। চার্মান্তের মতলব বুঝতে পারল না। চার্মান্ত এবার চারদিকে তাকাল। দেখল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা একটু দূরে গল্পগুজব করছে। চার্মান্ত গলা নামিয়ে বলল—শোন—আমি নেমে যাচ্ছি। ইয়ুসুফের আস্তানায় যাবো। হ্যারল্ড মারা গেছে এটা বলবো না। বলবো আমরাই এগারোটা ইংরেজ ক্রীতদাস এনেছি। শ্বেতকায় মানে আরবীয়র। যাদের সাহিব বলে সেইসব ক্রীতদাসের দাম অনেক। অর্ধেক দাম পেলেও আমাদের হাতে যথেষ্ট কুফি আসবে। তখন যে যার মত নিজের রাস্তা দেখবো। বুঝলি বোকার দল?

সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল।

তারপর একজন বলল—ঠিক আছে। এ ছাড়া তো বেঁচে থাকার কোন উপায় দেখছি না। কিন্তু আমাদের সমান স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে।

—অবশ্যই। তবে আমার বুদ্ধিতেই তো এসব হবে। কাজেই আমি বেশিরভাগটা নেব। কী? তোরা রাজী।

—তোমার খুব কূটবুদ্ধি চার্মান্ত। একজন বলল।

—আগে বল্ তোরা আমাকে সাহায্য করবি কিনা। চার্মান্ত বলল।

—উপায় কি। নইলে এই বিদেশে না খেয়েই মরতে হবে একজন বলল। চার্মান্ত দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বলল আমি সব ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। তোদের জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে এলে বলবি আমার এক বন্ধু গেছে আমাদের আস্তানা খুঁজতে। ও এলেই আমরা নেমে যাবো। ঠিক আছে? ওরা আর কী বলবে। চুপ করে রইল। চার্মান্ত একটু সতর্কভাবে চারদিক দেখেটেখে পাটাতন দিয়ে জাহাজঘাটে নেমে পড়ল। তারপর দ্রুত ভিড়ের রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট মোড় পার হয়ে দুটো গাছের মাঝখানে একটা বড় পাথর গাঁথা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটার নিচে রাস্তায় দুটো ঘোড়ায়টানা মালবাহী গাড়ি দেখল। গাড়ি দুটোর পেছনে একটা বেশ বড় লোহার দরজা খোলা। বিরাট ঘর। মালপত্র বোঝাই। একপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে বসে আছে। খাটের আসনে একজন বসে একটা লম্বা কাগজে বোধহয় হিসেবটিশেব লিখছে। চার্মান্ত নিঃশব্দে ওদের দৃষ্টি ছাড়িয়ে বাড়িটার পাশের চিলতে গলিটায় ঢুকে পড়ল। কিছুটা এগিয়েই বাঁদিকে পেল একটা কাঠের দরজা। চার্মান্ত চিনতো। গলিটার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে

নিয়ে দরজাটায় দুটো টোকা দিল। একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল। এক দশাসই চেহারার কালো মানুষ মুখ বাড়াল। তার চামড়ার কোমর বন্ধনীতে ঝুলছে একটা বড় ছোরা। ছোরাটার কোন খাপ নেই। প্রহরীর খালি গা। একটা চামড়ার ফিতে বুকেপিঠে আড়াআড়ি বাঁধা। চার্মান্তকে দেখে মৃদু হেসে বলল—হ্যারল্ড।

—সাহিব?

—পরে আসবে। লোকটা সরে দাঁড়াল। চার্মান্ত একটু দ্রুত ঢুকে পড়ল। দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বেশ অন্ধকার সামনে। চার্মান্তের পরিচিত জায়গা। তবু ও অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। কিছুটা এগোতে ডানদিকে একটা বেশ কাজ করা দরজা। চার্মান্ত দরজাটা আস্তে ঠেলল। দরজাটা খুলে গেল। একটা বড় ঘরে ঢুকল ও। ঘরটায় বেশ আলো দু'ধারে কয়েকটা কাঁচে ঢাকা আলো জ্বলছে। মেঝেয় কার্পেট পাতা। সামনে একটা ঝলমল কাপড় পাতা বিছানায় একটা ফুলপাতা বোনা কাপড়ে ঢাকা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মধ্যবয়স্ক ইউসুফ বসে আছে। পরনে এই অঞ্চলের অভিজাত মানুষদের জাঁকালো পোশাক। মুখ পরিষ্কার কামানো। ইয়ুসুফ একটু হেসে স্পেনীয় ভাষায় বলল—কী ব্যাপার? হ্যারল্ড সাহিব কই?

—উনি এখন ইংল্যান্ডে। একদফা পাঠিয়েছে আমার সঙ্গে। মোট এগারোজন উনি নতুন জাহাজ নিয়ে পরে আবার একদফা আসবেন।

—হুঁ। কখন পাঠাবে? ইসুয়ুফ বলল।

—গভীর রাতে। যেমন পাঠানো হয়। চার্মান্ত বলল।

—পাহারা দিয়ে আসবে। চ্যাঁচামেচি যেন না হয়। ইয়ুসুফ বলল।

—না-না। চার্মান্ত জোরে মাথা নাড়ল।

—পৌঁছে দিলে দাম পাবে। সব সাহেব তো? ইয়ুসুফ বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। চার্মান্ত মাথা কাত করল। তারপর হ্যারল্ডের সম্পত্তির কথা ফ্রান্সিসদের কথা—সিন্দুক নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। বেশ মন দিয়ে শুনে ইয়ুসুফ বলল—ঐ ধনসম্পত্তির সিন্দুকের কথা পরে ভাবা যাবে। কী নাম ওদের দলনেতার?

—ফ্রান্সিস। চার্মান্ত বলল—আমাদের মতই ভাইকিং।

—ওরা এখানে কতদিন জাহাজ নোঙর করে থাকবে? ইয়ুসুফ জানতে চাইল।

—বোধহয় দু-তিন দিন। চার্মান্ত বলল।

—হুঁ। মুখে শব্দ করল ইয়ুসুফ। তারপর বলল—তোমরা যেভাবে বরাবর আনো সেভাবে আনা যাবে না। ফ্রান্সিসরা পাশের জাহাজে থাকবে। কিছু কথাবার্তা তোমাদের মধ্যে হবেই। কারণ তোমাদের জোর খাটাতে হবে। ফ্রান্সিসরা টের পাবে। ধরা পড়ে যাবে। কাজেই কৌশলে কাজ সারতে হবে। আমি বিকেলে তোমাদের জাহাজে যাবো। যা ব্যবস্থা করার করবো।

—চার্মান্ত ঠিক বুঝল না। বলল—ওরা খুব দুর্ধর্ষ।

—এক ফোঁটাও রক্ত পড়বে না। যাও। আমি সময়মত যাবো। তারপর মুখে একটা বা হাতে তুড়ি দিল। ওপাশের দরজা খুলে দু'জন বলশালী কালো যোদ্ধা দ্রুত ঢুকল। ওদেরও কোমরে খোলা বড় ছোরা ঝুলছে। ইয়ুসুফ আঙ্গুল তুলল। একজন প্রহরী ছুটে গিয়ে একটু অন্ধকারে কাজ করা লোহার টেবিল থেকে একটা ছোট লাল রঙের থলে নিয়ে এলো। ইয়ুসুফের হাতে দিল। ইয়ুসুফ থলি থেকে বাঁহাতে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করে চার্মান্তকে দিল। বলল—পরে আরো পাবে। চার্মান্ত ইয়ুসুফের ডান হাতটা কোমর বন্ধনীতে ঢোকানো দেখল। আগেও তাই দেখেছে।

চার্মান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝে উঠতে পারল না ইয়ুসুফ নিজেই যাবে কেন। তবে কি ইয়ুসুফ ওকে বিশ্বাস করছে না? এসব ভাবতে ভাবতেই চার্মান্ত জাহাজে ফিরে এল। জাহাজের সঙ্গীদের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল—ইউসুফ বিকেলে আসবে। কীসব ব্যবস্থা করবে বলল। সবাই চুপ করে রইল। এখন শুধু অপেক্ষা করা।

ওদিকে ফ্রান্সিস মারিয়ারা জাহাজ ঘাটে নেমেছে। ঘরবাড়ি লোকজন দেখতে দেখতে ওরা চলল। সবাই বেশ খুশি। প্রথমেই শাঙ্কোকে পাঠানো হল একটা ভালো কাপড় জামার দোকানের খোঁজে। শাঙ্কো একটু পরেই ফিরে এসে একটু দূরে ডানদিকে একটা বড় দোকান দেখাল। সবাই এগিয়ে এসে দোকানে ঢুকল। দোকানের একপাশে কাপড়ের গাঠরি সাজিয়ে রাখা। টাকমাথা দোকানদার হাসিমুখে এগিয়ে এল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—আসুন আসুন। এত খদ্দের। ভালো বিক্রি হবে। ওরা অভ্যস্ত চোখেই বুঝল এরা বিদেশি। এদের জামা, পোশাকই বলছে অনেকদিন এরা সমুদ্রে জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছে। এরা কী কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেসব জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহও দোকানদার দেখাল না। ও জানে জলদস্যুরাও পোশাক পাল্টে নতুন পোশাক

কিনতে আসে। কিন্তু মারিয়াকে দেখে বেশ কৌতুহলী চোখে মারিয়ার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই চোখ ঘুরিয়ে বলে উঠল আপনারা নিশ্চয়ই নতুন পোশাক তৈরি করাবেন?

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল। সবার মাপ টাপ নিন। আর—হ্যারি মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—এই ভদ্রমহিলারও পোশাকের জন্যে যে কোন দামের যে কাপড় এর পছন্দমত হবে সেই মতো দেবেন।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। ওপাশেই আমার সেলাইয়ের দোকান। সব পোশাক আমি তৈরি করে দেব ঠিক যেমনটি আপনারা চাইবেন।

—তাহ'লে তো ভালোই। কিন্তু সব পোশাক তৈরি করিয়ে দিতে হবে কাল দুপুরের মধ্যে। আমরা কাল সন্ধ্যের আগেই জাহাজ ছাড়বো।

—নিশ্চয়ই পাবেন। তবে কিছু অগ্রিম দেবেন। রাত জাগতে হতে পারে। মারিয়া কোমরবন্ধনী থেকে পাঁচটা সোনার চাকতি বের করল। হাত বাড়িয়ে দিল।

—আসুন কাপড় পছন্দ করুন। দোকানদার নিজেই গাঠরির মুখ খুলে কাপড় দেখাতে লাগল। ভাইকিংরাও আগ্রহের সঙ্গে পছন্দমত কাপড় দেখতে লাগল।

—সবাই একরকম কাপড় পছন্দ কর ফ্রান্সিস বলল। সবাই কাপড় দেখেশুনে বাছতে লাগল। এবার দোকানদার মারিয়ার জন্যে কাপড়ের একটা ছোট গাঁটরি খুলে মারিয়াকে দেখাতে লাগল। সবাইমিলে একরকম কাপড় পছন্দ করল। দোকানদার মাথা চুলকে বলল—অতজনের কাপড় তো হবে না। এবার বাকি কাপড় অন্যরকম পছন্দ করা হল। মারিয়াও একটা দামি কাপড় পছন্দ করল। ফ্রান্সিসের দিকে হেসে তাকিয়ে বলল—এটা তোমার পছন্দ হচ্ছে? ফ্রান্সিস বলল—ভালোই তো এসব পছন্দ টছন্দের বালাই আমার নেই। বরং হ্যারিকে বলো। কিন্তু যা করবে তাড়াতাড়ি কর। পছন্দের পাট চুকল। সবাই রাস্তায় নেমে এল। হ্যারি বলল—এবার নিজেদের মত ঘুরে বেড়াও। খেতে চাইলে খেতেও পারো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই যেমন বলা হয়েছে গীর্জার সামনে এসে জড়ো হবে। দুজন তিনজন একসঙ্গে কেউ একা ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারি ঘোরাঘুরি শুরু করল।

কিছুক্ষণ পরেই একজন দুজন করে গীর্জাটার সামনে এসে জড়ো হল। ফ্রান্সিসরাও এল। শাঙ্কোর হাতে একটা গোল চামড়ার ঢাকনাওয়ালা বাজনা। যন্ত্রটার গায়ে ঘুঙুরমত আটকানো। হাত দিয়ে চাপড় দিয়ে বাজিয়ে শাঙ্কো ওটা

বাজাতে বাজাতে হাসতে লাগল। বাজবার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দও তালে তালে বাজছিল।

—ওটা এখানকার জীপসিদের বাজনা। মারিয়া দেখে বলল।

সবাই শেষ বিকেলে জাহাজে ফিরে এল। ওরা যখন পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠছে তখন হ্যারি দেখল পাশে নোঙর করা হ্যারল্ডের জাহাজের পাটাতন দিয়ে এক অভিজাত পোশাকপরা মধ্যবয়স্ক লোকও উঠছে। আর চার্মান্ত তাকে সাদরে তুলে আনছে। হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—ভদ্রলোক কে?

এবার ফ্রান্সিসও তাকিয়েই ইয়ুসুফকে দেখল। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঐ দিকে তাকিয়ে দেখল ইয়ুসুফকে চার্মান্তরা আর ইংরেজরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইয়ুসুফ সবাইর দিকে তাকিয়ে কিছু বলছে।

—তাহ'লে চার্মান্তরা এখনও জাহাজ থেকে নেমে যায়নি। হ্যারি বলল।

—তাইতো দেখছি। কিন্তু এরকম অভিজাত চেহারা পোশাকের মানুষ। ওদের জাহাজে এল কেন। ওদের বলছেই বা কী? ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল।

—বোধহয় জাহাজটা কিনতে এসেছে। হ্যারি বলল।

—হতে পারে। তবু মনে একটা খট্‌কা লাগছে। চলো তো দেখি। ফ্রান্সিস বলল। বলে ফ্রান্সিস পাটাতনের দিকে এগোল। হ্যারিও পেছনে পেছনে এল।

দু'জনে হ্যারল্ডের জাহাজের ডেকএ উঠে এল। ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চার্মান্ত বেশ সতর্ক ভঙ্গীতে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ও কিছু বলার আগেই ইয়ুসুফ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারা—মানে—এখানে এসেছেন কেন?

—আমরা ঐ চার্মান্তের দেশের লোক। ভাইকিং। আপনার পরিচয়? ফ্রান্সিস বলল।

চর্মান্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—ইনি এই শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। এর নাম—। কিন্তু ইয়ুসুফ সঙ্গে সঙ্গে চার্মান্তকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল—শুনলেন তো—আমি ব্যবসায়ী। এই জাহাজটার মালিক আমি—ফিগান আমার নাম।

—ঠিক বুঝলাম না। এই জাহাজ তো হ্যারল্ডের। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারল্ড মাস ছয়েক আগে আমাকে বিক্রি করেছে। ইয়ুসুফ সাদা মাটা গলায় বলল।

—কিন্তু হ্যারল্ড তো মারা গেছে। ইয়ুসুফ একটু চমকে উঠেও বেশ নির্বিকার গলায় বলল—হ্যাঁ—চার্মান্ত আমাকে বলেছে সেকথা।

—কিন্তু আপনিই যে এই জাহাজ কিনেছেন তার প্রমান কিছু আছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল। ইয়ুসুফ মৃদু হেসে বাঁহাত দিয়ে ডানদিকের পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা এক ভাঁজ করা লম্বাটে ছাইরঙা পার্চসমেন্ট কাগজ বের ক'রে বাঁহাতেই হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি পড়ল স্পেনীয় ভাষায় লেখা একটা জাহাজ বিক্রির দলিল। হ্যারি পড়ল—ফিগোন নামে দোরস্তাদের ব্যবসায়ীকে এই জাহাজ পঁচিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করলাম। নিচে হ্যারল্ডের স্বাক্ষর। তারিখ ছ' মাস আগেকার।

হ্যারি পড়ে কাগজটা ফিগোনকে ফেরৎ দিল। ফিগোন ওটা নিয়ে আবার বাঁহাতে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। মাথা ওঠানামা করে হ্যারি বলল—হ্যাঁ। হ্যারল্ড ছ'মাস আগে এই জাহাজটা পাঁচিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রায় এঁর কাছে বিক্রি করেছে। ফ্রান্সিস এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে ইয়ুসুফের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিল—লোকটার চোখেমুখে কোন ভাবান্তর নেই। কেমন একটা অদ্ভুত নির্বিকার ভঙ্গী। এমনকি হ্যারল্ড মারা গেছে শুনেও একটু চম্‌কে উঠলেও পরক্ষণেই নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়েছে। এসব লোকের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই মনে মনে কী ফন্দী আঁটছে। একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ফ্রান্সিস বলল— কিন্তু এতদিন দখল নেননি কেন?

—হ্যারল্ড ইংল্যান্ড চলে গেল। বলে গিয়েছিল ফিরে এসেও জাহাজটা আমাকে দিয়ে অন্য জাহাজ কিনে নিয়ে নিজের দেশে চলে যাবে। ইয়ুসুফ বলল।

—কিন্তু একটা জাহাজ কেনার ক্ষমতা আয আছে সে তার জাহাজটা বিক্রি করবে কেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন তুলল।

—ব্যবসা সেরে লাভের টাকা থেকে নতুন একটা ভালো জাহাজ কেনার ক্ষমতা হবে তখন। অকাট্য যুক্তি। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। লোকটার বেশ কূটবুদ্ধি আছে সন্দেহ নেই।

তখনই ইয়ুসুফ হাততালি দিয়ে বলল—তোমরা সবাই সার দিয়ে দাঁড়াও। কিছু অগ্রিম দেব। বাঁহাতে তুড়ি দিয়ে চার্মান্তকে ইশারায় ডাকল। আবার বাঁহাত পোশাকের ভেতর ঢুকিয়ে একটা সাটিন কাপড়ের নীল থলে বের করল। বাঁহাতে থলেটা ধরে চার্মান্তকে দিয়ে বলল—সবাইকে দুটো করে স্বর্ণমুদ্রা দাও। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল ফিগোন সেই যে ডান হাতটা প্রায় কব্জি

পর্যন্ত কোমরের রুপোর কাজ করা চামড়ার বেলটে ঢুকিয়ে রেখেছে একবারও সেই কোমরবন্ধনী থেকে তুলে আনল না। বোধহয় লোকটা বাঁহাতী। অনেকেরই বাঁহাতটা বেশি শক্তি ধরে। তারা বাঁহাতই বেশি ব্যবহার করে। এমনকি লেখেও। প্রত্যেককে যখন স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হচ্ছে তখন ইয়ুসুফ বলল—তাহলে চার্মান্তর সঙ্গে তোমরা চলে এসো। তোমাদের জামা কাপড়ের যা অবস্থা—যাক গে—যাবার সময় চার্মান্ত তোমাদের কাপড়ের দোকানে নিয়ে যাবে। কাল সকালেই তৈরি পোশাক পেয়ে যাবে। আজ রাতটা আমার বাড়িতেই থাকবে। তোমাদের জন্যে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা রয়েছে। কাল সকালেই নতুন পোশাক পরে থলিপত্র এনে জাহাজে তুলবে। ঠিক আছে। ইংরেজরা ভাইকিংরা খুব খুশি হল স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে। ওরা দু'তিন জন মাথা ঝাঁকাল।

—তাহ'লে ওদের মাল বাহকের কাজে লাগালেন। হ্যারি বলল।

ইয়ুসুফ হ্যারির কথা গ্রাহ্যই করল না। একটু দ্রুত পাটাতনের দিকে হাঁটতে লাগল। আর একবারও পেছনদিকে না তাকিয়ে ঘাটে নেমে গেল।

জাহাজে ফিরে হ্যারি বলল—যাহোক ওরা এই বিদেশে কাজ পেয়ে গেল। এখানে ওদের খাওয়াপরা জুটে যাবে। ফ্রান্সিসকে একটু চিন্তিত করে বলল—হ্যারি—ব্যাপারটা বোধহয় এত সহজ সরল না। অবশ্য ফিগোন ব্যাপারটা খুবই সাধারণ—মানে জাহাজ কেনা লোককে অগ্রিম দিয়ে কাজে লাগানো এভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছে।

—কিন্তু লোকটা তো নিজের পরিচয় দিলই। সবাই তো ওর প্রস্তাবে রাজি হল। গণ্ডগোলটা কোথায়? হ্যারি বলল।

—আছে আছে। ওরা কাল সকালে মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠতে এলে তবেই এটা একটা মালিক মজুরের সম্পর্ক ব'লেই মেনে নেব। তার আগে নয়। দু'জনের মধ্যে আর কোন কথা হল না।

সেই রাতটা ফ্রান্সিস বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটাল।

পরদিন সকালে দেখল হ্যারল্ডের জাহাজ জনশূন্য। চার্মান্তরা তখনও ফিরল না।

দুপুর হল। সন্ধ্যা হল। তখনও চার্মান্তদের বা অন্যদের দেখা নেই। হ্যারি বিকেল থেকেই জাহাজের রেলিঙ ধরে ঘাটের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু ওরা কোথায়?

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তখন বিছানায় চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে আছে। হ্যারি বলল—ওরা তো এখনও ফিরল না।

—জানতাম। মৃদুস্বরে কথাটা বলে ফ্রান্সিস চোখ খুলে উঠে বসল। বলল—চলো। ওদের খোঁজ করতে হবে।

—তাহ'লে তো ফিগোনের বাড়ি যেতে হবে। হ্যারি বলল।

—তাই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা হয়তো কাল সকালে মালপত্র নিয়ে আসতে পারে। হ্যারি বলল।

—হ্যারি—মনে হয় ওরা আর ফিরবে না। ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার দিকে এগোল।

—কী ব্যাপার? এভান জানতে চাইল।

—এসে বলবো। হ্যারি কথাটা বলে ঘরের বাইরে চলে এল।

দু'জনে ডেক-এ উঠে এল। জাহাজঘাটের দু'পাশে দু'টো মশাল জ্বলছে। অন্ধকার মত জাহাজঘাটে নামল। বড় রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে বাঁদিকে দেখল একটা দোকানে বেশ ভিড়। কিছু কিছু বিদেশি জাহাজের নাবিক গ্লাসে চুমুক দিয়ে কী খাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা অবাকজাতীয় কিছু নেশার পানীয় খাচ্ছে। ওদের জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। ওরা বিদেশি। একটা বুনো মধু বিক্রির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল—ভাই—ফিগোনার বাড়িটা কোথায় জানো? দোকানদার আঙুল তুলে বেশ দূরে দেখিয়ে বলল—ঐ যে ডানদিকে লাল বাড়িটা ওটাই ফিগোনার বাড়ি। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ঐ লাল বাড়িটার সামনে এল। বড় পাথর দিয়ে গাঁথা বাড়ি। কাঠের বড় দরজাটায় ফুল লতাপাতার কাজ করা। একজন দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সশস্ত্র নয়। আঁটোসাঁটো হলদে পোশাক পরা। হ্যারি জানালায় আলোর আভাস। দরজার মাথায় একটা কাঁচে ঢাকা আলো ঝুলছে। হ্যারি দ্বাররক্ষীর কাছে গেল। বলল—ফিগোন আছেন?

—না। উনি এক বন্ধুর বাড়ি গেছেন। দ্বাররক্ষী বলল।

—ফিরতে দেরি হবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—একাই গেছেন। এখনই ফেরার কথা। বলতে বলতেই দ্বাররক্ষী রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল —ঐ তো। উনি আসছেন। দেখা গেল একজন বেশ মোটামত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। দরজার আলোয় ভদ্রলোককে দেখে ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ব'লে উঠল—

—হ্যারি—লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। ভদ্রলোক কাছাকাছি এসে বলল—আপনারা?

—আমরা ভাইকিং। জাহাজে চড়ে এসেছি। আপনিই কি ফিগোনা?

—হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটু মাথা ওঠানামা করলেন।

—আপনিই কি আজ বিকেলে জাহাজঘাটে গিয়েছিলেন? হ্যারল্ডের জাহাজে? ফ্রান্সিস বলল।

—কে হ্যারল্ড? নামই শুনিনি কখনো। ফিগোনা বললেন।

—আপনি হ্যারল্ডের জাহাজ কেনেন নি? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—না না। একটু থেমে বললেন—সত্যি কথাটাই বলি। বেশ কিছুদিন আমার ব্যবসায় খুব মন্দা চলছে। জাহাজ কেনার সাধ্য নেই। তবে ডন তিমব্রান্টের এখন খুব সুদিন আছে। একটা কেন দু'তিনটে জাহাজ কেনার ক্ষমতা ওঁর আছে। ফ্রান্সিস চম্‌কে উঠল। বলল—আচ্ছা—ডন তিম্‌ব্রান্ট কি বাঁহাতি। মানে—। ফিগোনা মৃদু হেসে বললেন—

—ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই। উনি বলেন—জন্ম থেকেই নাকি নেই। লোকে অবশ্য অন্য কথা বলে। থাকগে—লোকে তো কত কিছুই ভাবে।

—আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। হ্যারি বলল।

—না না। দ্বাররক্ষী দরজা খুলে দিল।

—আচ্ছা ডন তিমব্রান্টের বাড়িটা কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

আঙুল তুলে ডানদিকের রাস্তাটা দেখিয়ে বললেন ভদ্রলোক — ঐ রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। দশ বারোটা বাড়ির পর বাঁদিকে দুটো চেস্টনাট গাছের মাঝখানে যে বাড়িটা দেখবেন সেটাই ডন তিম্‌ব্রান্টের বাড়ি।

—অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে একটু এগিয়ে ডানদিকের রাস্তাটা ধরল। দু' পাশের বাড়িঘরের জানালায় আলোর আভাস। প্রায় অন্ধকার পথ ধরেই দু'জনে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাঁদিকে দুটো গাছ দেখল। বাঁদিকে একটা লোহার নানা কাজ করা বড় কাঠের দরজা বন্ধ। কিন্তু সামনে কোন দ্বাররক্ষী নেই। মাঝখানে বেশ বড় একটা বাড়ি। নিচে বিরাট গুদাম । বিরাট দরজার একপাট বন্ধ। অন্যপাট আধখোলা। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে সেখান দিয়ে গুদামে ঢুকল। পেছনে হ্যারি। দেখা গেল একটা কাঠের বড় চৌকোনো আসনে একজন লোক মাথা নিচু করে কী লিখছে। অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে থেকে কিছু বলছে। বোঝা গেল

কর্মচারি। মাথার ওপর একটা বড় কাঁচে থেকে আলো জ্বলছে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনের কাছে কাছে এসে দাঁড়াল। যে দাঁড়িয়ে ছিল সে দু'জনকে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠল—কী চাই? যে লিখছিল সেও মুখ তুলে তাকাল।

—বাইরে দরজায় কোন দ্বাররক্ষী নেই দেখে আপনাদের কাছে এলাম। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। কী চাই বলুন। বসে থাকা লোকটি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা ব্যবসা সূত্রে এসেছি। জাহাজঘাটে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা কোন দেশের ব্যবসায়ী লোকটা জানতে চাইল।

—পোর্তুগালের। প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রার মালপত্র কিনতে এসেছি।

—বেশ তো। কী কী চাই লিখে দিন। লোকটি বেশ খুশি হয়ে বলল।

—কিন্তু এই ব্যাপারে ডন তিমব্রান্টের সঙ্গে আগে কথা বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—অসুবিধে আছে। সন্ধ্যের পর ডন তিমব্রোন্ট কারোর সঙ্গে দেখা করেন না। লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল।

—কিন্তু আমরা তো দেরি করতে পারবো না। তাছাড়া ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরী কথা আছে। কাল দুপুরের মধ্যেই জাহাজে মালপত্র নিয়ে চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—মুস্কিল হ'ল। ঠিক আছে। কথা বলে আসছি। অপেক্ষা করুন। লোকটি পেছনের একটা ছোট দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। কিছু পরে এসে বলল—আসুন। পেছনের দরজা দিয়ে ফ্রান্সিসরা ঢুকতেই দেখল এক বলশালী কালো দ্বাররক্ষী অল্প আলোয় পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। কোমর বন্ধনীতে খোলা বড় ছোরা গোঁজা। আর কোন অস্ত্র নেই। ওদের হাত বাড়িয়ে এগোতে ইঙ্গিত করে সামনের দিকে চলল। কিছুটা যাওয়ার পর পাথুরে দেয়ালে সুদৃশ্য কাঁচে-ঢাকা আলো দেয়ালে ঝুলছে দেখল। আবার দুটো বাঁক। ফ্রান্সিস সর্বক্ষণ চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলল। এইবার ডানদিকে একটা টানাপথ পড়ল। পথের শেষে আলোয় দেখল বলশালী চেহারার এক দ্বাররক্ষী পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে ওদিক দিয়ে ঢোকার দরজা আছে। এবার

ডানদিকের ঘরের সামনে এসে দ্বাররক্ষী দাঁড়াল। একটা সেই লোহার কারুকাজকরা দরজা দেখিয়ে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস হ্যারি দরজা খুলে ঢুকল। চার্মাস্ত এই ঘরেই আগে ঢুকেছিল। দেখল সেই লোকটি বসে আছে। গায়ে পাতলা হলদে রঙের দামি কাপড়ের পোশাক। সেই মোটা চামড়ার কোমরবন্ধনী। তবে অন্যরকম। ফ্রান্সিসদের দেখেই ইয়ুসুফ একটু চমকাল সঙ্গে সঙ্গে স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু চুপ করে থেকে বলল—ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন।

কীসের ব্যবসা আপনাদের?

ফ্রান্সিস সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—কাল বিকেলে আপনি জাহাজঘাটে গিয়েছিলেন। নিজেকে ব্যবসায়ী ফিগোনা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আর—। ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে ইয়ুসুফ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল—থামুন। ওসব বাজে কথা রেখে ব্যবসার কথা বলুন।

—তাহ'লে আপনি কালকে বিকেলে—। আবার ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—স্টপ। তারপর বাঁহাতে তুড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁপাশের দরজা দিয়ে দুই দশাসই কালো প্রহরী ছুটে এল।

—এই দু'টোকে বাইরে বের করে দে। ইয়ুসুফ বলল। দ্বাররক্ষী দু'জন দ্রুত এসে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ধরতে এল। ফ্রান্সিস হাত তুলে বলল—থাক। আমরা যাচ্ছি। দু'জনে ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল দরজার দিকে।

সেই গুদামের মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসরা বাইরে এসে রাস্তায় নামল। চলল জাহাজ ঘাটের দিকে।

—কী সাংঘাতিক লোক। হ্যারি গলা নামিয়ে বলল।

—আর সন্দেহ নেই। ঐ লোকটা তিমব্রান্ট—শ্বেতকায় ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসা করে। তাই এই দোরস্তাদ বন্দরের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যবসায়ী। ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করবে?

—এই নরাধমের হাত থেকে ওদের বাঁচাতেই হবে। হ্যারি বলল—যে ভাবেই হোক।

—ছক ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না।

আসতে আসতে সেই আরকের দোকানের সামনে এল। ভিড় কমে এসে গেছে। ফ্রন্সিস বলল—-ঐ দোকানে চলো। হ্যারি তো অবাক। বলল তুমি তো এসব খাওনা।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরের কাছে এল।

—আজও খাবো না। তবে খাওয়ার ভান করবো। ফ্রান্সিস বলল।

একটু ভেবে নিয়ে হ্যারি বলল—তাহ'লে তুমি সন্দেহ করছো যে তিম্‌ব্রান্টের লোক আমাদের অনুসরণ করছে।

ঠিক তাই, তিম্‌ব্রান্টের লোককে দেখাতে হবে যে আমরা সাধারণ জাহাজীদের মত এসব খাই। বিদেশি ধনী ব্যবসায়ীদের জন্যে মালপত্র কিনতে এসে ফূর্তি টুর্তি করি। তিম্‌ব্রান্টের সন্দেহ দূর হবে। ও নিশ্চিন্ত হবে। অত্যন্ত ধূর্ত ও। ফ্রান্সিস বলল।

দোকানটায় ঢুকে দেখল প্রায় সবাই গা এলিয়ে বসে আছে। সবাই বিদেশি নাবিক। একজন আবার জড়ানো গলায় গান গাইছে। দু' গ্লাস আরক চেয়ে ফ্রান্সিস ও হ্যারি টানা কাঠের আসনে বসল। একজন হাড় জিরজিরে লোক ওদের সামনে দু'গ্লাশ আরক রেখে গেল। দু'জনে চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিস আড় চোখে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। একটু পরেই দোকানের ঝোলানো আলোয় দেখল একটা কালো মানুষ দোকানটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একনজর ভেতরে তাকিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখেই দ্রুত সরে গেল। কিছু পরে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল চলো রাস্তায় এবার মৃদুস্বরে বলল—তিম্‌ব্রান্টের কাছে খবর চলে যাবে। ও নিশ্চিন্ত হবে। আর দেরি নয়। আজ রাতেই ওদের মুক্ত করতে হবে। জোরে হাঁটো।

দু'জনেই দ্রুত হেঁটে চলল জাহাজঘাটের দিকে।

দু'জনে জাহাজে উঠতেই শাঙ্কোরা কয়েকজন এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—সব পরে বলবো। শাঙ্কো বিনোলা যত তাড়াতাড়ি পারো খেয়ে নাও। তরোয়াল নিয়ে তৈরি হয়ে এসো। ফ্রান্সিস আর কেবিনঘরে ঢুকল না। খাবার জায়গায় চলে এল। রাঁধুনী বন্ধুরা বলল—সব তো রান্না হয়নি।

—দরকার নেই। যা হয়েছে তাই খেতে দাও। হ্যারি আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো। জলদি।

কেবিনঘরে বিছানার একপাশে বসে মারিয়া ফ্রান্সিসের পোশাকের ছেঁড়া জায়গাগুলো সেলাই করতে করতে ক্রেভানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। হ্যারিকে ঢুকতে দেখে মারিয়া বলল—

—ফ্রান্সিস কোথায়?

—খাচ্ছে। হ্যারি বলল।

—এত তাড়াতাড়ি মারিয়া অবাক। হ্যারি বিছানার তলা থেকে তরোয়ালটা

বের করে বলল—রাজকুমারী—আমি এসে সব বলছি। হ্যারি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাঙ্কো আর বিনোলা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তরোয়াল কোমরে গুঁজে ডেকএ উঠে এল। ফ্রান্সিস আগেই অপেক্ষা করছিল। তিনজনে পাটাতন দিয়ে হেঁটে পাথুরেঘাটে নেমে এল।

রাস্তা দিয়ে তিনজনে চলল। লোকজনের ভিড় কমে গেছে। দু'পাশের বাড়িঘরে কোন বাড়ির জানালায় আলোর আভাস। বেশির ভাগ বাড়িই অন্ধকারে ডুবে আছে। চাঁদের আলোও অনুজ্জ্বল। ওরা নিঃশব্দে হেঁটে চলল।

ইয়ুসুফের বাড়ির সামনে এসে দেখল গুদাম ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে কোন রক্ষী নেই। ফ্রান্সিস একটু দাঁড়াল। বাঁদিকে খাবার সময়ে কিছু দূরে গলিপথের শেষে যে বন্ধ দরজা আর তার সামনে প্রহরী মোতায়েন দেখেছিল সেই দিকটা হিসবে করে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল—চলো। বাড়িটার ডানদিকের চিল্‌তে গলিটা দিয়ে ঢুকে আবছা অন্ধকারে কিছুটা এগোতেই বাঁদিকে একটা দরজা দেখল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিসফিস্ করে বলল—এই দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকতে হবে। দরজার ওপারেই প্রহরী আছে। বড় ছোরা কোমরে গোঁজা। ওকে কবজা করতে হবে। একটু থেমে বলল—নিশ্চয়ই দরজায় কোন সাঙ্ঘাতিক শব্দ করতে হয়। তিমন্ত্রাটের সব ব্যবস্থা পাকা। ফ্রান্সিস দরজাটায় আঙুল দিয়ে দুটো টোকা দিল। দরজা খুলল না। আন্দাজে আর একটা টোকা দিল। দরজার একপাট খুলে প্রহরীটি মুখ বাড়াল আর ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই শাঙ্কো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলশালী কালো প্রহরীটি সেই হঠাৎ ধাক্কায় মেঝেয় পড়ে গেল না; দ্রুত কোমরে হাত বাড়িয়ে ছোরা বের করতে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে খোলা তরোয়ালে ডগাটা ওর গলায় চেপে ধরে চাপাস্বরে বলল—চেঁচিয়েছো কি মরেছো। পেছোও। প্রহরীটি বিপদ বুঝতে পারল। এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল। তিনজনেই দ্রুত ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বিনোলা তখনই তরোয়ালের ডগাটা প্রহরীর বুকে চেপে ধরল।

—কাল যাদের আনা হয়েছিল তারা কোথায়? ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

—ভীতমুখে প্রহরীটি ভেতরদিকে ইঙ্গিত করল।

—চলো। ওদের নিশ্চয়ই বন্দী করে রাখা হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরীটি মাথা ওঠানামা করল।

—আমাদের নিয়ে চলো। জলদি। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

দরজার মাথায় একটা সুদৃশ্য কাঁচের আলোবদানে আলো ঝুলছিল। প্রহরীটি নিঃশব্দে সেই আলোয় গলিপথটা দিয়ে চলল। বুকে পিঠে তরোয়াল চেপে ধরে ফ্রান্সিস ... নিঃশব্দে চলল। গলিপথ শেষ হতেই দেখা গেল পাথর বাঁধানো চত্বর। তারপরেই ডানদিকে লোহার গরাদ দেওয়া একটা ঘর। ঘরটার লোহার দরজার মাথায় আলো জ্বলছে। একজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কালো। বেশ বলশালী। ফ্রান্সিস হাত তুলে পাথুরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ফিস্ ফিস্ করে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে সেই অবস্থা অন্ধকারে খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল। এই হঠাৎ আক্রমণে প্রহরীটি প্রায় ছিটকে লোহার গরাদের ওপর পড়ল। মাথাটা লোহার গরাদে জোর ধাক্কা খেল। গরাদে ঠন্-ন্-ন্—শব্দ হল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলে উঠল—শাঙ্কো শব্দ নয়। মাথায় প্রচণ্ড ঘা খেয়ে প্রহরীটি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস একলাফে প্রহরীটির বুকে তরোয়াল চেপে ধরে চাপাস্বরে বলল—দরজা খোল। নইলে মরবে। এরকমভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে দুই প্রহরীই তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তখনই বাঁদিকের ঘর থেকে একটা শব্দ উঠল—শব্দ কীসের? ফ্রান্সিস তরোয়ালের ডগাটা প্রহরীটির বুকে জোরে চেপে ধরে দাঁত চাপাস্বরে বলল—বলো—দরজা খুলছি। প্রহরীটি তখনও অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস জোরে তরোয়াল চাপল। বুকে কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। প্রহরীটির পোশাকের ঐ জায়গাটা রক্তে ভিজে গেল। ফ্রান্সিস আবার চাপাস্বরে বলল—বলো। প্রহরীটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল—দরজা খোলার শব্দ।

—তালা খোল। আস্তে তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিস একইভাবে বলল—খোল দরজা। প্রহরীটি অবশ্য পাথুরে মেঝেতে তরোয়াল রাখল। ককাময়ের ফেট্টি থেকে চাবি বের করে কয়েদঘরের দরজা খুলে দিল। শাঙ্কো একলাফে এগিয়ে এগিয়ে দরজার সবটা খুলে দিয়ে চাপাস্বরে বলল—পালাও। প্রথমেই ছুটে বেরিয়ে এল চার্মান্ত। ফ্রান্সিস ওকে দেখে খুব একটা অবাক হল না। তারপরেই বাকিরা দরজার দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—সবাই জাহাজঘাটের দিকে ছোটো। যত জোরে পারো। দুই প্রহরীকে ফ্রান্সিসরা তরোয়াল ঠেকিয়ে আটকে রাখল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো—বিনোলা—পালাও। ওরা তিনজনই এবার তরোয়াল সরিয়ে নিয়ে পেছন ফিরে

দরজার দিকে ছুটল। প্রহরী দু'জন এবার—পালাচ্ছে—পালাচ্ছে ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। দুজনেই ফ্রান্সিসদের ধরবার জন্য দরজার দিকে ছুটে এল। শাঙ্কো বিনোলা একলাফে দরজা পার হ'য়ে চিলতে গলিতে নামল। নেমেই আবছা অন্ধকারে চিলতে গলি ধরে রাস্তার দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস দেখল—চার্মান্ত দাঁড়িয়ে আছে। চার্মান্ত চাপাগলায় ব'লে উঠল—সাবধান—ওপাশের ঘরে একজন যোদ্ধা থাকে। তখনই একজন প্রহরী চ্যাচাতে চ্যাচাতে দরজার কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস এই সুযোগটাই চাইছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল ফেলে দু'হাতে প্রচণ্ড জোরে দরজার পাল্লাটা দিয়ে প্রহরীর মুখের ওপর বন্ধ ক'রে দিল। তখনই চিলতে গলি দিয়ে একজন যোদ্ধাকে ছুটে আসতে দেখা গেল। কিন্তু কারো হাতে অস্ত্র নেই। অস্ত্র নেবার সময় পায়নি। চার্মান্ত ততক্ষণ চিলতে গলি দিয়ে রাস্তার দিকে ছুটেছে। ফ্রান্সিসও তরোয়ালটা ফেলে রেখে চার্মান্তর পেছনে পেছনে প্রাণপণে ছুটে রাস্তায় চলে এল। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখল শাঙ্কোরা বেশ দূরে ছুটে চলেছে।

ফ্রান্সিসের পাশে পাশে ছুটতে ছুটতে চার্মান্ত হাঁপানো গলায় বলল—আর ভয় নেই। ঐ যোদ্ধারা সদর—রাস্তায়—আসবে না। ইয়ুসুফ যে একদল যোদ্ধা পোষে—এ খবরটা ও গোপন রাখে সবার কাছে।

—হুঁ। ধুরন্দর—সন্দেহ—নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিসও বলল। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ছুটে চলা শাঙ্কোকে লক্ষ্য করে বলল—ছুটো না। আস্তে। আস্তে। ও নিজেই গতি কমাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তুমি ইয়ুসুফ—বলছিলে কাকে?

ঐ তিমব্রানটকে। ও আসলে আরব দেশের লোক। ক্রীতদাস ব্যবসা—

—গোপন রাখতে—ঐ নাম নিয়েছে। চার্মান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

—এখানকার রাজা কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা নেভেল। ইয়ুসুফের সঙ্গে খুব ভাব রাজা নেভেলের।

—ইয়ুসুফ তো—ধনী ব্যবসায়ী। চার্মান্ত বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস বলল—এভাবে ছোটা চলবে না। তরাজার পাহারাদের নজরে পড়ে যেতে পারি। ও আবার চেঁচিয়ে বলল—শাঙ্কো—থামো। শাঙ্কোরা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—সবাই স্বাভাবিকভাবে হাঁটো। কারো নজরে যেন না পড়ি। সবাই এবার হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটতে লাগল।

—শাঙ্কো—তুমি একটু জোরে ছুটে যাও। জাহাজের নোঙর তুলে ফেল। নয়ত পোল তোল। দাঁড় বাইতে বলো। এই বন্দরে আর এক মুহূর্তও থাকবো না। এখানকার রাজা নেভেল আমাদের বিপদে ফেলতে পারে। যাও। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ঘাটের দিকে ছুটল।

জাহাজঘাটে পৌঁছে ফ্রান্সিস দেখল ওদের জাহাজে বন্ধুরা ততক্ষণে পাল খাটিয়ে ফেলেছে। বোধহয় দাঁড়ঘরেও দাঁড় বাইতে চলে গেছে একদল। ও বুঝল—বন্ধুরা কেউ ঘুমোয় নি। যথেষ্ট সজাগ ছিল। রেলিঙ ধরে মারিয়াও দাঁড়িয়েছিল।

ইংরেজ বন্দীরা কয়েকজন এসে ফ্রান্সিসদের দুহাত জড়িয়ে ধরল। একজন বলল—কী ব'লে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।

—ওসব পরে হবে। এখনও আমাদের বিপদ কাটেনি। তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের জাহাজে উঠে পড়ো। জাহাজ ভাসিয়ে দাও। কিছুদূরের কোন বন্দরে জাহাজ নিয়ে যাও। শিগগির দেরি করো না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কিছু স্বর্ণমুদ্রা তোমরা পেয়েছো। আমরা তো ধনী নই। কিছু সোনার চাকতি পাঠাচ্ছি। তোমরা খাদ্য জল সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যেও। তখনই চার্মান্ত এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—আমরা কী করবো?

—তোমরা ইয়ুসুফের হাত থেকে রেহাই পাবে না। ওদের জাহাজে উঠে পালাও। তারপর লুঠেরাদের দলে ঢুকবে না—স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে সেটা তোমাদের বিবেচনা। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা আর লুঠপাট করবো না। আমাদের দেশে নিয়ে চলো চার্মান্ত বলল।

—না। তোমরা অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছো। তোমাদের সেই নৃশংসতার শাস্তি পেতেই হবে। আমি তোমাদের দায়িত্ব নেব না। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস জাহাজে উঠতেই মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—

—তোমাদের কোন বিপদ হয়নি তো।

—না-না যাও—শিগগির কিছু সোনার চাকতি নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস তাগাদা দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারিয়া সোনার চাকতি নিয়ে ফিরে এল। একটা রুমালে বেঁধে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে শাঙ্কোকে হালের কাছে দেখল। কয়েকজন বন্ধুকে রাতের অভিযানের কথা বলছে। ফ্রান্সিস ভাবল—শাঙ্কো

এসো। শাঙ্কো তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। রুমালে বাঁধা সোনার চাকতিগুলো শাঙ্কোকে দিয়ে বলল—তাড়াতাড়ি যাও। ইংরেজদের সোনার চাকতিগুলো দিয়ে এসো। দেরি করবে না। এক্ষুনি জাহাজ ছাড়া হবে। শাঙ্কো ছুটে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ছাড়া হ'ল। কিছুদূর জাহাজ চলে আসতেই পূব আকাশে কমলা রঙের বন্যা বইয়ে সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস ফ্লেজারের কাছে এসে বলল—ক্রেভান যে খাঁড়িটা দেখিয়েছে সেই খাঁড়িতে যত তাড়াতাড়ি পারো জাহাজ ঢুকিয়ে দাও। মনে হয় খাঁড়িটা বড়। জলও গভীর। কারণ প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কা, রাজা ম্যাগনামের জাহাজ খাঁড়িতে নির্বিঘ্নে ঢুকতে পেরেছিল। জাহাজ চলল খাঁড়ির দিকে।

সমুদ্রতীরের ছোট ছোট টিলা বনজঙ্গল দেখা গেল। মানুষের বসতি নেই। সমুদ্রতীরের বেশ কাছে ফিরে যেতে যেতে দূর থেকে খাঁড়ির মুখ দেখা গেল। বেশ বড় খাঁড়ি। ধারেকাছে কোন জনবসতি নেই।

তখন একটু বেলা হয়েছে। হ্যারি ডেকএ ফ্লেজারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বিনোলাকে ডেকে বলল—ফ্রান্সিসকে খবর দাও। একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেকএ উঠে এল। ফ্লেজার ও হ্যারির পাশে এসে দাঁড়াল।

—হ্যারি—এইটাই সেই খাঁড়ি কিনা একমাত্র ক্রেভানই বলতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমরা ক্রেভানকে নিয়ে আসছি। হ্যারি চলে গেল। হ্যারি আর শাঙ্কো ক্রেভানকে ধরে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এল ফ্রান্সিসদের কাছে ক্রেভান এল।

—দেখুন তো—এটাই সেই খাঁড়ি কিনা? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। ক্রেভান খাঁড়ির মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—হ্যাঁ-এটাই সেই খাঁড়ি। তবে আগে মুখের দু'পাশে কিছু গাছপালা ছিল। এখন দেখছি নেই।

—ফ্রান্সিস কী করবে? হ্যারি বলল।

—এক্ষুনি জাহাজ খাঁড়িতে ঢোকাতে হবে। কিছুদূর গেলেই আড়ালে পড়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দুপুরে নেয়েটেয়ে—হ্যারি বলতে গেল।

—না না ইয়ুসুফ আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে না। নিশ্চয়ই রাজা নেভেলের সৈন্য নিয়ে জাহাজে চড়ে ইয়ুসুফ আমাদের খুঁজতে বেরোবে। তার

আগেই আমরা যতটা পারি খাঁড়ির ভেতর ঢুকে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ক্রেভানের দিকে তাকিয়ে বলল—

—সেই স্লাভিয়াগ্রাম কতদূর?

—বেশ ভেতরে। জাহাজ চলুক। দেখিয়ে দেব। ক্রেভান বলল।

ফ্লেজার জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজটা খাঁড়ির মধ্যে ঢোকাল। বেশ চওড়া খাঁড়ি। দু'দিকের তীর ভূমিই পাথুরে।

ফ্রান্সিস এবার বলল—ফ্লেজার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালাও।

বাতাস, বেশ জোরে বইছিল। পালগুলো দুলে উঠেছে। শাঙ্কোরা কয়েকজন চলে গেল দাঁড়ঘরে। দ্রুত দাঁড় টানতে লাগল। খাঁড়ির দুদিকের পাড়ই বেশ উঁচু।

বেশ বেলায় বাঁদিকে একটা ছোট পাহাড় দেখা গেল। খাঁড়ি থেকে খাঁড়া উঠে গেছে। চূড়াটা যেন ডাঙা সমান। ক্রেভান বলে উঠল—এসে গেছি। ঐ পাহাড়ের উল্টোদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—ঐ যে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। ওটা স্লাভিয়াগ্রাম। আমি যখন এসেছিলাম তখন এত ঘরবাড়ি দেখিনি। ঘাটমত আছে একটা। ঐ ঘাটেই জাহাজ ভেড়াতে হবে। গ্রামের কাছাকাছি এসে দেখা গেল বেশ জলকাদা ছাড়িয়ে পাথুরে তীর উঠে গেছে। 'এখানে জোয়ার ভাটা খেলে বলেই কাদাটে। ফ্লেজার আস্তে আস্তে ঐ ঘাটমত জায়গাটায় জাহাজ ভেড়াল। তখন দুপর হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, কত অজানা-অচেনা ঘাটে বেশ চিন্তা-ভাবনা করে বিপদের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে নেমেছি। তারপর তো কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এখানে যাহোক নিশ্চিন্তে নামা যাবে।

এখন কি নামবে? হ্যারি জানতে চাইল।

অনেক বেলা হয়েছে। খাওয়া সেরে ক্রেভানকে সঙ্গে নিয়ে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা ঘাট মতো জায়গাটায় পাটাতন ফেলল। হ্যারি আর ফ্রান্সিস নামল। তখনই মারিয়া এল।

—আমিও যাব।

—বেশ। এসো।

শাঙ্কো আর সিনাত্রা ধরে ধরে ক্রেভানকে নামাল। মারিয়াকেও নামতে সাহায্য করল। ঢাল বেয়ে সবাই উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস বলল,

অন্য কোনো বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। যে বাড়িতে আপনি রাজা ম্যাগনামের একপাটি জুতো দেখেছিলেন, পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন সেই বাড়িতে নিয়ে চলুন।

আস্তে আস্তে হোঁচট খেতে খেতে ক্রেভান ফ্রান্সিসদের একটা বাড়ির সামনে নিয়ে এল। বাড়িটা অন্য বাড়িগুলোর মতোই। তবে খাঁড়ির জলের কাছে। ওদিকে গ্রামের লোকজন কৌতূহলী হয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল। সকলেই জানতে চায় ওরা এসেছে কেন? তবে ক্রেভানকে অনেকে আগে এখানে থাকতে দেখেছে। তাদের কেউ কেউ এসে ক্রেভানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল।

বাড়িটায় ঢুকল সবাই। প্রথম ঘরটাতে দেখল একটা গাছের কাটা ডাল থেকে তৈরি বিছানায় পশুলোমের কম্বল জড়িয়ে এক বেশ বৃদ্ধ, সারা মুখে দাড়িগোঁফ, বসে আছে। তখনই ভেতরে থেকে এক বয়স্ক লোক এগিয়ে এল। ঢোলা হাতা জামা পরা। ক্রেভানকে দেখে হেসে এগিয়ে এল। দুজনে কিছু কথাবার্তা কুশল বিনিময় হল।

ক্রেভান, জুতোটা দেখাতে বলুন। ক্রেভান লোকটিকে বলল সে কথা।

এই ঘরেই আছে। লোকটি উবু হয়ে পাথরের মেঝেতে বসল। মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে একপাটি জুতো নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাতে নিল জুতোটা। দেখল, বেশ দামি চামড়ায় তৈরি জুতো। জুতোর এখানে-ওখানে ছোট ছোট গর্ত দেখে বুঝল দামি কিছু সোনা-হিরেও হতে পারে জুতোটায় গাঁথা ছিল। কাজ করাও ছিল। জুতোটার কোথাও ছেঁড়া নেই। মজবুত চামড়ার জুতো। তবে খুব পুরোনো।

—জুতোটা আপনাদের বাড়িতে কী করে এল? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেসব তো গল্পকথা। বংশানুক্রমে আমরা শুনে আসছি।

সেই বৃদ্ধকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল, উনি কিছু বলতে পারবেন?

—অনেক বয়েস হয়েছে ঠাকুর্দার। শরীরের মনে কোনো সাড়াই নেই। তবে ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, অনেক দিন আগে এই খাঁড়িতে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল। তার পরদিন সকালে নাকি একজন খুব অভিজাত সুপুরুষ আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

—সেই রাতে কি এই খাঁড়িতে জাহাজডুবি হয়েছিল?

—তেমন তো কিছু শুনিনি।

সেই সুপুরুষ কোথা থেকে এসেছিলেন?

তা তো শুনিনি।

সেই সুপুরুষ কিছু বলেননি?

তিনি কথাই বলতে পারেননি।

কেন?

তাঁর দু'হাত ভাঙা ছিল। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। সারা পোশাক, রাজারাজড়ার পোশাক যেমন হয়, রক্তে ভেজা। সারা শরীর, মুখ-হাত কাদায় মাখামাখি। পায়ে ছিল নাকি ঐ একপাটি জুতো।

হুঁ। পাও ভেঙেছিল। বোঝাই যাচ্ছে বুকে হিঁচড়ে খাঁড়ি থেকে উঠে এসেছিলেন। আচ্ছা, পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া কিছু পাতা কি আপনাদের সেই সময়কার পূর্বপুরুষ কেউ পেয়েছিলেন? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

এটা তো সেদিনের কথা। ক্রেভানকে দেখিয়ে লোকটি বলল, উনি এখানে অনেকদিন ছিলেন। ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। মনে হত উনি কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাদের কাঠকুটো রাখার ঘরে এক দড়ির ঝোলায় নাকি উনি কিছু পাতা পেয়েছিলেন। কী সব নাকি লেখা ছিল তাতে। তা আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—পড়তেই জানি না। উনিও অবশ্য এই ব্যাপারে কোনো কথা আমাদের কিছু বলেননি।

শুনুন, সেই সুপুরুষ ছিলেন নরওয়ের রাজা ম্যাগনাম। পাতাগুলোয় কিছু লিখে রেখেছিলেন তিনি। ফ্রান্সিস বলল।

তাই নাকি? লোকটি ভীষণ অবাক হল। সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, তাহলে এসব গল্পকথা নয়?

না। উনি কতদিন বেঁচে ছিলেন?

শুনেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এখানে ভালো বৈদ্য কোথায়?

তারপর?

এসবই শুনেছি। খাঁড়ির তীরে কোথায় নাকি তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব জেনে কী হবে?

সেটা আপনাকে কয়েকদিন পরে বলব। আরো কিছু জানার থাকলে আসব। আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

ক্রেভান আমাদের মত পরিচিত। কত ভালো মানুষ। তাঁকে নিয়ে আপনারা এসেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য পাবেন। লোকটি হেসে বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো ফেরা যাক। ঢাল বেয়ে নেমে পাটার ওপর দিয়ে সবাই জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, রাতে এসো। কথা আছে।

শাঙ্কো ক্রেভানকে ধরে ধরে নিয়ে এল। বিছানায় শুইয়ে দিল।

রাতের খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস নিজেদের কেবিনে এসে আধশোয়া হল। মারিয়া ক্রেভানের সারা গা ভেজা কাপড়ে মুছিয়ে দিয়ে খাইয়ে দিল। তারপর ওষুধ খাইয়ে ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। হ্যারি তখনই এল। ফ্রান্সিস ডাকল, ক্রেভান?

উঁ?

রাতে ছেঁড়া পাণ্ডুলিপিটা ঠেকে ঠেকে পড়লাম। বুঝলাম, শেষ পাতা ওটা। পাণ্ডুলিপির আরম্ভটা আর একবার বলতে পারবেন?

কতবার পড়েছি। সব মুখস্থ হয়ে গেছে। বলছি, শুনুন। ক্রেভান শুয়ে শুয়ে দু'চোখ বুজে বলতে লাগল—

'আমি, ম্যাগনাম, নরওয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা আজ হঠাৎই লিখতে শুরু করলাম এই সব। কেউ পড়বে সেজন্য নয়। এ যেন আমার মনের সঙ্গে কথা বলা। বলা যায় মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। একটা ঘটনা—জানি না শুনেছিলাম কিনা হঠাৎই মনটা ভীষণ নাড়া দিল। এইমাত্র নেমে এলাম ডেক থেকে। ওখানে—রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ধূসর কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের দিগন্ত। ওপরে ধোঁয়াটে মেঘের মধ্যে অস্পষ্ট পূর্ণ চাঁদ। চারদিকে আবছা আলো। বাতাসের শন্ শন্ শব্দ নেই। নিস্তেজ বাতাস। অসীম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে জাহাজের গায়ে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। হঠাৎ খুব অস্পষ্ট একটা কথা শুনলাম, ধিক্। ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। কে বলল কথাটা? চারদিকে তাকালাম। গভীর রাত। ডেকে কেউ নেই। ঠাণ্ডার রাত। কান পাতলাম। খুব মৃদুস্বরে, ধিক্। কথাটা কে বলল? মুহূর্তে বুকে একটা অসহ্য কষ্ট—। এ কি আমাকেই লক্ষ্য করে বলা? কষ্টটা সহ্য করতে করতে এলোমেলো পা ফেলে কেবিনে এসে শুয়ে পড়লাম। জানি না—ঘুম—।'

ক্রেভান থামল। ফ্রান্সিসরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ক্রেভান বলল, তারপরের পাতাগুলিতে বর্ণনা করেছেন লুঠ, অগ্নিসংযোগ আর নির্বিচারে নরহত্যার কাহিনি। কী অনির্বচনীয় কী অর্থবহ কী নিপুণ ভাষায় মৃত্যুকে বর্ণনা করেছেন। কী গভীর মমতায় স্মরণ করেছেন সেইসব নারী-পুরুষ-শিশুর মৃত মুখগুলি।

ক্রেভান থামল। তার পরের পাতাটায় কিছু লেখা নেই। শুধু কাটাকুটি আঁকিবুকি। তারপর লেখা—'দেশে ফিরে সব লুটের ধন প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। শূন্য করে দেব রাজকোষের সঞ্চিত সবকিছু। রাজপ্রাসাদের রাজকীয় বিলাসবাসন, আত্মসুখী উদ্দাম উজ্জ্বল জীবন—সব পেছনে ফেলে চলে যাব দীর্ঘ রাত্রি আর দীর্ঘ দিবসের দেশ আইসল্যান্ডে। শুনেছি কয়েকটা ধর্মীয় মঠ আছে ওখানে। মঠবাসীর কঠিন তপস্যাই হবে আমার শেষ জীবন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। 'ধিক্' কথাটা যেন আমাকে আর শুনতে না হয়।'

ক্রেভান থামল। ফ্রান্সিসরা কেউ একটি কথাও বলতে পারল না। ক্রেভান একটু চুপ করে থেকে বলল, তারপরের শেষাংশ তো তোমাদের হাতেই আছে। ফ্রান্সিস মুখ নিচু করে শুনছিল। এবার মৃদুস্বরে ডাকল, হ্যারি।

হ্যাঁ। রাজা ম্যাগনামের মনে গভীর বৈরাগ্য এসেছিল—আশ্চর্য পরিবর্তন। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল। রাজা ম্যাগনামের জাহাজ ঝড়ের ধাক্কায় এতদূর এসেছিল। তারপর ডুবে গিয়েছিল। এখানেই। কিন্তু কোথায়? মোটামুটি বিস্তৃত খাঁড়ির জলরাশি। এদিকে স্লাভিয়া গ্রামের সেই লোকটির বাড়ি। মারাত্মক আহত রাজা ঐ বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওপাশে দেখা যাচ্ছে একটাই মাত্র পাহাড়। তেমন উঁচু নয়। পাহাড়ের গায়ে সবুজ ছাড়া ছাড়া গাছ-গাছালি। একটা ব্যাপার একটু অদ্ভুত লাগল। পাহাড়ের মাথাটা ভাঙা। ওপরে গাছ-গাছালি নেই। ঘাসও নেই। কেমন ধূসর রঙ। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের যেটুকু ছাড়া ছাড়া গা দেখা যাচ্ছে তারও রঙ ধূসর। ফ্রান্সিস চুপ করে গভীর ভাবে সব কিছু ভাবতে লাগল।

হ্যারি এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, জাহাজ কীভাবে ডুবেছিল?

প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে ডুবে-যাওয়া জাহাজটা তো এখানেই কোথাও জলের নীচে—

হ্যাঁ কিন্তু কোথায়? এতটা বিস্তৃত খাঁড়ির জল। এখানে জোর জোয়ার-ভাটা খেলে। ভাঙা ডোবা জাহাজটা যে কোনোদিকে সরে যেতে পারে।

আবার বালি-কাদার স্তরে গেঁথেও যেতে পারে।

হ্যাঁ, তা পারে।

তাহলে কোথায় খুঁজবে?

সেটাই তো আসল রহস্য। কোথায়? একটা জায়গা তো নির্দিষ্ট করতে হবে। কিন্তু সেটা কীভাবে করব? একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, জাহাজটা ডুবে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত রাজা ঐ কাগজে লিখছিলেন। আচ্ছা হ্যারি, ঐ ছেঁড়া পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে এসো তো। ঐটা কোনোরকমে বাঁচিয়েছিলেন তিনি।

আমার কোমরেই গোঁজা আছে। সময় পেলেই পড়ি।

বের করো। শেষের দিককার লেখাগুলো পড়ো তো।

হ্যারি কোমরে-গোঁজা পাণ্ডুলিপিটা বের করল। সামনে মেলে ধরে পড়তে লাগল—মুষলধারে বৃষ্টি...দু'পাশে টাল খেতে খেতে.... আর লিখতে পারছি না... প্রচণ্ড ধাক্কা... কে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, 'সামনে সাদাটে—ব্যস্, এখানেই শেষ। শেষ শব্দ ঐ সাদাটে।

ঐ সাদাটে কী?

বৃষ্টির সময় চোখের সামনে সাদাটে আস্তরণ মতো মনে হয়। এটা তো সাধারণ অভিজ্ঞতা। হ্যারি বলল।

না হ্যারি। ভুলে যেও না তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বারবার। সেই আলোয় বৃষ্টির আস্তরণ ছাড়িয়েও কিছু দূরের জিনিস দেখা যায়। তাই প্রশ্ন, সাদাটে কী? আচ্ছা, সাদাটে শব্দটা আর কোথাও আছে?

দেখছি। হ্যারি কাগজটা উঁচু করল। দেখছে, তখনই ফ্রান্সিস কাগজটার দিকে তাকাল। আলো পড়েছে কাগজটায়। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট দেখল, কাগজটায় আবছা তিনকোনা বড় দাগমতো। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলে উঠল, দাঁড়াও। কাগজটা ধরে থাকো। ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে গেল। এবার আবছা তিনকোনা দাগটা দেখতে পেল।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে তাকাল ঐ পাহাড়টার দিকে। অস্পষ্ট ছাপটা ঠিক ঐ পাহাড়ের মতো। পাহাড়ের মাথাটা ভাঙা। বেশ সমান। ঠিক ছাপটার মতো। ফ্রান্সিস বলে উঠল, হ্যারি, ঐ পাহাড়টার দিকে তাকাও। পাহাড়টা দেখো। হ্যারি কিছু বুঝল না। পাহাড়টা দেখতে লাগল।

এবার ঐ মাথাভাঙা পাহাড়ের সঙ্গে কাগজের এই অস্পষ্ট ছাপটা মেলাও। দেখো একরকম কিনা। কাগজটা উল্টে নাও, ভালো করে মেলে ধরে দেখো।

হ্যারি কাগজটা ঘুরিয়ে উঁচু করে মনোযোগ দিয়ে দেখল। সত্যিই খুব অস্পষ্ট তিনকোনা দাগ। বেশ মোটা দাগ।

দেখো, পাহাড়টা দেখতে এরকম কিনা। মাথাটা ভাঙা, সমতল। হ্যারি

মিলিয়ে দেখে বলে উঠল, তাই তো।

এসব কাগজের মতো পাতলা চামড়ায় তো কোনো দাগ থাকে না। কীসের দাগ এটা?

রক্তের দাগ। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

বলো কী! হ্যারি চমকে উঠল।

আবার কল্পনার রাশ আলগা করছি। রাজা ম্যাগনাম মৃত্যুর পূর্বে রক্তঝরা হাতের আঙুল দিয়ে শেষ দেখা এই পাহাড়টা এঁকেছিলেন। অবশ্য এটাকে আঁকা বলা চলে না। চিহ্ন বলা যায়।

কিন্তু এই পাহাড়টা তো সবুজ। সাদাটে কথাটা লিখেছিলেন কেন?

ভালো করে পাহাড়টার দিকে তাকাও। দেখো মাথায় গাছ-গাছালি নেই, পাথরের রঙ ধূসর। তাছাড়া গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গা। ধূসর, প্রায় সাদাটে। জাহাজ ডুবেছিল অনেকদিন আগে, তখন এই পাহাড়ে গাছপালা বলে কিছু ছিল না। আসলে পাহাড়টা চুনা পাথরের সাদা পাহাড় ছিল। পরে দীর্ঘ দিন ধরে অল্প অল্প মাটি জমে জমে আজকের গাছ-গাছালির জন্ম। লক্ষ করো ঘাস নেই। সব্জে ভাবটাই নেই।

তাহলে কি—

হ্যাঁ, ঐ পাহাড়ের নীচে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে রাজার জাহাজ ভেঙে ডুবে গিয়েছিল। ঐ পাহাড়ের নীচেই জলের মধ্যে দেখতে হবে। খুঁজতে হবে।

এখনই যাবে?

হ্যাঁ, এখুনি। শাঙ্কোকে ডাকো। আর আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো। হ্যারি শাঙ্কোদের ডাকল। ফ্রান্সিসের তরোয়াল আনতে কেবিনে নেমে এল। বিছানার পাশ থেকে ও তরোয়াল নিল। মারিয়া বলে উঠল, কী ব্যাপার হ্যারি?

ফ্রান্সিসরা ঐ পাহাড়ের নীচে যাবে।

আমিও যাব। মারিয়া উঠে দাঁড়াল।

আসুন। দেখুন, ফ্রান্সিস নিয়ে যেতে রাজি হয় কিনা। ক্রেভান তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝল না।

দড়ির মই বেয়ে ফ্রান্সিসরা নৌকোয় নেমে এল। শাঙ্কো নৌকো বাইতে লাগল। খাঁড়ির জলে খুব ঢেউ নেই। উজ্জ্বল রোদ চারদিকে। একসময় নৌকো তিনকোনা পাহাড়টার নীচে এসে থামল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে নৌকো একপাশে থামানো হল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে গুঁজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ডুব দিল।

ওপরের সূর্যালোকে নীলচে জলের নীচে বেশ কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সেই মুক্তোর সমুদ্রে মুক্তো তোলার জন্যে ফ্রান্সিস ওর দেশের ডুবুরিদের কাছে জলে বেশিক্ষণ ডুবে থাকার কায়দা শিখেছিল। সেই শিক্ষাটা এবারে কাজে লাগল।

ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'হাতে জল ঠেলে ঠেলে একেবারে নীচে নেমে এল। পাথরের ছোট ছোট চাঁই ছড়ানো। সামুদ্রিক শ্যাওলাগাছ, ঝোপটোপ নেই। পাথরের এদিক-ওদিক কখনও আড়ালে নানা রঙিন মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস পাথরে পা ফেলে ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকার দিকে চলল। এখানে নিস্তেজ আলো। বেশ আবছা দেখাচ্ছে সবকিছু। দম ফুরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস ডোবা পাথরে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে দ্রুত ওপরে উঠে এল। জল থেকে ভুস্ করে মুখ তুলে হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। দেখল বাঁ দিকে কিছুদূরে নৌকো ভাসছে। ফ্রান্সিসকে জল থেকে মাথা তুলতে দেখে শাঙ্কো দ্রুত নৌকো চালিয়ে ওর কাছে এল। গলা চড়িয়ে বলল, কিছু হদিস পেলে?

ফ্রান্সিস মাথা এপাশ-ওপাশ নাড়ল।

মারিয়া বলে উঠল, হাঙর-টাঙর নেই তো?

চোখে পড়েনি। ফ্রান্সিস হাঁপানো স্বরে বলল। একটুক্ষণ দম নিয়ে ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। দ্রুত জল কেটে নীচে নেমে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবছা আলোর মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে দশ-পনেরো পা যেতেই দেখল একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের গায়ে জাহাজের ভাঙা কাঠামো। চারদিকে ছড়ানো ভাঙা মাস্তুল, কাঠ, ছেঁড়া পাল, দড়িদড়া। কিন্তু দম ফুরিয়ে এসেছে। আবার জল ঠেলে দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে লাগল। জলের ওপর হুস করে মাথা তুলল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। বেশ কিছুটা দূরে নৌকোটা ভাসছে।

শাঙ্কো দ্রুত নৌকো চালিয়ে এল। গলা চড়িয়ে বলল, চোখে পড়ল কিছু? ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলল। শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে নৌকোয় উঠে এল। মারিয়া সাগ্রহে বলে উঠল, জাহাজটা দেখেছ?

হ্যাঁ। তবে ভেঙে চৌচির। আজকে আর নয়। কাল সকালে আসতে হবে। হাতে সারাটা দিন পাওয়া যাবে। ভালো আলো পাওয়া যাবে।

পরের দিন সকালেই নৌকোয় চড়ে এল ওরা। ফ্রান্সিস জলে ডুব দিল, ভাঙা জাহাজের ছড়ানো কাঠ, বড় বড় পেরেক, এটা-ওটা পড়ে আছে। ফ্রান্সিস

সেই আবছা আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক তাকাতে তাকাতে দেখল সাদাটে মাটির আস্তরণের মধ্যে একটা বসে যাওয়া লম্বাটে সিন্দুক। দম ফুরিয়ে আসছে। দু'হাতে দ্রুত জল সরিয়ে ফ্রান্সিস ভুস করে জলের ওপর মাথা তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে গলা চড়িয়ে বলল, রাজা ম্যাগনামের ধনসম্পদ—শুধু তুলে আনার অপেক্ষা। হ্যারির কাছে শাঙ্কো মারিয়া ফ্রান্সিসের উদ্দেশ্যের কথা শুনেছিল।

মারিয়া বলল, তাহলে তোমার অনুমানই সত্য হল।

হ্যাঁ। ও নৌকোয় উঠে বলল, চলো, জাহাজটা এখানে আনতে হবে। নৌকো দিয়ে হবে না।

বেলা হয়েছে। খেয়েটেয়ে এসো।

হুঁ। শাঙ্কো জাহাজ লক্ষ করে নৌকো বাইতে লাগল।

ওরা জাহাজে ফিরে এল। ভাইকিং বন্ধুরা এগিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাড়াল। শাঙ্কো বলল, রাজা ম্যাগনামের ডুবেথাকা ধনসম্পদের হদিস মিলেছে।

ফ্রান্সিস সব বলে বলল, চলো, খাওয়া সেরে যাব।

না। আমরা সবাই এখনই যাব। বিনোলা বলে উঠলো। দু'চারজন বন্ধুও তখন বলে উঠলো—চলো, এখনই যাই। এসে খাওয়া-দাওয়া হবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, খাটাখাটুনির ব্যাপার আছে। উপোসী থেকে সে সব করা কঠিন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও সবাই।

এবার ফ্লেজার জাহাজ চালিয়ে সেই জায়গায় নিলে এল। ফ্রান্সিস বলল, দড়িসুদ্ধু নোঙরটা নিয়ে এসো আর শাঙ্কো—তুমি দেখো তো যেমন-তেমন একটা নোঙর পাও কিনা। শাঙ্কো চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁজে পেতে মরচে ধরা প্রায় বাতিল একটা নোঙর নিয়ে এল। ফ্রান্সিস একটা শক্ত লম্বা দড়ি নিল। ও আরও দুটো লম্বা দড়ি আনাল।

ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই সব—মন দিয়ে শোনো। আমি আর শাঙ্কো কয়েক দফা জলের নীচে ডুবে গিয়ে সিন্দুকটা দড়ি দিয়ে বাঁধব। তারপর দুটো নোঙর সিন্দুকটার দু'পাশে বাঁধা দড়িতে আটকে দেব। তোমরা ডেক থেকে ওটা টেনে তুলবে। খুব আস্তে আস্তে তুলবে। রেলিঙের ওপর দিয়ে আনবে সাবধানে। দেখো, কাঠের রেলিং না ভেঙে যায়। এবার তৈরি থাকো সবাই। আমরা জলে নামছি।

ফ্রান্সিস লম্বা দড়ির একটা কোমরে জড়িয়ে নিল। তরোয়াল খুলে হ্যারির

হাতে দিল। তারপর জলে ঝাঁপ দিল। দ্রুত জল কেটে নীচে নেমে এল। কোমর থেকে দড়ি খুলে দ্রুত সিন্দুকটা পাশাপাশি বাঁধতে তৈরি হল। ওরা শক্ত গিঁট বাঁধার নানা কৌশলে অভিজ্ঞ। কিন্তু কতদিন আগে থেকে সিন্দুকটা জলের তলায় পড়ে আছে। সাদাটে মাটিতে বেশ এঁটে বসে গেছে। সিন্দুকটা দু'হাতে ধরে তুলতে দেরি হল।

দম ফুরিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস দড়ি রেখে জলের ওপরে তাড়াতাড়ি উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শাঙ্কো ডুব দাও। সিন্দুকটার একপাশে বাঁধা। শাঙ্কো তৈরি হয়েই ছিল। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাঙ্কোও জল কেটে দ্রুত নীচে নেমে এল। আবছা আলোয় দেখল ফ্রান্সিস একটা পাশ তুলে রেখেছে। ও দ্রুত দড়িটা সেই পাশে বেঁধে গিঁট দিয়ে জলের ওপরে উঠে এল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল।

এবারে ফ্রান্সিস ডুব দিল। সিন্দুকের অন্য পাশটা দু'হাতে জোরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে কাদার ওপর তুলে জলের ওপরে উঠে এল। এবার শাঙ্কো ডুব দিল। দড়ি বাঁধল। শক্ত গিঁট দিল। জলের ওপরে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে রেলিঙের কাছে জড়ো হওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, মরচে পড়া নোঙরটা দড়ির মাথায় বাঁধো। দুটোই আমাকে দাও। বন্ধুরা অল্প সময়ের মধ্যেই বেঁধে দড়ি ধরে নামিয়ে দিল। ফ্রান্সিস দড়ি বাঁধা নোঙর দুটো কাঁধে রেখে এক হাতে জল ঠেলে ঠেলে নীচে নামল। দ্রুত নামতে পারল না। সিন্দুকটার দু'পাশে আড়াআড়ি বাঁধা দড়ির মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি নোঙরের মাথা দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে জলের ওপর হুস করে ভেসে উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সাবধানে আস্তে আস্তে টেনে তোল। চুনামাটির কাদায় সিন্দুকের কাঠ ক্ষয়ে গেছে। ঝাঁকুনি লাগলেই ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে।

এবার বন্ধুরা দড়ি দুটো ধরে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। জলের মধ্যে বস্তুর ওজন কমে যায়। কাজেই জলের ওপরে ওঠা পর্যন্ত সিন্দুকের সঠিক ওজনটা বোঝা যাচ্ছিল না। জলের ওপরে সিন্দুকটা উঠে এল। এবার টেনে তুলতে গিয়ে ওরা বুঝল ওজনটা ভালোই। সিন্দুকটা ওঠাতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে। রেলিঙের গায়ে পর্যন্ত সিন্দুকটা উঠে এল। এবার রেলিংটা পার করতে গিয়েই হল বিপত্তি। দড়াম করে রেলিঙের বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে গেল। সিন্দুকটা প্রায় ছিটকে ডেকের ধারে পড়েই তলার কাঠটা ভেঙে ছিটকে গেল। সোনার কত চাকতি, মণিমুক্তো, দামি গয়না-টয়না ডেকের ওপর ছড়িয়ে গেল। কিছু কিছু সমুদ্রের জলেও পড়ে গেল। পচা কাঠের টুকরোও এদিক-

ওদিক ছিটকে গেল।

ভাইকিংরা থমকে দাঁড়াল। দেখতে লাগল ডেকে ছড়িয়ে-থাকা সোনা-রুপোর ধনসম্পদ। তারপরই ধ্বনি তুলল, ও হো হো। হ্যারি ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। নীচে নেমে একটা ছেঁড়া পালের বড় টুকরো নিয়ে এল। সেটা ডেকে পেতে ছড়িয়ে-থাকা সোনার চাকতি, রুপো, মণি-মুক্তো কাপড়ের ওপর রাখতে লাগল। দেখাদেখি বন্ধুরাও কয়েকজন এগিয়ে এল ওকে সাহায্য করতে। সব রাখা হলে হ্যারি আর শাঙ্কো একটা গাঁঠরি মতো বাঁধল।

হ্যারি বলল, বিনোলা, এটা ফ্রান্সিসের কেবিনে রেখে দাও। বিনোলা গাঁঠরিটা কাঁধে নিয়ে চলে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস ভেজা পোশাকেই ডেকের ওপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি এসে ওর পাশে বসল।

মারিয়া এসে বলল, ভেজা পোশাক ছাড়বে এসো।

ও আমার অভ্যেস আছে। খুব খাটাখাটুনি গেছে। একটু জিরিয়ে নিই। ফ্রান্সিস তখনও হাঁপাচ্ছিল।

হ্যারি বলল, সাবাস ফ্রান্সিস! তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। কিছু বলল না।

রাজা ম্যাগনামের ধনসম্পদ কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

হ্যারল্ডের সিন্দুকে ভরে রাখব।

সব দেশে নিয়ে যাবে তো? পাশে বসা মারিয়া বলল।

না। নরওয়ে যাব আমরা। নরওয়ের বর্তমান রাজাকে সব দিয়ে দেব। রাজা ম্যাগনামের শেষ সিদ্ধান্তটা জানাব। অনুরোধ করব সেই অনুযায়ী ধনসম্পদ কাজে লাগাতে। হ্যারি, কী বলো?

তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। হ্যারি বলল।

মারিয়া বলল, এবার চলো। ফ্রান্সিস উঠে বসল। আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে হেঁটে চলল।

আবু হামিদের রোজনামচা

বিকেল হয়ে এসেছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি নেমে এসেছে। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখবে বলে ডেক-এ উঠে এসেছে। ক্লান্ত ফ্রান্সিস তার কেবিনে আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। হ্যারি ওর কাছে এল। বলল, তাহলে আজ রাতটা এখানেই থাকি। কালকে না হয় জাহাজ ছাড়া যাবে।

না। এখানে আরও দু'একদিন থাকব। ফ্রান্সিস বলল।

কেন বলো তো? হ্যারি জানতে চাইল।

ভুলে যেও না ইয়ুসুফ সাংঘাতিক ধুরন্ধর। রাজা নেভেলের সঙ্গে তার খুব ভাব। হাজার হোক—ইয়ুসুফ যথেষ্ট ধনী। ও ঠিক রাজা নেভেলকে বলে তার সৈন্য নিয়ে জাহাজে চড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের খোঁজে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে। এই খাঁড়ি থেকে বেরোলেই আমরা ধরা পড়ে যাব। কাজেই এখন এই খাঁড়িতে জাহাজ রেখে দু'একদিন অপেক্ষা করতে হবে। বাইরের সমুদ্রে আমাদের জাহাজের হদিস না পেলে ওরা হতাশ হয়ে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু ইয়ুসুফ তো আমাদের খোঁজে জাহাজ নিয়ে এই খাঁড়িতেও ঢুকতে পারে। হ্যারি বলল।

সেই জন্যেই দিনের বেলা আমরা জাহাজে থাকব। কিন্তু রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই স্লাভিয়া গ্রামে আশ্রয় নেব। সারারাত সজাগ থাকব। জাহাজের ডেক-এ লড়াই করার চেয়ে গ্রামে থেকে লড়াই করা সহজ হবে। কারণ ওখানে আমরা বাড়িঘর গাছগাছালির আড়াল পাব। লড়াই করার অনেক সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি একটু ভেবে নিয়ে বলল, বরাবরই দেখেছি—তুমি আগে থেকে অনেক কিছু ভেবে নাও।

সেটাই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। অবশ্য তুমিও কম বুদ্ধিমান নও। কিন্তু ইদানিং দেশে ফিরে যাওয়ার আনন্দে তুমি বড় দ্রুত জাহাজ চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

হ্যারিও হাসল। বললে, তুমি ঠিকই বলেছ।

হ্যারি, সভ্য তারাই যারা আগে থেকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তৈরি থাকে। অসভ্য জাতিরা কিন্তু সেটা পারে না। বর্তমানের কথাই ভাবে শুধু। ফ্রান্সিস বলল।

বৃদ্ধ ক্রেভান চুপ করে এতক্ষণ দু'জনের কথার্বাতা শুনছিল। এবার বলল, ফ্রান্সিস, সত্যি তুমি বুদ্ধিমান আবার সাহসীও। অবশ্য বলা উচিত দুঃসাহসী।

হ্যারি হেসে বলল, আপনি আর ক'দিন ফ্রান্সিসকে দেখছেন। ওর কত দুঃসাহসিক বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী আমরা।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে চোখ বন্ধ করে বলল, ক্রেভান—ঐ গাঁঠরিটা তো দেখেছেন। ওটাই রাজা ম্যাগনামের গুপ্ত সম্পদ।

কিন্তু এসব কীভাবে উদ্ধার করলে তা তো বললে না। ক্রেভান বলল।

হ্যারিকে পাঠাচ্ছি শাঙ্কোকে ডেকে দিতে। শাঙ্কো এসব ঘটনা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বলতে পারে। বন্ধুদের মুখে শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া তখনই ঢুকল। বলল, এত কিছু ঘটল ফ্রান্সিস, তুমি তো কিছুই বললে না।

অপেক্ষা করো। শাঙ্কো আসবে। সব বলবে। এখন আমার বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে চলি। হ্যারি বেরিয়ে গেল। মারিয়া বিছানায় বসতে বসতে বলল, আমি জাহাজে থাকব না।

তাহলে কোথায় থাকবে? ফ্রান্সিস একটু অবাক চোখে মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

দেখো, শুধু তোমাদের সঙ্গে থেকে থেকে আমি যে মেয়ে সেটাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

ফ্রান্সিস জোরে হেসে উঠল। বলল, বেশ বলেছ।

আমি এই শ্লাভিয়া গ্রামের কারো বাড়ির অন্দরে মেয়েদের মধ্যে থাকব। একটু হাঁপ ছাড়তে পারব। মারিয়া বলল।

খুব ভালো কথা। তবে এখানকার মেয়েরা আমাদের ভাষায় পরিষ্কার কথা বলতে পারে কিনা জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

যেটুকু বলতে পারবে তাই শুনে সব বুঝে নিতে পারব। মারিয়া বলল।

তা পারবে। কিন্তু গরিব চাষি বৌ-মেদের কথা কি তোমার—মানে রাজবাড়ির অন্তঃপুরেই তো তোমার দিন কাটত, ওদের কথাবার্তা কি তোমার ভালো লাগবে? ফ্রান্সিস বলল।

কেন লাগবে না? ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ের কথা সব মেয়েদেরই ভালো লাগে, সে রাজকুমারীই হোক আর গরিব ঘরের মেয়েই হোক। মারিয়া বলল।

মারিয়া, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমরা কিন্তু এখনও নিরাপদ নই। যে কোনো সময় আমরা আক্রান্ত হতে পারি। তাই রাতে আমাদের এই শ্লাভিয়া গ্রামেই থাকতে হবে। গরিব চাষি এরা। পাথুরে জমিতে চাষের মাটি বেশি পাওয়া যায় না। অন্য সময় নিশ্চয়ই এই খাঁড়িতে ওরা মাছ ধরে। ওদের বাড়ি-ঘরে থাকার মতো বাড়তি জায়গাও বেশি নেই। কাজেই তুমি জাহাজেই খাওয়া সেরে সারাদিন ওদের বাড়িতে থাক। রাতে তোমাকে জাহাজে এসে থাকতে হবে। ভেন থাকবে আর অসুস্থ ক্রেভান থাকবে। ওকেও তো দেখাশোনার জন্যে লোক চাই। বলো, এই ব্যবস্থা তোমার পছন্দ কি না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। তাই হবে।

দু'জনে যখন কথা বলছে তখনই শাঙ্কো এল।

শাঙ্কো, সমস্ত ঘটনাটা বলো তো এদের। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু ফ্রান্সিস, সব ঘটনা তো আমি দেখিনি। শাঙ্কো বলল।

সেসব আমি বলব এখন। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো উৎসাহের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে সে যতটুকু ঘটনা জানে সব বলতে শুরু করল। চুপ করে মারিয়া আর ক্রেভান শুনল। বাকিটুকু ফ্রান্সিস খুব সংক্ষেপে বলল। ক্রেভান বলে উঠল, সত্যি ফ্রান্সিস, ভাইকিং জাতির গৌরবগাথায় তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুল।

সন্ধে হল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে শাঙ্কো নোঙর তুলল। ফ্রেজার জাহাজটা চালিয়ে স্লাভিয়া গ্রামের ঘাটে এনে ভেড়াল। নোঙর ফেলা হল। হ্যারিকে ডেকে ফ্রান্সিস বলল, জাহাজে শুধু মারিয়া, ভেন আর ক্রেভান থাকবে। বাকি সবাইকে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে তীরে নামতে হবে। সবাইকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলো।

হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। সবাইকে ডেকে ফ্রান্সিসের নির্দেশ জানাল।

রাঁধুনি বন্ধুরা তাড়াতাড়ি রান্না সারল। সবাই খেয়ে নিল। তরোয়াল নিয়ে ফ্রান্সিস ও হ্যারি সবার আগে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ততক্ষণে পাটাতন পাতা হয়ে গেছে। দু'জনে পাটাতন দিয়ে হেঁটে তীরে নামল। একটু খাড়াই তীর দিয়ে উঠে গ্রামের বাড়িগুলোর কাছে এল। যে বয়স্ক লোকটির বাড়িতে ওরা রাজা ম্যাগনামের পুরনো এক পাটি জুতো পেয়েছিল সেই বাড়িটার সামনে এল দু'জনে। গাছের কাটা ডালের টুকরো দিয়ে তৈরি দরজাটা বন্ধ। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে দরজায় হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে বোধহয় বয়স্ক লোকটিই বলে উঠল, কে?

দরজাটা খুলুন। কথা আছে। হ্যারি বলল।

ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেল। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় ফ্রান্সিসদের চিনতে পেরে হাসল লোকটি। বলল, আপনারা জাহাজ নিয়ে ঐ পাহাড়ের কাছে গেলেন, ফিরে এলেন, কী ব্যাপার?

সব পরে বলব। আপনার নামটা যদি বলেন। ফ্রান্সিস বলল।

আমার নাম লায়েন্ড। অর্থ—পরিচ্ছন্ন। লায়েন্ড হেসে বলল।

দেখুন লায়েন্ড কোনো কারণে কয়েকটা রাত আমরা আপনাদের এই গ্রামের সকলের বাড়িতে থাকব।

কারণটা পরে বলব। তবে ঘরে বেশিক্ষণ একসঙ্গে সবাই থাকব না। রাতে দফায় দফায় কয়েকজন করে থাকব। বেশির ভাগই বাইরে থাকবে। জানি আপনাদের

ঘর বেশি নেই। থাকার জায়গারও খুব অভাব। তবে কথা দিচ্ছি—কোনো ভাবেই আপনাদের অসুবিধে ঘটাব না। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন। ভেতরের ঘরে কেউ থাকবে না। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু আপনারা কষ্ট করে এই বাড়িগুলোয় থাকবেন কেন? আপনাদের জাহাজ তো ঘাটেই নোঙর করা আছে! লায়েন্ত বলল।

কারণ আছে বললাম তো—সেসব পরে বলব। এখন আপনি আমার এই বন্ধু হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে আপনার প্রতিবেশীদের আমাদের অনুরোধ জানান। ফ্রান্সিস বলল।

আপনারা ভালো মানুষ সন্দেহ নেই। তার ওপর ক্রেভান, যাঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তিনি আপনাদের সঙ্গে এসেছেন। কেউ আপত্তি করবে না। লায়েন্ড বলল।

সে তো ভালো কথা। তাহলে হ্যারিকে নিয়ে আপনি বলে আসুন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে লায়েন্ড চলে গেল। ততক্ষণে অন্য বন্ধুরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সবার কোমরেই তরোয়াল ঝুলছে। সিনাত্রা শাঙ্কোর তীর ধনুকও নিয়ে এসেছে।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব, এই গ্রামের মানুষরা সৎ আর অতিথিবৎসল। কিন্তু এরা গরিব। বাড়িঘর খুবই ছোট। তোমাদের পালা করে এদের ঘরে রাতে থাকতে হবে। সাবধান, তোমরা বেশি কথাবার্তা বলবে না। এদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে না। ঘুমিয়ে পড়লেও সবাই সতর্ক থাকবে। এখানকার কোনো একটা উঁচু গাছের মাথায় নজরদার পেড্রো সারারাত পাহারায় থাকবে। ওর হাঁক শোনা মাত্র সবাই এই বাড়ির সামনে এসে জড়ো হবে। কারণ এক মহা ধুরন্ধর লোক—ইয়ুসুফ জাহাজভর্তি সৈন্য নিয়ে এই খাঁড়ি দিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। এই আক্রমণ রাতের অন্ধকারেই হতে পারে বলে আমার মনে হয়। কাজেই সবাইকে সারারাত সর্তক থাকতে হবে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল, হ্যারি ফিরে এলে বাড়িগুলোয় আশ্রয় নিতে যাবে। হ্যারি এসে তোমাদের চারটে দলে ভাগ করবে। দু'দল শুতে যাবে। দু'দল পাহারা দেবে মাঝরাত পর্যন্ত। তারপর অন্য দুই দল যাবে পাহারা দিতে।

বন্ধুরা বুঝল লড়াই হতে পারে। ওরা ভীত হল না। বরং খুশিই হল। জাহাজে নিরুপদ্রবে হেসে-খেলে সময় কাটাতে ওরা বাধ্য হয়। লড়াইয়ের উন্মাদনা ওরা পছন্দ করে। যেন বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পায়। লড়াই করা এবং লড়াইয়ে জেতার আনন্দই আলাদা এদের কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লায়েন্ডকে নিয়ে হ্যারি ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল, সবার সঙ্গেই কথা হয়েছে। সবাই সাগ্রহে রাজি হয়েছে। তবে সবাই এর কারণ জানতে চাইছিল।

স্বাভাবিক। জাহাজ থাকতে আমরা গ্রামের বাড়িগুলোয় রাতে আশ্রয় নিচ্ছি কেন এর কারণ তো জানতে চাইবেই। যাক গে, এবার দুটো করে দল করো। কীভাবে পাহারার কাজ চলবে বন্ধুদের বলেছি। কাজে লাগো সবাই। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি দল গড়তে তৎপর হল। এর মধ্যে পেড্রো খুঁজে খুঁজে একটা বেশ উঁচু চেস্টনাট গাছ পেল। গ্রামের ভেতরেই। ও গাছে চড়তে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাছটার মগডালে উঠে গেল। গাছটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দু'টো মোটা ডালের গোড়ায় বসার জায়গা বানাল। তারপর বসে পড়ল। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় খাঁড়ির যতদূরে দৃষ্টি যায় ততদূরে তাকিয়ে রইল। চারদিক নিস্তব্ধ। দু'একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল। হাওয়ায় গাছের পাতায় সরসর শব্দ হতে লাগল। রাত বাড়তে লাগল।

হ্যারি বন্ধুদের দুটি ভাগ করে বিভিন্ন বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। বাকি দু'দল তখন গ্রামের আশেপাশে তীরভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দিতে শুরু করল। সবারই চোখ মূল সমুদ্রের দিকে। ওখান দিয়েই কোনো জাহাজ খাঁড়ির দিকে আসছে কিনা। অবশ্য গাছের ওপর থেকে পেড্রো নজর রাখছে। তবু আবছা জ্যোৎস্নার আলোয় ওরা তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লায়েন্ড-এর বাইরের অন্ধকার ঘরে ঢুকল। ছোট ঘর। অন্ধকারে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। লায়েন্ড অন্ধকারের মধ্যে থেকে বলল, দাঁড়ান। আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

ফ্রান্সিস আপত্তি করল, আপনার ঠাকুর্দার ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে।

না, না, ঠাকুর্দা সব সময় শুয়েই থাকে। কখন ঘুমোয় কখন জাগে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি। অন্ধকারে আপনাদের নড়াচড়া করতে অসুবিধে হবে। লায়েন্ড বলল।

খুব বেশি আলো হবে না তো?

হ্যারি জিগ্যেস করল।

না না। সামুদ্রিক এক ধরনের মাছের তেল। মৃদু আলো হয়। ওতেই রাতের কাজ চালাই আমরা। লায়েন্ড বলল। তারপর চকমকি পাথর ঠুকে আলো জ্বালল। সত্যিই মৃদু আলো। এখন ফ্রান্সিসরা সবকিছুই মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পেল। এক কোনায় বৃদ্ধটি বিছানায় শুয়ে আছে। বাকি জায়গা থেকে লায়েন্ড সংসারের

জিনিসপত্র সরিয়ে নিল। বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা হল। পাথুরে মাটির কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো মেঝেয় ফ্রান্সিস বসে পড়ল। হ্যারিরাও বসল। ফ্রান্সিস হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। হ্যারি পা মুড়ে দেয়ালে পিঠ ঠেসে বসল। সবার শোয়ার মতো জায়গা নেই। তবু কয়েকজন গুটিসুটি মেরে শুল। বাইরে নিশুতি রাত। দূরের সমুদ্রের হাওয়া ধারে-কাছের গাছপালার পাতা ও ডালের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মৃদু শব্দ হচ্ছে। আর কোনো শব্দ নেই চারিদিকে।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিসরা কোনো কথা বলছে না। মাঝে মধ্যে বৃদ্ধের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সারারাত পালা করে পাহারা দেওয়া চলল। খাঁড়ির জলে কোনো জাহাজকে আসতে দেখা গেল না।

রাত শেষ হল। ফ্রান্সিস হ্যারি সারারাতই জেগে ছিল। দূরের গাছপালায় পাখির ডাকাডাকি শুরু হতে ফ্রান্সিসের তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল। কাছের গাছে কয়েকটা পাখির স্পষ্ট ডাক শোনা গেল।

ভোর হল। বন্ধুরা আস্তে আস্তে নিজেদের জায়গা থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে জড়ো হতে লাগল। ফ্রান্সিসরা উঠে বসল। কয়েকজন বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চলে এল। বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল।

লায়েন্ড এসে ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে হ্যারি বলল, আপনি রাতে ঘুমোননি?

কী করে ঘুমোই! বেশ বুঝতে পারছিলাম কোনো আশঙ্কা নিয়ে আপনারা একরকম জেগে আছেন। আমারও একটু চিন্তা হচ্ছিল। লায়েন্ড হেসে বলল।

শুনুন, আজকের রাতটাও আমাদের এই গ্রামেই থাকতে হবে। দুশ্চিন্তায় রাত জাগা এসবে আমরা অভ্যস্ত। আপনি মিছিমিছি রাত জাগবেন না। নিশ্চিন্তে ঘুমুবেন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। লায়েন্ড হেসে মাথা কাত করল।

একটা কথা। আমার স্ত্রী সকালের খাবার খেয়ে এখানে আসবেন। আপনার আর অন্য কোনো কোনো বাড়ির অন্দরমহলে গল্পগুজব করবেন। দুপুরে খেয়ে এসেও থাকবেন। বিকেলে জাহাজে ফিরে যাবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো? ফ্রান্সিস বলল।

না, না। এ তো আমাদের সৌভাগ্য। খুব খুশি হয়ে লায়েন্ড বলল।

আমরা এখন জাহাজে ফিরে যাচ্ছি, হ্যারি বলল, আপনাকে ধন্যবাদ।

বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিসরা এক এক করে জাহাজে উঠে এল। ডেক-এ উঠে একজন

বন্ধু সখেদে বলল, রাত জাগাই সার। কোনো জাহাজও এল না। লড়াইও হল না। পেছনেই ছিল হ্যারি। মৃদুস্বরে বলল, বন্ধু হে, লড়াইয়ের দিন এখনও শেষ হয়নি।

ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস দেখল রেলিং ধরে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল, সেকি—তুমি রাতে ঘুমোওনি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব ভোরে পাখির বিচিত্র ডাকাডাকি শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সমুদ্রে তো ডাঙার পাখির ডাক শোনা যায় না। এত ভালো লাগছিল উঠে পড়লাম। মারিয়া বলল।

সামুদ্রিক পাখির ডাক তো শোনো। ফ্রান্সিস বলল।

সে তো বন্দরের কাছে এলে। তাও কী তীক্ষ্ণ ডাক। ডাঙার পাখির ডাক কত সুন্দর। কত বিচিত্ররকম।

তা ঠিক। ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলল।

কেবিনে ঢুকে দেখল ক্রেভান বিছানার একপাশে চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল, কী? ঔষুধ খেয়েছ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। মারিয়া বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আমার হাত-মুখ ধুইয়ে ওষুধ খাইয়ে গেছে। কিন্তু তুমি সারারাতে ফিরলে না। কী ব্যাপার? ক্রেভান বলল।

ক্রেভান, ফ্রান্সিস তরোয়ালটা বিছানার নীচে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, ইয়ুসুফ যে কী সংঘাতিক লোক কল্পনাও করতে পারবে না। ইয়ুসুফ সৈন্যভর্তি জাহাজ নিয়ে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের খোঁজে এই ফাঁড়িতে ঢুকেও হামলা চালাবে। তাই আমরা গ্রামেই ছিলাম। রাত জেগে পাহারা দেওয়া চালিয়েছি।

সত্যি, চিন্তার কথা, ক্রেভান বলল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসে পায়ের দিকে তাকাল। ছোট্ট ঘর। প্রায় পায়ের কাছে রাখা হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদের সিন্দুকটা। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিসের মনে হল কী হবে এই লুঠেরার সম্পদ নিয়ে? দেশের রাজাকে গিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু রাজা ম্যাগনামের সম্পদের গাঁঠরিটাও তো রয়েছে। এত মূল্যবান সম্পদ জাহাজে রাখা কি উচিত হবে? জলদস্যুর পাল্লায় পড়লে তো আমাদের জীবন বিপন্ন হবেই। এইসব ধনসম্পদও লুঠ হয়ে যাবে। এত ধনসম্পদ জাহাজে রাখা বিপজ্জনক নয় কি? তখনই মারিয়া ঢুকল। পেছনে সকালের খাবার হাতে রাঁধুনি বন্ধু। তিনজনে বিছানায় বসে খেতে লাগল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, যার বাড়িতে আমরা রাজা ম্যাগনামের এক পাটি জুতো পেয়েছিলাম তার নাম লায়েন্ড। তাকে বলে এসেছি তুমি যাবে।

আমি এখনই যাব। খুশিতে বলে উঠল মারিয়া।

ঠিক আছে। কিন্তু দুপুরে জাহাজে এসে খাবে। ওরা কিন্তু দরিদ্র। বাড়তি লোকের খাবার জোগাড় করা ওদের পক্ষে কষ্টকর হবে। ফ্রান্সিস বলল।

না, না। ওরা খেতে অনুরোধ করলেও আমি শুনব না। চলে আসব। কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাব। ওদের দেব। মারিয়া বলল।

একটু চমকে উঠে ফ্রান্সিস বলে উঠল, ঠিক। এ কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি।

মারিয়া অবাক। বলল, হঠাৎ এ কথা বলছ?

হ্যাঁ মারিয়া। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অবাক মারিয়া বলল।

শোন। হ্যারল্ডের লুঠ করা ধনসম্পদের অর্ধেক এই স্লাভিয়া গ্রামবাসীদের জন্যে লায়েন্ডকে দিয়ে যাব। যে অর্থ ওরা এসব বিক্রি করে পাবে তাই দিয়ে চাষবাসের কাজে লাগাতে পারবে, বাড়িঘর মেরামত করতে পারবে, মাছ ধরবার ভালো ভালো জাল কিনতে পারবে, নৌকো কিনতে পারবে। এই দারিদ্র্য সবটা না হলেও কিছু তো ঘুচবে। জীবনে কোনোদিন এই গ্রামে আর আসব না। কিন্তু ওরা তো আমাদের মনে রাখবে। কত মানুষ, নারী, শিশুর রক্ত লাগা এই অভিশপ্ত সম্পদ সৎকাজে তো ব্যয় হবে।

সত্যি ফ্রান্সিস, তুমি কত কিছু ভাবো। মারিয়া বলল।

ভাবায় বলেই ভাবি। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

আমি তাড়াতাড়ি যাব। মারিয়া বলল।

নিশ্চয়ই। যাও।

মারিয়া উঠতে উঠতে বলল, ফ্রান্সিস, দোরেস্তাদ বন্দরে যে নতুন পোশাকটা তৈরি করিয়েছিলাম সেটা তো একবারও পরিনি। ওটা পরে যাব?

না, না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, ঐ দামি পোশাক পরে গেলে ওরা তোমাকে আপন করে নিতে পারবে না। আর একটা কথা, তুমি যে আমাদের দেশের রাজকুমারী এ কথা কক্ষনো বলবে না। যা পরে আছ তাই পরে যাও। ওদের ঘর রাজপ্রাসাদের আলোকোজ্জ্বল অন্তঃপুর নয়।

বেশ, তোমার কথা তো অমান্য করতে পারি না। মারিয়া বলল। তারপর মাথার চুলে চিরুনি বুলিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ ক্রেভান এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, ফ্রান্সিস, আমি তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। তুমি সত্যিই ভাইকিং জাতির গর্ব।

ক্রেভান, মানুষের প্রীতিভালোবাসা পেতে গেলে নিজের আচার-আচরণকে পবিত্র রাখতে হয়। বলো, তাই কিনা? ফ্রান্সিস বলল।

অবশ্যই। এই বৃদ্ধ বয়েসেও তোমার কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে। ক্রেভান বলল।

থাক ওসব। আজকের রাতটাও আমাদের প্রায় জেগেই কাটবে। যদি বিপদ না ঘটে তাহলে কালকে দুপুরেই জাহাজ ছাড়ব। এখন বলুন, আপনি কী করবেন? আমাদের সঙ্গে থাকবেন? ফ্রান্সিস বলল।

না, না। তোমরা আমার জন্যে অনেক করেছ। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। দোরেস্তাদ বন্দরে আমাকে নামিয়ে দিও। তোমাদের বোঝা হব না। ক্রেভান বলল।

মুশকিল হয়েছে দোরেস্তাদ বন্দরে জাহাজ ভেড়ালে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। বরং আমাদের সঙ্গে চলুন। পরে যে দেশের বন্দরে থামব সেখানে আপনাকে বেশকিছু সোনার চাকতিদিয়ে নামিয়ে দেব। তারপর আপনার যা মন চায় করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। সেটাই ভালো হবে। তোমাদের যেন কোনো বিপদ না হয়, ক্রেভান বলল। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা আমার।

দুপুরে খুশিতে উচ্ছল মারিয়া এল। ফ্রান্সিসকে বলল, উফ, যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রায় সব বাড়ির মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছিল। কত কথা, কত গল্পগুজব—কী আনন্দে যে সময়টা কাটল। মারিয়াকে এত খুশি, এত উচ্ছল দেখে ফ্রান্সিসের মনও প্রসন্ন হল। ও সব সময়ই চায় মারিয়া আনন্দে থাকুক, খুশিতে উচ্ছল থাকুক। খেয়ে নিয়ে আবার যাও কিন্তু বিকেলেই ফিরে এসো ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে বন্ধুরা কয়েকজন মিলে দূর সমুদ্র-মুখের দিকে নজর রেখে চলেছে। পেড্রো তো সকাল থেকেই ওর নজরদারির জায়গায় বসে আছে।

দুপুরে গড়িয়ে বিকেল হল। কোনো বিপদ ঘটল না। মারিয়া ফিরে এসে রেলিং ধরে সূর্যাস্ত দেখতে লাগল।

সন্ধের পরেই গত রাতের মতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সব বন্ধুরা তীরভূমিতে নেমে এল। গত রাতের মতোই পাহারা দেওয়ার কাজ শুরু হল। ফ্রান্সিস, হ্যারিরা কয়েকজন লায়েন্ডের বাড়ির বাইরের ঘরে ঠাসাঠাসি করে রাত কাটাল। প্রায় কেউই সারারাত ঘুমোবার সুযোগ পেল না।

ভোর হতে সবাই জাহাজে ফিরে এল।

জাহাজের ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, নীচে এসো কাজের কথা আছে। কাল রাতে পাছে বৃদ্ধের ঘুম ভেঙে যায় তাই তোমাকে বলা হয়নি। শাঙ্কোকে ডেকে নিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস কেবিনে ঢুকল। একটু পরেই হ্যারি আর শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, ছেঁড়া পালের একটা বড় টুকরো নিয়ে এসো। শাঙ্কো চলে গেল। একটু পরেই শাঙ্কো ছেঁড়া পালের একটা বড় টুকরো নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওটা মেঝেয় পাতল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যারি, আমি স্থির করেছি হ্যারল্ডের অভিশপ্ত ধনভাণ্ডারের অর্ধেক এই স্লাভিয়া গ্রামের মানুষদের কল্যাণের জন্য দিয়ে যাব।

খুব ভালো কথা। এটা একটা কাজের কাজ হবে। হ্যারি আনন্দে বলে উঠল।

শাঙ্কো, সিন্দুকটা খুলে সবকিছু এই কাপড়টায় ঢালো। দুটো ভাগ করবে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ল। সিন্দুক খুলে সব অলঙ্কার মুদ্রা সোনার চাকতি মণিমুক্তো কাপড়টার ওপরে ঢালল। তিনজনে মিলে দেখে দেখে দু'টো ভাগ করল সব। এক ভাগ কাপড়টায় রেখে গাঁঠরি মতো বাঁধা হল। বাকি ভাগ সিন্দুকে তুলে রাখা হল।

হ্যারি বলে, এখনই কাজটা সেরে আসি। শাঙ্কো গাঁঠরিটা নাও। শাঙ্কো গাঁঠরিটা কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারিও এল। তিনজনে একে একে পাটাতন দিয়ে হেঁটে তীরে নামল। উঁচু পাড়ে উঠল। চলল লায়েন্ডের বাড়ির দিকে। লায়েন্ড দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে হেসে বলল, এখন এলেন?

ভেতরে চলুন, কথা আছে ফ্রান্সিস বলল। ভেতরে ঢুকে মেঝেয় গাঁঠরিটা রেখে শাঙ্কো বলল, আমাদের রাজকুমারী কোথায়?

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল, আঃ শাঙ্কো! লায়েন্ড তো অবাক। বলল, উনি রাজকুমারী? আপনাদের দেশের? ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বলে, আরে না না। উনি গরীব ঘরের মেয়ে। আমরা ঠাট্টা করে রাজকুমারী বলে ডাকি।

ও। তাই বলুন। লায়েন্ড হাসতে হাসতে বলল।

শাঙ্কো, ফ্রান্সিস বলল, মুখটা খোলো। শাঙ্কো গাঁঠরির মুখটা খুলল। অত অলঙ্কার, সোনা দেখে লায়েন্ড হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে রইল। বিস্ময়ে হতবাক।

লায়েন্ড, এসব কোথা থেকে কী করে পেলাম আপনার জানার দরকার নেই। এই সব সম্পদ আপনাকে দিলাম। কিন্তু শর্ত আছে। এই সম্পদ বিক্রি করে যে অর্থ পাবেন গ্রামের সব পরিবারকে সমানভাবে ভাগ করে দেবেন সততার সঙ্গে । এই সব কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে আপনি কিছু বেশি অর্থ নেবেন। আমরা চাই আপনাদের গ্রামের মানুষেরা দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হোক। এটা কিন্তু দয়া দেখানো নয়। কৃতজ্ঞতার উপহার। ফ্রান্সিস বলল।

এতক্ষণে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লায়েন্ড বলল, আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব। সত্যি, বড় কষ্টে দিন কাটে আমাদের।

ঠিক আছে। এবার অর্থের বিনিময়ে উন্নতির সুযোগ কাজে লাগান। কিন্তু রাজকুমারী কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

ওপাশের এক ধার্মিক বুড়ি রাজকুমারীকে প্রায় জোর করে নিয়ে গেছে। বোধহয় ধর্মকথা শোনাতে। লায়েন্ড হেসে বলল।

ঠিক আছে। চলি। আজ দুপুরেই আমরা জাহাজ ছাড়ব। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জাহাজে ফিরে ডেক-এ দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, ভাই সব, কাছে এসো আমার কিছু বলার আছে। বন্ধুরা অনেকেই ডেক-এর এদিকে-ওদিকে কাজে ব্যস্ত ছিল অনেকে ডেক-এও বসেছিল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল, শোন, এখন মনে হচ্ছে বিপদ কেটে গেছে। দুপুরেই আমরা জাহাজ চালাব। কিন্তু দাঁড়ঘরে যারা থাকবে তারা ছাড়া বাকি সবাই ডেক-এ তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই এলাকা ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব পালাতে হবে। সবাই তৈরি হও। গভীর সমুদ্রে পড়ে যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালাতে হবে। যাও।

বন্ধুদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। পাল খোলা, হালের দড়িদড়া পরীক্ষা করা, কাজ তো কিছু কম না।

দুপুরে নোঙর তোলা হল। একদল দাঁড় টানতে দাঁড়ঘরে চলে গেল। কয়েকজন পালের কাঠামোয় উঠে বেশি বেশি হাওয়া ধরার জন্যে পাল ঠিক করতে লাগল। ফ্রেজার জাহাজ চালাতে শুরু করল। জাহাজের গতি বাড়তে লাগল। ফাঁড়ির মুখে জাহাজ এল। দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে পড়ে জাহাজ উঁচু উঁচু ঢেউ ভেঙ্গে ছুটল। জাহাজের দুলুনির মধ্যেও ভাইকিংরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল জাহাজের গতি বাড়াতে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ দ্রুত চলল। সন্ধেবেলা ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। ফ্রেজারের কাছে এসে বলল, দিক ঠিক রেখেছ তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে কোনো ছোট-বড় বন্দর পেলে বুঝতে পারব কত দূরে এলাম।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। ভেবে নিশ্চিন্ত হল ইয়ুসুফের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আসা গেছে।

সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল। এতদিন ভাইকিংরা সমুদ্রে যাত্রীবাহী বা মালবাহী জাহাজ খুব কমই দেখেছে। কিন্তু এখন ইউরোপে এসে মাঝে মাঝে জাহাজগুলোর মাস্তুলের মাথায় বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে। ওদের দেশের জাহাজও একটা দেখেছে। কিন্তু বেশ দূরে। সেই জাহাজের কাছে যেতে ফ্রান্সিস খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। হ্যারল্ডের মতো আবার যদি কোনো লুঠেরা দস্যুদলের পাল্লায় পড়তে হয়!

সেদিন শেষ বিকেলে মারিয়া রেলিং ধরে সূর্যাস্ত দেখছে। সূর্য এখনও অস্ত যায়নি। নজরদার পেড্রোর চিৎকার শোনা গেল, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। বন্দর শহর। ওদিক থেকে একটা জাহাজ আসছে। মনে হচ্ছে আমাদের দিকে।

শাঙ্কো সিঁড়িঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেলিং ধরে পুব দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি আর মারিয়া ওর পাশে এসে দাঁড়াল। একটু পরেই ফ্রান্সিস বুঝল জাহাজটা ওদের জাহাজ লক্ষ্য করেই আসছে। হতে পারে জাহাজটা ওদের জাহাজের পাশ দিয়েই চলে যাবে। কাছে না এলে বোঝা যাবে না। জাহাজটা অনেক কাছে চলে এল। সূর্যাস্তের শেষ আলোর আভায় দেখা গেল মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, পতাকাটা কোন দেশের ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ক্রেভানকে ডেকে আন তো।

হ্যারি দ্রুত ছুটে গিয়ে ক্রেভানকে নিয়ে এল। ক্রেভান এখন বেশ সুস্থ। একাই হেঁটে এল। মনোযোগ দিয়ে জাহাজের পতাকাটা দেখতে লাগল। জাহাজটা তখন অনেক কাছে এসে গেছে। সেই জাহাজের ডেকে দেখা গেল সশস্ত্র যোদ্ধাদের। গায়ের রং কালো। আঁটোসাঁটো কালো পোশাক। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট। তাতে তরোয়াল ঝুলছে।

এরা মুর। মুরদের টহলদারি জাহাজ। হয় পর্তুগাল নয় তো স্পেনের কাছে এসেছি আমরা। দুই দেশের বেশ কিছু এলাকায় মুররা রাজত্ব করছে। ক্রেভান বলল।

ফ্রান্সিস, কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

দেখি ওরা আমাদের কাছে আসে কিনা। এলে কী বলে শুনি। ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল। ক্রেভান মৃদুস্বরে বলতে লাগল, আমি এইসব জায়গায় আগে এসেছি। মুররা হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একটি মুসলিম জাতি। পোর্তুগাল, স্পেনের বেশ কিছু অঞ্চল জয় করে রাজত্ব করছে। যুদ্ধে পারদর্শী। কিন্তু পরধর্ম-অসহিষ্ণু। তবে এই মুর শাসকদের মধ্যে শিল্পানুরাগী, সাহিত্যপ্রেমিকও আছেন। এদের কবলে পড়লে কিন্তু মারিয়ার বিপদ হতে পারে।

বেশ চমকে উঠে ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, মারিয়া তুমি চলে যাও। আগে সব দেখি বুঝি। মারিয়া ঠিক বুঝল না কিছু। তবে নেমে কেবিন ঘরে চলে এল।

এবার সন্ধ্যার আবছা আলোয় জাহাজের সব কিছুই দেখা গেল। মুর যোদ্ধারা বেশ তৎপর দেখা গেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটাই যে ওদের লক্ষ্য বোঝা গেল এবার। জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ঝাঁকুনি খেল দুটো

জাহাজই। মুর যোদ্ধারা লাফিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এসে সারি দিয়ে দাঁড়াল। জলদস্যুর দল হলে লড়াইয়ের কথা ভাবা যেত। কিন্তু মুরদের উদ্দেশ্য কি তা তো স্পষ্ট নয়।

মুরদের জাহাজ থেকে এবার যে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল সে যোদ্ধা নয়। বেশ দামী কাপড়ের ঢোলা গভীর নীল রঙের পোশাক পরা। বেশ সুগঠিত শরীর। মুর যোদ্ধারাও বলিষ্ঠ চেহারার। লোকটির মাথায় পেঁচিয়ে বাঁধা লাল রঙের দামী কাপড়। মুখে দাড়ি-গোঁফ। বেশ ভারিক্কি ভঙ্গি চলাফেরায়। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে পর্তুগিজ ভাষায় বলল, তোমরা কারা? ফ্রান্সিস লোকটির চোখের দিকে তাকাল। বেশ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চোখে। বেশ ক্ষমতাধর মানুষের চাউনি।

আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

এখানে এসেছ কেন? লোকটি জানতে চাইল।

তার আগে বলুন আপনার পরিচয় আর এটা কোন বন্দর? ফ্রান্সিস বলল।

লোকটা এই প্রশ্নে খুশি হল না। বোঝা গেল প্রশ্ন করা পছন্দ করে না। তবে বিরক্তি চেপে বলল আমি উজীর ইয়েপুদা। এটা পোর্তুগালের একটি বন্দর শহর পোতো। কিছুদূরে রাজধানী পৌরো। শাসকের নাম খলিফা হাকিম। একনাগাড়ে বলে গিয়ে উজির ইয়েপুদা এবার বলল, তোমাদের পরিচয় বলো।

আমরা ভাইকিং। দেশ থেকে বহুদিন আগে জাহাজে চড়ে বেরিয়েছি। কত দ্বীপদেশ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। কিন্তু লুঠেরা দস্যুর বদনাম আছে তোমাদের। উজির বলল।

আমাদের সঙ্গে লড়াই করে যারা হেরে যায় তারা এই দুর্নাম দেয়। আর কিছু ভাইকিং জাতির কলঙ্ক ভাইকিং নিশ্চয়ই আছে। তাদের দলেরএক সর্দারকে আমি আমার স্বদেশবাসী হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করেছি। বাকিদের বিন্দুমাত্র করুণা না করে তাড়িয়ে দিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। প্রথম শুনলাম। সমুদ্রের ধারে টহলদারি করি আমরা। আমি উজির, মাঝে মধ্যে আসি টহলদারির কাজ দেখতে। যাক গে, তোমাদের সঙ্গে দরবারে পরে কথা হবে। কিন্তু আমাদের জাহাজের সঙ্গে তোমাদের জাহাজ বাঁধা হবে। পোতো বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহাজ তল্লাশি করা হবে। কালকে সকালে খলিফা হাকিমের দরবারে হাজির করা হবে। খোঁজখবর করা হবে। উজির বলল।

তাহলে কি আমাদের বন্দি করা হল? হ্যারি বলল।

সেটা সব খোঁজখবর নিয়ে পরে স্থির হবে। উজির বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমাদের জাহাজ বাঁধার দরকার নেই। আপনার জাহাজের পাশে পাশেই বন্দরে যাব।

বেশ। উজির ইয়েপুদা বলল। তারপর চলে যেতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, সাবধান! পালাবার চেষ্টা করবে না। একবার লড়াইয়ে নামলে আমরা শত্রুদের কাউকে বেঁচে থাকতে দিই না। শুনেছি তোমরা সাহসী, লড়াইয়ে দক্ষ। অনেক লড়াইয়ে বোধহয় জিতেছও। কিন্তু তবু সাবধান! উজির ইয়েপুদা নিজেদের জাহাজে চলে গেল। চারজন মুর যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের পাহারায় রইল। বাকিরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস বেশ চিন্তায় পড়ল। আজ রাতেই যদি তল্লাশি হয় তাহলে মারিয়াকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। মারিয়ার বিপদ হতে পারে অভিজ্ঞ ক্রেভানের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। একটা উপায় বের করতেই হবে এবং আজ রাতের মধ্যেই। কিন্তু তল্লাশি হলে কখন হবে, কতটা সময় হাতে পাবে তাও তো ফ্রান্সিস বুঝতে পারছে না। তবে কথায় ব্যবহারে ইয়েপুদাকে যা দেখল তাতে এটা ভালো করেই বুঝল ঐ লোকটাকে চটানো চলবে না। বরং বিনাবাক্যে ওর হুকুম দ্রুত পালন করতে হবে। এটা ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। মুর যোদ্ধা ক'জনকে দেখল ডেক-এর এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। ফ্রান্সিস দেশীয় ভাষায় বলল, ফ্রেজার, এক্ষুনি জাহাজ ঐ জাহাজের সামনে নিয়ে যাও। তারপর ঐ বন্দর লক্ষ্য করে আস্তে চালাও। তাহলে ঐ জাহাজও আমাদের পাশে পাশে আসবে। শুনলে তো ঐ উজিরের কথা।

আমাদের ভাগ্য খারাপ, ফ্রেজার বলল।

দুর্ভাগ্য-টুর্ভাগ্য বাজে কথা। ভাগ-টাগ্য বলে কিছু নেই। ঘটনা ঘটে। কখনও আমাদের স্বপক্ষে কখনও বিপক্ষে। বিপক্ষে গেলে লড়তে হয়। যাক ওসব কথা। এখন অনেক চিন্তা। জাহাজ ছাড়ো। ফ্রান্সিস দ্রুত হ্যারিদের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল, হ্যারি এসো। কথা আছে।

কেবিন ঘরে ঢুকে দেখল মারিয়া চুপ করে বসে আছে। ঘর অন্ধকার।

আলো জ্বালো। ভয়কে জয় করতে হয়। ফ্রান্সিস আস্তে কথাটা বলে অভ্যেস মতো বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ক্রেভান নিশ্চুপ। আস্তে আস্তে একপাশে বসল। হ্যারি চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া আলো জ্বালল। কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস চোখ বুজে শুয়েই রইল। ঘর নিস্তব্ধ। কেউ কোনো কথা বলছে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস চোখ খুলে দ্রুত উঠে বসল। একবার মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল, হ্যারি, ছক কষা হয়ে গেছে। শুধু দুটো সুযোগ চাই। এক, আজকের রাতটা আর এই বন্দর এলাকায় নৌকো চলাচল করে কিনা। তারপর বলল, সন্দেহ নেই ঐ উজির ইয়েপুদা অর্থপিশাচ। প্রবল ক্ষমতালোভী। ওকে বাগে আনতে হবে। হ্যারি। চুপ করে রইল। এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর
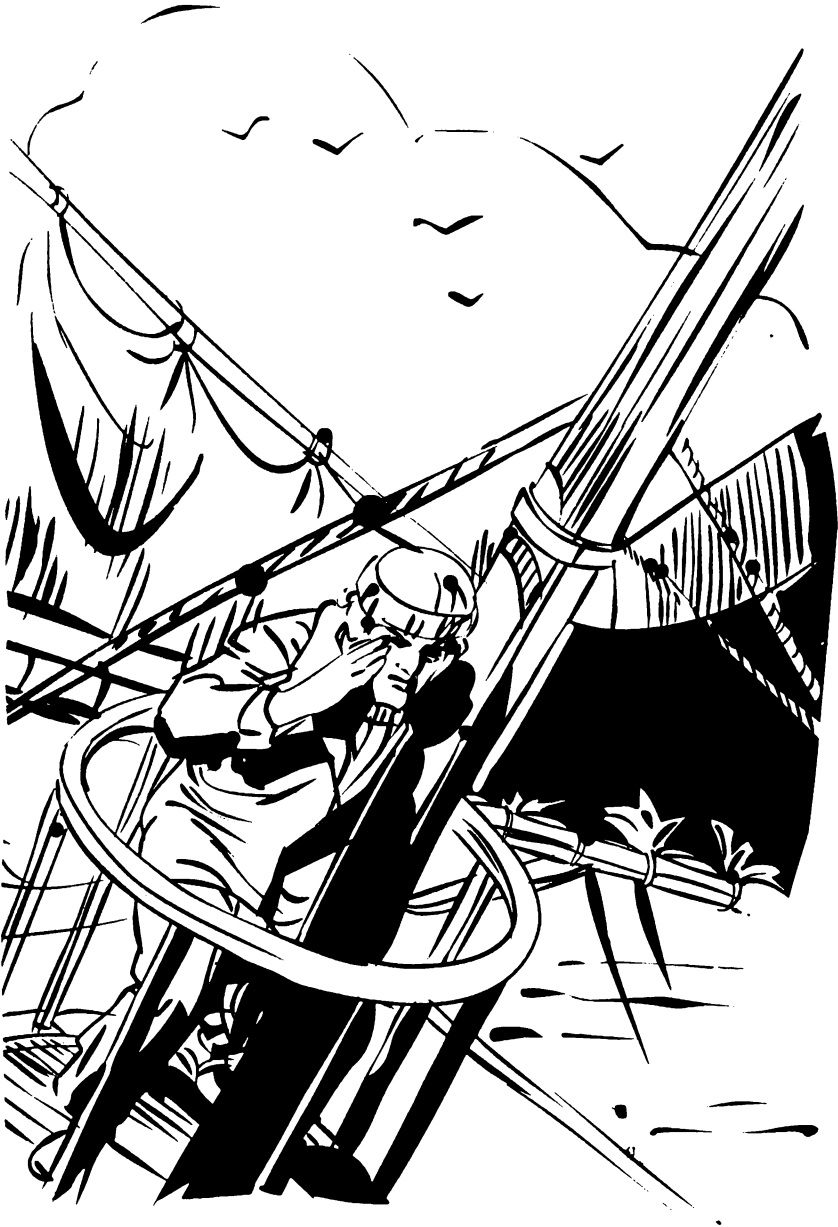
নিজের জায়গায় বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জাহাজঘাট ও দুপাশ দেখতে লাগল।

সমস্ত পরিকল্পনা সংক্ষেপে বলল। হ্যারি অল্পক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে উঠল, সাবাস ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, পারবে তো যা করতে বললাম?

কেন পারব না। এমন কি কঠিন কাজ? হ্যারি তো সঙ্গেই থাকবে। মারিয়া বলল।

এবার বন্দরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা। হ্যারি, তুমি, মারিয়া আর শাঙ্কো তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে। উপোসি পেটে কোনো কাজ হয় না। একটু চুপ করে থেকে বলল, হ্যারি, এবার শাঙ্কোকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলো। মুর যোদ্ধারা আছে। দেশীয় ভাষায় বলবে। যাও।

হ্যারি কোনো কথা না বলে চলে গেল। ক্রেভান মৃদুস্বরে বলল, ফ্রান্সিস, তুমি শুধু দুঃসাহসী নও, বুদ্ধিমানও। ফ্রান্সিস কোনো কথা না বলে আবার শুয়ে পড়ল। মারিয়া বলল, তাহলে আমার বিপদ হবে না, কিন্তু তোমাদের কী হবে? চোখ বন্ধ করে ফ্রান্সিস বলল, পরের ঘটনা কী ঘটে তা দেখে বাকি ছক ভাবব।

উজির ইয়েপুদার টহলদারি জাহাজের পাশে পাশে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরের কাছে এল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ডেক-এ উঠে এসেছে। পাশে দাঁড়ানো হ্যারিকে মৃদুস্বরে বলল, পেড্রোকে ডাকো। হ্যারি দ্রুত গিয়ে পেড্রোকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস আগের মতোই মৃদুস্বরে বলল, পেড্রো, মাস্তুলে ওঠো। কেউ এই অন্ধকারে দেখবে না। জাহাজঘাটে মালের আলো আছে। ওপরে উঠে যতটা সম্ভব নজর দিয়ে দেখবে তীরের কাছে কোথাও নৌকো আছে কিনা। ঘাটে পৌঁছবার আগেই নেমে আসবে। তাড়াতাড়ি যাও।

পেড্রো এ ব্যাপারে অভ্যস্ত। মুর যোদ্ধাদের দেখল। দু'জন সিঁড়িঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। অন্য দু'জনের একজন জাহাজের মাথার দিকে, অন্য জন হালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পেড্রো নিঃশব্দে দ্রুত মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। নিজের জায়গায় বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহাজঘাট ও দু'পাশ দেখতে লাগল। ঘাটে বেশ কয়েকটা মশাল জ্বলছে। কয়েকজন প্রহরীকেও দেখল। ডানদিকে তীরভূমিতে কিছু বাড়ি-ঘর অস্পষ্ট দেখল। বাঁদিকে তাকাতেই দেখল বেশ দূরে কয়েকটা নৌকোর কালো ছায়া মতো। বালিয়াড়িতে কয়েকটা খুঁটিও।

তার মানে ওগুলো মাছ-ধরা জাল টাঙানোর খুঁটি। ওটা জেলেপাড়া। পেড্রো নিঃশব্দে দ্রুত নেমে এল। তারপর কোনো ব্যস্ততা না দেখিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল, বাঁদিকে জেলেপাড়া, নৌকো কয়েকটা বাঁধা। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল, হ্যারি, মূল্যবান তথ্য। এবার রাতের তল্লাশি আটকানো।

দুটো জাহাজই জাহাজঘাটে ভিড়ল। মুর যোদ্ধা চারজন নামার জন্যে তৈরি হল।

ফ্রান্সিস দ্রুত ওদের কাছে এল। বলল, আমাদের জাহাজের নোঙর ফেলব। তবু তীরের কোনো খুঁটির সঙ্গে শক্ত কাছি দিয়ে আমাদের জাহাজের হালটা বাঁধো। কাজটা করে মান্যবর উজিরকে গিয়ে বলবে আর আমাদের একটা অনুরোধ জানাবে। উনি মান্যবর উজির, সম্মানিত মানুষ— তাঁকে তো এখানে আসতে বলতে পারি না। তাঁকে বলবে যে আমরা অনেকটা সমুদ্র এলাকা একটানা চলে এসেছি। আজকের রাতটা বিশ্রাম করতেই হবে। নইলে কালকে উঠে দাঁড়াতে পারব না। কাজেই উনি যেন কাল সকালে তল্লাশির ব্যবস্থা করেন। অনুরোধ, আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলো, কেমন?

একজন যোদ্ধা মোটামুটি স্পষ্ট পোর্তুগিজ ভাষায় বলল, ঠিক আছে, বলব। তবে মাননীয় উজির বড়ো মেজাজের মানুষ। তোমার অনুরোধ রাখবে কিনা জানি না।

তুমি ভাই বলো তো, তারপর যা হবার হবে। ফ্রান্সিস বেশ বিনয় দেখিয়ে বলল। যোদ্ধা চারজন নেমে গেল।

ওদিকে একটা ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য গাড়ি এসে থামল জাহাজঘাটে। মশালের আলোয় দেখা গেল ঘাটের প্রহরীরা সার বেঁধে গাড়িটার দু'পাশে দাঁড়াল। উজির ইয়েপুদা আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে নেমে গাড়িটার দিকে চলল। ফ্রান্সিস গভীর মনোযোগ দিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেই যোদ্ধাটিকে খুঁজতে লাগল। হ্যাঁ, সেই যোদ্ধাটি উজিরের কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে কিছু বলতে লাগল। উজির দাঁড়িয়ে পড়ে শুনল। বোধহয় কিছু বলল। তারপর গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি চলে গেল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটু আগেই পাতা পাটাতন দিয়ে চারজন যোদ্ধা নেমে গিয়েছিল। প্রায় আট-দশজন যোদ্ধাকে দেখা গেল পাটাতনের দিকে আসতে। সবার সামনে বেশ জবরজং পোশাক পরা একজন। মাথায় শিরস্ত্রাণ। সবাই যখন উঠে আসছে হ্যারি চাপাস্বরে ডাকল, ফ্রান্সিস!

দাঁড়াও তল্লাসি ঠেকাতেই হবে। ফ্রান্সিসও বেশ চাপা স্বরে বলে উঠল।

যোদ্ধাদের নিয়ে সামনের জন ফ্রান্সিসদের কাছে এল। কোমরে সোনারুপোর কাজ করা চওড়া বেল্ট। তরোয়ালের হাতলে সোনারুপোর গিল্টি করা। বোঝা গেল সেনাপতি। সেনাপতি কাছে এসে বলল, তোমাদের অস্ত্রঘরে যত অস্ত্রশস্ত্র আছে নিয়ে এসো। সব বাজেয়াপ্ত করা হবে।

খুব ভালো কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত বলে উঠল, সত্যিই তো আমরা বিদেশী। লুঠেরা দস্যু বলে আমাদের বদনামও আছে। কখন কী করে বসি। এক্ষুনি সব অস্ত্রশস্ত্র

জমা দিচ্ছি। আপনারা অপেক্ষা করুন। শাঙ্কো যাও তাড়াতাড়ি। মাননীয় উজিরের হুকুম মানতেই হবে। শাঙ্কোর সঙ্গে আরো কয়েকজন বন্ধুও জুটে গেল। ফ্রান্সিস বলল, কিন্তু একজন যোদ্ধাকে তো বলেছিলাম আমরা অনেকটা দূর থেকে জাহাজ চালিয়ে আসছি। খুব পরিশ্রান্ত আমরা।

হুঁ। মান্যবর উজিরের হুকুম— কাল সকালে জাহাজ তল্লাশি হবে। সেনাপতি বলল।

খুব অনুগৃহীত হলাম। মহামান্য উজির দীর্ঘজীবী হোন। ফ্রান্সিস খুব খুশির ভঙ্গি তে বলে উঠল। হ্যারি ফ্রান্সিসের এই বিগলিত ভাব দেখে বেশ আশ্চর্যই হল। তবে মনে মনে ফ্রান্সিসের বেশ প্রশংসাই করল। উজিরের বিশ্বাস উৎপাদনে এই কৃতার্থভাব দেখাতেই হবে।

শাঙ্কোরা সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এল। ডেক-এ জড়ো করল।

কোনো অস্ত্রশস্ত্র পড়ে নেই তো? ফ্রান্সিস বলল।

না—না। সব এনেছি। এমনকি তীর-ধনুকও। শাঙ্কো বলল। সেনাপতি অস্ত্রের পরিমাণ দেখে খুশিই হল। সে ইঙ্গিতে যোদ্ধাদের সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে বলল। যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলে যেতে লাগল। সেনাপতি বলল, কালকে তোমাদের মহামান্য খলিফার দরবারে হাজির করা হবে।

খুব আনন্দের কথা, ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতি ও যোদ্ধারা নেমে গেল। ঘাটে নেমে সেনাপতি পিছু ফিরে পাটাতন তুলে নিতে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো, বিনোলা ছুটে গিয়ে পাটাতন তুলে ফেলল। ফ্রান্সিস ছুটে এসে রেলিং থেকে ঝুঁকে গলা চড়িয়ে বলল, মাননীয় সেনাপতি, নোঙর ফেলা হয়েছে, কিন্তু মোটা কাছি দিয়ে ঘাটের ঐ খুঁটির সঙ্গে কাছিটা বাঁধা হয়নি। সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হাত নেড়ে কথাটার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে চলে গেল। পেছনে যোদ্ধারাও চলল।

হ্যারি, দুটো সিঁড়ি পেরোলাম। এবার তৃতীয় সিঁড়িটা। তোমরা শিগগির এসো।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি চলে আসে কেবিনঘরে। মারিয়া চিন্তাগ্রস্ত মুখে তখন থেকে বসে আছে। ক্রেভানও কম চিন্তিত নয়। ফ্রান্সিস কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত গিয়ে সিন্দুকের ডালাটা খুলল। হিসেব করে দেখল সিন্দুক যতটা ফাঁকা হয়েছে তাতে বেশ কিছু কাপড়-চোপড় আঁটানো যাবে। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, দোরেস্তাদ বন্দরে তোমাদের যে নতুন পোশাকগুলি তৈরি করালে তারই গোটা সাত-আট পোশাক নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি। শাঙ্কোরা কয়েকজন প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নতুন পোশাকটা বের করো। আর একটা তুলে রাখা মানে কম ব্যবহার করেছ এমন পোশাক আর একটা গায়ে দেবার চাদর বের করে আনো।

সেই চাদর তো গরম চাদর। ফুল-পাতার কাজ করা। দামি। মারিয়া বলল।

ক্ষতি নেই। বের করো তাড়াতাড়ি। মারিয়া ছুটে গিয়ে ওর সবচেয়ে শৌখিন চামড়ার ঝোলা থেকে দুটোই বের করে আনল। ফ্রান্সিস সেই দামি চাদরটা একবার দেখল। তারপর মেঝেয় পাতল। মারিয়াই পাততে সাহায্য করল। ততক্ষণে শাঙ্কো নতুন পোশাকগুলি নিয়ে এল।

মারিয়া, সব পোশাক দ্রুত পরিপাটি করে ভাঁজ করে সিন্দুকে সাজিয়ে দাও। মারিয়া সব পোশাক তাড়াতাড়ি পরিপাটি করে ভাঁজ করে সিন্দুকে ভরল। ফ্রান্সিস বলল, তোমার নতুনপোশাকটা একেবারে ওপরে রাখো। মারিয়া পোশাকটা ভাঁজ করতে করতে ভাবল পোশাকটা একবারও পরা হয়নি। কিন্তু এই ভাবনাটা আমল দিল না। ওটা ভরা হলে ফ্রান্সিস ডালাটা নামাল। দেখল আঙুল তিনেক উঁচু হয়ে আছে ডালাটা। ফ্রান্সিস ডাকল শাঙ্কো তোমরা হাত লাগাও। জোরে চেপে ডালা বন্ধ করো। শাঙ্কোরা এগিয়ে এসে চেপে চেপে ডালা লাগাল। ফ্রান্সিস ডালাটার কড়া নেড়ে নীচের গোল ছ্যাঁদাটায় ঢুকিয়ে জোরে সিন্দুকটা বন্ধ করল। তারপর শাঙ্কোদের দিকে তাকিয়ে আরো কিছু পোশাক নিয়ে আসতে বলল। নতুন না হলেও চলবে। শাঙ্কোরা আগের মতোই ছুটে চলে গেল। আরো কিছু পোশাক নিয়ে এল। মেঝেয় পাতা চাদরটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল, ভালো ভাবে ভাঁজ করে পোশাকগুলি ওখানে রাখো তাড়াতাড়ি। মারিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই কাজটা সারল।

এবার একটা চৌকোনো গাঁঠরি করো। শাঙ্কো, এসো।

মারিয়া আর শাঙ্কো মিলে বেশ সুন্দর একটা গাঁঠরি করল।

গাঁঠরি বাঁধা হচ্ছে তখনই রাঁধুনি বন্ধু এল। বলল, তাড়াতাড়ি খাবে চলে এসো।

হ্যারি, শাঙ্কো, যাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

চলো, আমিও খেয়ে নেব। ক্রেভান উঠে দাঁড়াল।

আমি একেবারে পোশাক পাল্টে খাব। মারিয়া বলল।

ঠিক আছে। আমিও যাচ্ছি। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি, শাঙ্কো আর মারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসরাও খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, একটু ভালো পোশাক পরে নাও তুমি আর শাঙ্কো। তারপর শুয়ে বিশ্রাম করো। ঘুমিয়ে পড়ো না। আমি সময়মতো ডাকতে যাব।

তিনজনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। শেষ ধাপটা পেরোতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। মারিয়া নিরাপদে থাকবে। কী করতে হবে ফ্রান্সিস আগেই হ্যারিদের বলে রেখেছে।

বন্দর এলাকা, রাস্তাঘাট আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে গেল। দু'জন প্রহরী এতক্ষণ

ঘাটের পাথুরে চাতালে ঘোরাঘুরি করে বোধহয় পরিশ্রান্ত হয়ে জাহাজ-বাঁধা খুঁটির কাছে বসে গল্পগুজব করছে।

রাত একটু বাড়ল। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু তীরে ঢেউ ভাঙার শব্দ আর সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ।

এবার পায়চারি থামিয়ে ফ্রান্সিস বেরিয়ে গেল হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকতে। দু'জনেই তাড়াতাড়ি চলে এল। নতুন নয় তবে বেশ ভালো পোশাকই পরেছে দু'জনে। মারিয়া তো আগে থেকেই পোশাক পরে তৈরি। ফ্রান্সিস গাঁঠরিটা কাঁধে তুলে নিয়ে হ্যারি ও শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, সিন্দুকটা ধরাধরি করে নিয়ে চলো ডেক-এ। পারবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, শাঙ্কো বলল। গাঠরিটা কাঁধে নিয়ে ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে ক্রেভান বিড়বিড় করে কী বলতে লাগল। বোধহয় ঈশ্বরের কাছে সকলের জন্যে আশীর্বাদ চাইছিল। বেশ ভারী সিন্দুকটা। তবু শাঙ্কো আর হ্যারি দু'দিকের লোহার কড়া ধরে নিয়ে চলল। ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিসের কাছে ,সে হ্যারি বলল, সিন্দুকটা নৌকোসুদ্ধু ডুবে যাবে না তো?

না। আমার দেখা হয়ে গেছে। সমুদ্র আজ শান্ত। ঢেউয়ের বড়রকম ঝাপ্টা লাগার সম্ভাবনা নেই। তবু তোমরা তীরের কাছাকাছি থেকে নৌকো চালিয়ে যাবে। যদি নৌকো ডুবে যায় চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করবে না। মারিয়া ভালো সাঁতার জানে। মারিয়া জলে ভেসে থাকবে। তোমরা দু'জন নৌকো সোজা করে জলের তলা থেকে সিন্দুক আর গাঁঠরি নৌকোয় তুলে নেবে। তবে মনে হয় এত সব করতে হবে না। শাঙ্কো, সাবধানে নৌকো চালাবে। দেরি হোক। ভোর হবার একটু আগেই যা বলেছি সেভাবে কাজ সারবে। সকালের মধ্যেই শাঙ্কো নৌকো নিয়ে ফিরে আসবে। শেষ রাতে এই অঞ্চলে জেলেদের নৌকো মাছ ধরতে চলাচল করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ হবে না। খুব অন্ধকার আজ। নজরে পড়তে পড়তে তীরে নেমে যেতে পারবে। ফ্রান্সিস কথাগুলি যেতে যেতে বলে গেল।

হালের কাছে এসে ওরা দেখল বিনোলারা কয়েকজন ডেক-এ শুয়ে আছে। শাঙ্কো চাপাস্বরে ডাকল, বিনোলা! বিনোলা ঘুমোয়নি। রাতের অভিযানের কথা শাঙ্কোর কাছে আগেই শুনেছে। বিনোলা আর এক বন্ধুকে নিয়ে মাথা নিচু করে শাঙ্কোদের কাছে এসে সিন্দুকটা ধরে নিয়ে চলল।

ততক্ষণ ফ্রান্সিস হালের কাছে চলে এসেছে। চারদিক ভালো করে নজর বুলিয়ে নিয়েছে। জাহাজঘাটের মশালের আলোয় অস্পষ্ট দেখে নিয়েছে প্রহরী দু'জন তখনও ঘাটের ওপর ঘোরাঘুরি করছে। বন্দর শহরের রাস্তা, বাড়িঘর ঘন অন্ধকারে

ডুবে আছে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হল ফ্রান্সিস। এবার গাঁঠরি, সিন্দুক নিয়ে নিঃশব্দে নীচে জাহাজে বাঁধা নৌকোটা নামাবে বন্ধুদের সাহায্যে। শাঙ্কো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে সিন্দুকটা আস্তে আস্তে ঢেউয়ের ঠেলায় দুলতে থাকা নৌকোর মাঝখানে রাখল। অন্ধকারে খুব অস্পষ্ট দেখল নৌকোর গলুই থেকে জল অন্তত ছ'সাত আঙুল নীচে। ও অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। বিনোলা গাঁঠরি নামিয়ে আনল। মারিয়া আর হ্যারিও আস্তে আস্তে নিঃশব্দে নৌকোর মাঝখানে নামল। শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল, দু'জন একপাশে। হ্যারি ও মারিয়া সে ভাবেই বসে পড়ল। জাহাজে বাঁধা দড়ি ধরে ধরে অন্ধকারে দড়ির মুখটা খুলে দিয়েই শাঙ্কো নৌকোর আর এক কানায় বসে পড়ল। টাল খেয়ে নৌকোটা সরে এল। শাঙ্কো দাঁড় তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে এতটুকু নড়াচড়া না করে নিঃশব্দে বইতে লাগল। নৌকো জাহাজ থেকে দূরে সরে এল। হ্যারি, মারিয়ার কাছে নৌকো চড়ার অভিজ্ঞতা নতুন কিছু নয়। ওরা দু'জনে চুপ করে নিথর বসে রইল। নৌকো শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলল জেলেদের ঘাটের দিকে। আজও জেলেদের নৌকো জলে নামানো হয়নি। তীরের কাছাকাছি নৌকো আনল শাঙ্কো। তারপর খুব সাবধানে দাঁড় বাইতে লাগল। জেলেপাড়ার এলাকা ছাড়িয়ে আসতেই অন্ধকারে আবছা দেখল দুটো জেলেদের নৌকো গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। জেলেরা শাঙ্কোদের দেখতে পেল না। অস্পষ্ট দেখলেও মাছধরা নৌকো বলেই ভাবত। তীরের ধার দিয়ে নৌকো চলল। হাওয়াও বেশ নিস্তেজ। মারিয়া আকাশের দিকে তাকাল। লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে। টুকরো টুকরো সাদাটে মেঘ স্তব্ধ হয়ে আছে ফিসফিস করে বলল, হ্যারি, দেখো ওপরে। কী সুন্দর আকাশ!

হ্যারি মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলল, এ তো আমাদের পরিচিত দৃশ্য। তবু যতবার দেখি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই বিরাট বিশ্বে নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়। অথচ দুঃখ এই পৃথিবীর সব মানুষই তো এই রহস্যময় উদার আকাশ দেখে। অথচ ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রবঞ্চনা হত্যা লুঠ রক্তপাত নিয়ে ব্যস্ত তাদের মনে কোনো দাগই কাটে না।

সত্যি। মারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শাঙ্কোরা এবার তীরভূমির একটু জংলা এলাকায় তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলল। বেশ কিছুটা আসার পর আবছা দেখল উঁচু তীরভূমিতে পাশাপাশি দুটো বড় পাথর পড়ে আছে। তার মাঝখানে ঘাস নেই। শাঙ্কো নৌকো উল্টোদিকে, বেয়ে প্রায় নিশ্চল করে ফেলল। ফিসফিস করে বলল, হ্যারি, দেখো তো এইটা কি একটা ঘাট? মনে হচ্ছে এখান দিয়ে লোক চলাচল করে।

হ্যারিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, হ্যাঁ, একটা সাদাটে জায়গা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কাছেই মানুষের বসবাস আছে। নৌকো ভেড়াও।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকো ভেড়াল। তারপর নৌকো থেকে হাত দশেক দূরের বালিয়াড়িতে নামল। দ্রুত ওপরের দিকে ছ'সাত পা গিয়ে আবার দ্রুত ফিরে এল। ফিসফিস করে বলল, পায়ে-চলা পথের আভাস দেখলাম।

এখানেই নামব। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে বলল, রাজকুমারী, নেমে আসুন। মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর শাঙ্কোর বাড়ানো হাত ধরে তীরের বালি-কাদার মধ্যে নামল। তারপর হ্যারিও একইভাবে নামল।

শাঙ্কো ডান হাত দিয়ে সিন্দুকের একপাশের কড়াটা ধরল। অন্য পাশে হ্যারি ধরল। তারপর উঁচু তীরভূমির দিকে আবছা অন্ধকারে উঠতে লাগল। পেছনে মারিয়া। দুটো পাথরখণ্ডের মাঝখান দিয়ে উঠে অস্পষ্ট দেখল একটা সাদাটে পায়ে-চলা রাস্তা পুবমুখো চলে গেছে। দু'পাশে কালো কালো গাছ-গাছালি। কিছুটা দূরে ডানদিকের অন্ধকারে ডুবে আছে একটা বাড়ি। পাথরের বাড়ি। সামনে টানা বারান্দা। ফুলের বাগান। বোঝা গেল অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। হ্যারি বলল, এই বাড়িতে নয়। এরা বড়লোক। সাবধানী।নানা প্রশ্ন করবে। এগিয়ে চলো। ঐ বাড়িটা পার হয়ে কিছুটা এগোতে বাঁ দিকে একটা বাড়ি দেখা গেল আবছা অন্ধকারে ডুবে আছে। ছাউনি শুকনো ঘাস-পাতার। তবে খুব শক্ত করে সমান করে বাঁধা। হ্যারি ঐ বাড়ির দিকে চলল। ছোট ছোট গুল্মের বেড়া। কয়েকটা ফুলগাছ। ওসব পার হয়ে হ্যারি বন্ধ দরজার সামনে সিন্দুকটা রেখে একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বন্ধ দরজায় আঙুল ঠুকে শব্দ করল। একবার। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আর একবার আঙুল ঠুকতেই ডান পাশের কাঠের জানালাটা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ চাদর গায়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। বললেন, কে?

একটু বাইরে আসবেন। কিছু বলব। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

ভদ্রলোকটি মাথা সরালেন। একটু পরেই দরজা খুলে বাইরে এলেন। অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী চাই?

দেখুন আমরা বিদেশি বণিক। কাপড়ের তৈরি পোশাক বিক্রি করতে এসেছি। হ্যারি বলল।

জাহাজে চড়ে? ভদ্রলোক বললেন।

হ্যাঁ। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল।

বন্দরে তো থাকার মতো সরাইখানা আছে। ভদ্রলোক বললেন।

তা আছে। কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি প্রহরীদের নিয়ে। বেশ কিছু মেতাকালেশ মানে স্বর্ণমুদ্রা চায়। আগেও তো ব্যবসার কাজে এসেছি। এখানকার সরাইখানায়

থেকেছি। কিন্তু প্রহরীদের অন্যায় দাবি মেটাতে গিয়ে ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। তাই জাহাজ থেকে কিছু মালপত্র নৌকোয় চাপিয়ে লুকিয়ে এখানে এসেছি। কয়েকদিন থাকব। যদি আপনি আশ্রয় দেন তাহলে বাধিত হব। হ্যারি বলল।

একটু ভেবে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, আসুন, তবে এখানে উজির ইয়েপুদার প্রহরীরা কিন্তু মাঝে মাঝে টহল দিয়ে যায়। বিদেশী দেখলে সন্দেহ করে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন।

তখন না হয় লুকিয়ে পড়ব। হ্যারি বলল।

ঠিক আছে। আসুন। গৃহস্থ ভদ্রলোক বললেন। উনি সরে দাঁড়ালেন। তিনজনে সিন্দুক, গাঁঠরি নিয়ে ঢুকল। অন্ধকার ঘর। ভদ্রলোক চকমকি ঠুকে ঘরের এককোণে একটা তেলের দীপ জ্বাললেন। ছোট ঘর। একপাশে একটা কাঠের পাটাতনে ছোট বিছানামতো। একটু অগোছালো। আলোতে এবার মারিয়াকে দেখে একটু চুপ করে থেকে বললেন, ইনি কে?

আমার স্ত্রী। ব্যবসার জন্যে তো অনেক জায়গায় যেতে হয়, উনি সঙ্গে থাকেন। আমাদের দেখাশুনো করেন। হ্যারি বলল।

ছেলেপুলে? ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন।

মাদ্রিদের শহরতলিতে আমার কাপড়ের ব্যবসা। ওখানেই দিদিমার কাছে ওরা থাকে। হ্যারি বলল।

স্পেনই তো আপনাদের দেশ। পোর্তুগিজ ভাষা তো ভালোই বলছেন।

পাশাপাশি দেশ। ব্যবসা করি। কথাবার্তা তো চালাতে হয়।

তা ঠিক। ভদ্রলোক বললেন।

তা আপনার নামটা জানতে পারি? হ্যারি বলল।

নিশ্চয়ই। আমার নাম সার্মেন্তো। মুস্কিল হল আমার তো বেশি বাড়তি ঘর নেই। আপনারা তিনজন মানে—এখানে—

না-না। শাঙ্কোকে দেখিয়ে হ্যারি বলল, ও শাঙ্কো আমাদের কর্মচারী। ব্যবসার মালপত্র ওই সব দেখেটেখে। শাঙ্কো এখুনি জাহাজে ফিরে যাবে। আরও মালপত্র তো আছে। সেসবও তো আনতে হবে। আর এই ঘরে আমরা বেশ থাকতে পারব। উনি—মারিয়া, অন্দরে কোথাও থাকবেন। কোনো অসুবিধে নেই। হ্যারি বলল।

হ্যাঁ হ্যাঁ যদি ওর কোনো অসুবিধে না হয়। সার্মেন্তো বললেন।

না না। কয়েকটা দিন তো! ভালোই থাকবেন। হ্যারি বলল। তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, শাঙ্কো, ডন সার্মেন্তোকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা দাও। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করল।

সেকি! আপনারা আমাদের অতিথি। সার্মেন্তো বললেন।

এ দুটো আপনাকে নিতেই হবে। ব্যবসা করি তো। এরকম আতিথেয়তা তো মূল্য দিয়েও সরাইখানায় পাব না। এই সামান্য খরচের মূল্য আপনাকে নিতেই হবে। হ্যারি বলল।

ঠিক আছে। এত করে বলছেন। সার্মেন্তো তারপর মুদ্রা দুটো নিয়ে বললেন, আপনারা বিশ্রাম করুন। ভোর হতে খুব দেরি নেই। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ভিতরে এসে শুতে পার।

একটু পরে যাচ্ছি। বিছানাটা একটু গুছিয়ে দিয়ে যাই। মারিয়া বলল।

বেশ। সার্মেন্তো বেশ খুশি হলেন। উনি চলে গেলে মারিয়া বলল, বিছানা ঢাকা চাদরটাদর তো কিছু আনতে পারিনি।

দরকার নেই। যে কাপড়টা আছে ওটাই একটু গুছিয়ে দিন। হ্যারি বলল।

তাহলে আমি যাচ্ছি। ভোর হবার আগেই জাহাজে পৌঁছতে হবে। শাঙ্কো বলল।

হ্যাঁ হ্যাঁ। চলে যাও। ফ্রান্সিসকে বলো ভালো আশ্রয় পেয়েছি। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো বাইরের আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে এল। দ্রুত পায়ে সমুদ্রতীরের দিকে চলল।

নৌকো চালাতে চালাতে শাঙ্কো দেখল আকাশের তারাগুলি উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুব আকাশ ফর্সা হয়ে গেল। যখন নৌকো জাহাজে বেঁধে দড়িদড়া বেয়ে জাহাজে উঠছে তখন পুব দিগন্তে কমলা রঙ ছড়িয়ে সূর্য উঠল। শাঙ্কো এসে ফ্রান্সিসকে সব বলল। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

ভাইকিংদের সকালের খাবার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। সেই সেনাপতির সঙ্গে সাত-আটজন যোদ্ধা জাহাজঘাটে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে এসে দাঁড়াল। সিনাত্রা রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল, পাটাতন ফেল। তল্লাশি হবে। ততক্ষণে আরও দু'জন বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা তাড়াতাড়ি পাটাতন তীরে পেতে দিল। যোদ্ধাদের নিয়ে সেনাপতি জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় বলল, তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাও। মূল্যবান কিছু পেলেই এসে আমাকে বলবে। যোদ্ধারা তল্লাশির কাজে নেমে পড়ল। জোর তল্লাশি শুরু হল। ছোট্ট কেবিন ঘরগুলি, রান্না ও খাবার ঘর, বাতিল পাল-দাঁড় রাখার ঘর, ফাঁকা অস্ত্রঘর, কাঠের তক্তা-পেরেক রাখার স্থান, মেরামতির কাজের জন্যে ব্যবহৃত ঘর। দু'জন যোদ্ধা এল ফ্রান্সিসের ছোট্ট কেবিন ঘরে। ফ্রান্সিস আর ক্রেভান বিছানায় চুপ করে বসেছিল। মারিয়ার

ব্যাগ, ঝোলা-টোলা খুলে মেয়েদের পোশাক পেল। একটু অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাতেই ফ্রান্সিস বলল, ওসব আমার স্ত্রীর পোশাক। গত মাসে মারা গেছেন। এবার সেই ময়লা ছেঁড়া পালের গাঁঠরি দেখল। কাছে গিয়ে একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসকে জিগ্যেস করল, এটা কী?

অভিশপ্ত ধনসম্পদ। ফ্রান্সিস নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল। যোদ্ধাটি অবাক। কথাটার অর্থ ঠিক বুঝল না। কোমরে ঝোলানো তরোয়াল বার করল। গাঁঠরিতে কয়েকটা খোঁচা দিল। ছোট্ট ছেঁড়া দিয়ে কিছু বেরিয়ে এল না।

ঠাট্টা করছ, অ্যাঁ? যোদ্ধাটি বলল।

যদি ঠাট্টা মনে কর তবে তাই। ফ্রান্সিস একইরকম উদাস ভঙ্গিতে বলল।

যত্ত সব। নাক কুঁচকে বলে উঠল। তারপর চলে গেল। সব যোদ্ধা তল্লাশির শেষে ডেক-এ বসে জড়ো হল।

দামি কিছু পেলে? সেনাপতি বলল।

কিছুই না। একজন বলল।

ভিখিরির দল। আর একজন বলল।

কোমরবন্ধনীগুলো খুলিয়ে হয়তো কিছু মুদ্রাটুদ্রা পাওয়া যেত। তবে সোনার নয়। আর একজন বলল।

যে দু'জন ফ্রান্সিসের কেবিন ঘর তল্লাশি করেছিল তাদের একজন বলল, একটা ময়লা ছেঁড়া পালের গাঁঠরি দেখলাম।

তাতে কী আছে? সেনাপতি জানতে চাইল।

ছেঁড়া কাপড়জামা বোধহয়। যোদ্ধাটি বলল।

খুলে দেখেছ? সেনাপতি বলল।

ঐ নোংরা কাপড়ের বস্তা?

বস্তা নয়। কিছু বেঁধে রাখা হয়েছে। চলো তো। সেনাপতি সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে ঐ যোদ্ধা দু'জনও চলল। ফ্রান্সিস একই ভাবে বিছানায় বসেছিল। ক্রেভান মৃদুস্বরে ডাকল, ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। ঘরে ঢুকে সেনাপতি বলল, এই গাঁঠরি ঘরের মধ্যে রেখেছ কেন?

পছন্দ হলে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। ফ্রান্সিস নির্বিকারভাবে বলল।

ঠাট্টা রাখো। কী আছে এতে যে বেঁধে রেখেছ?

বলেছি তো অভিশপ্ত ধনসম্পদ—রক্তে ভেজা। ফ্রান্সিস নির্বিকার।

সেনাপতি চড়া গলায় বলে উঠল, অ্যাই, খোল গাঁঠরিটা।

দু'জন যোদ্ধা লাফিয়ে এসে গাঁঠরির মুখ টেনে টেনে খুলে ফেলল। দু'চারটে

অলঙ্কার গড়িয়ে পড়ল। অন্য যোদ্ধাটি টান মেরে মুখটাই খুলে ফেলল। কাঠের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল সোনার চাকতি, মুদ্রা, অলঙ্কার, মণি-মুক্তো। ঝিকিয়ে উঠল হীরে বসানো গলার হার। সেনাপতি, যোদ্ধা দু'জন হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। অল্পক্ষণ। তারপরই ফ্রান্সিসের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে সেনাপতি বলল, মিথ্যে বলে পার পাবে ভেবেছিলে?

আমি তো মিথ্যে বলিনি। যা সত্য তাই বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

এই সোনাটোনা, অলঙ্কার—তোমরা যে জলদস্যুতা কর এটাই তো বড় প্রমাণ। সেনাপতি বেশ গম্ভীর গলায় বলল।

লুঠ-ডাকাতি করলে এসবের ওপর মায়া থাকত নিশ্চয়ই, লুকোবার চেষ্টা করতাম। এভাবে সকলের চোখের সামনে ঘরে রেখে দিতাম না। ফ্রান্সিস বলল।

ওসব দরবারে গিয়ে শুনিও। তোমাদের সবাইকে বন্দী করা হল। দু'জন যোদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, গাঁঠরি বেঁধে নিয়ে চলো।

ফ্রান্সিস এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, একটা অনুরোধ। সবাইকে বন্দী করে বেঁধে নিয়ে চলুন। কিন্তু এই বৃদ্ধ এখানেই নেমে যাবে। অন্য একজন আমাদের বৈদ্য—বয়স্ক। তাকে এই জাহাজেই থাকতে দিন। তাকে ফেলে তো আমরা পালাতে পারব না।

একটু ভেবে নিয়ে সেনাপতি বলল, তোমাদের অনুরোধ মাননীয় উজিরকে জানাব। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

বেশ। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

সবাই ডেক-এ উঠে এসো। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিসরা ওপরে ডেক-এ উঠে আসতে লাগল। দু'একজন ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে বলল, এভাবে হার মানবে?

অস্ত্রঘরে একটা ছোরাও পড়ে নেই। আমার একটা মাত্র তরোয়াল বিছানার নীচে লুকোনো আছে। খালি হাতে লড়াই হয়? চলো, দেখা যাক সব।

আগে-পিছে যোদ্ধাদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে এল। সদর রাস্তা দিয়ে পুবমুখো চলল। পোতো বন্দর শহর ছাড়িয়ে হেঁটে চলল সবাই। রোদের তেজ বাড়ছে। দু'পাশে গম জলপাইয়ের ক্ষেত-খামার। রাস্তার লোকজন কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল। ভাইকিংরা কোনো কথা বলছিল না। হেঁটে চলল।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর কাঠ আর পাথরের ঘর-বাড়ি দেখা গেল। রাজধানী পৌরো শহরে এসে পৌঁছল সবাই। বাঁ দিকে কিছুদূরে দেখা গেল একটা মাথাভাঙা পাথরের দুর্গ। আগে অটুট ছিল উঁচু দুর্গটা। রাস্তায় ঘোড়ায় টানা গাড়ি, বাজার এলাকায়

দোকানপাট, লোকজনের ভিড়। কেনাকাটা চলছে। বেশ গুঞ্জনধ্বনি। ডান দিকে একটা লম্বাটে পাথর ও কাঠের বড় বাড়ি। তার সামনে এসে সেনাপতি সবাইকে থামবার ইঙ্গিত করল। বিরাট কাঠের দরজা। তার কোথাও কোথাও কুঁদে কুঁদে নানা নকশা তোলা। বোঝা গেল খলিফা হাকিমের প্রাসাদ। প্রবেশপথের ধারেকাছে কোনো প্রহরী নেই। লোকজন ঢুকছে বেরোচ্ছে নির্বিবাদে। ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল। সেনাপতি আছে। যোদ্ধারা আছে। অথচ প্রাসাদে কোনো দ্বাররক্ষী নেই। এবার ফ্রান্সিসরা সবাই অবাক হল যখন দেখল মূল দরবারের প্রবেশদ্বারেও কোনো দ্বাররক্ষী নেই। অদ্ভুত ব্যাপার। শাসক খলিফা হাকিম আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখেননি? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাল। পাথরের গাঁথনিতে তৈরি লম্বাটে বড় ঘর। দু'পাশে বড় বড় জানালা। জানালার চারপাশে দেয়ালে সুন্দর কারুকাজ। নানা রঙের। কালো কাঠের গদিপাতা আর তাতে সোনা-রুপোর গিলটি করা। একটি আসনে খলিফা হাকিম বসে আছেন। একটু মোটা। মুখে অল্প দাড়ি গোঁফ। পরনে ঢোলা হাতা ঘন হালকা সাটিন্ কাপড়ের পোশাক। মাথায় নীল কাপড়ের পাগড়ির মতো। কপালের ওপরেই পাগড়িতে বসানের একটা বড় গোল হীরে। আসনের নীচে একপারে সুন্দর কাজ করা আলবোলা রাখা লম্বা নলটায় সোনা-রুপোর কাজ করা। খলিফা আলবোলার নল মুখে নিমীলিত চোখে বসে আছেন। পাশের আসনে ইয়েপুদা, অন্য আসনে সেনাপতি বসে আছে। বেশ ভিড় দরবারে। একজন মোটা মতো লোক ঢোলা কালো পোশাক, মুখে অল্প দাড়ি-গোঁফ। গানের সুরেলা সুর টেনে থেমে থেমে বলে থামতেই দরবারে প্রশংসার ঢেউ উঠল। কি হচ্ছে ফ্রান্সিস বুঝল না। সিনাত্রা থাকলে হয়তো বলতে পারত। ক্রেভান আর ভেনকেও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আসতে হয়েছিল। ফ্রান্সিস ক্রেভানের কাছে সরে এল। বলল, ক্রেভান, কী ব্যাপার বলুন তো?

আরবী ভাষায় মুখে মুখে কবিতা বলার আসর চলছে।ঐ দেখো আর একজন কবিতা বলা শুরু করল। এইসব কবি তাকে বলে গিজেল। খলিফা হাকিমদের সম্মান করেন। বলেছিলাম না কোনো কোনো মুর শাসক গান, কবিতা ভালোবাসেন। অর্থাৎ যাকে বলে কাব্য-প্রেমিক। ক্রেভান মৃদুস্বরে বলল। পর পর কয়েকজন এইভাবে মুখে মুখে গিজেল বলে গেল। প্রশংসার উঠল শ্রোতাদের মধ্যে।

ফ্রান্সিস ভাবল—হ্যারি, মারিয়া থাকলে খুশি হত। কবিতার অর্থ হ্যারি কিছু কিছু বুঝত। এই সুন্দর পরিবেশটা ভালো লাগত ওদের। শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, এ কেমন রাজদরবার? অভিযোগ নেই, বিচার নেই, শাস্তি নেই। একজনের বলা শেষ হলে ইয়েপুদা আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। চোখেমুখে প্রচণ্ড বিরক্তি। খলিফা হাকিমের কাছে এসে মাথা নিচু করে একনাগাড়ে কিছু বলে গেল।

খলিফা হাত তুললেন। আস্তে আস্তে শ্রোতারা বেরিয়ে গেল। দরবারে ভিড় কমে গেল। খলিফা ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর পোর্তুগিজ ভাষায় বললেন, তোমরা ভাইকিং দেশ থেকে এসেছ। তোমাদের জাহাজে মূল্যবান ধনসম্পত্তি পাওয়া গেছে। তোমরা লুঠ কর, ডাকাতি কর। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল, মাননীয় খলিফা, এই অভিযোগ সত্য নয়। তারপর ফ্রান্সিস অল্প কথায় হ্যারল্ডের ঘটনাটা বলল।

বিশ্বাস করলাম। আমি কাউকে অবিশ্বাস করি না। আচ্ছা, একটা কথা, তোমাদের দেশে কবিতা, গানের প্রচলন আছে? খলিফা জানতে চাইলেন।

দেখুন মান্যবর খলিফা—আমি কাঠখোট্টা মানুষ। সিনাত্রাকে দেখিয়ে বলল, ও আমার বন্ধু সিনাত্রা। আমাদের দেশের গান গায়। নিজে গানও বাঁধে।

খলিফা হাকিম খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, তাহলে তো শুনতে হয়। সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, শোনাও তো সিনাত্রা। অসহায় ভাবে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকিয়ে সিনাত্রা বলল, মহামান্য খলিফা, আমাদের ভাষা তো আপনি বুঝবেন না।

সুরটা তো বুঝব। আর অর্থটা পোর্তুগিজ ভাষায় বলবে। খলিফা বললেন।

সিনাত্রা বলল, আমার অল্প বয়সে আমাদের বাড়ির কাছে একজন কবি ছিল। সকলে তাকে পাগল বলত। তার একটা কবিতা বলছি। সিনাত্রা মনে করে নিয়ে আস্তে আস্তে কবিতাটা সুর করে বলে গেল। খুশি হয়ে খলিফা বলে উঠলেন, বাঃ। সুন্দর তো! বড় সুরেলা তোমার কণ্ঠ। এবার অর্থটা বলো।

সিনাত্রা আস্তে আস্তে অর্থটা বলল—

সূর্য আছে চন্দ্র আছে
অস্তে গেলে অন্ধকারও আছে,
সুখও আছে দুঃখও আছে
বন্ধু হে, কোনটা নেবে?
আমি বলি—দুটোই নাও।
সবই তো ঈশ্বরের দান।

খলিফা হাকিম আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ! সুন্দর কবিতা তো!

এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। একটু মাথা নুইয়ে বলল, মান্যবর, একটা আর্জি।

বলো। খলিফা বললেন।

আমাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ আছেন তিনি এখানে এই দেশেই থাকবেন।

অন্যজন আমাদের চিকিৎসক। বয়স্ক মানুষ। আমাদের বিচারের জন্যে বন্দী করা হোক, কিন্তু তাকে জাহাজে থাকতে দেওয়া হোক।

খলিফা ইয়েপুদার দিকে তাকালেন। ঠিক আছে। তাই হবে।

ইয়েপুদা কেন জানি আপত্তি করল না। ফ্রান্সিস এত সহজে মিটবে ব্যাপারটা কল্পনাও করেনি। খলিফা হাকিম বলে গেলেন। সেনাপতিকে ডেকে ইয়েপুদা কী সব নির্দেশ দিল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল, চলো।

কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

গেলেই দেখতে পাবে। সেনাপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

বেশ। ফ্রান্সিসরা প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এল। আগে-পিছে যোদ্ধার দল।

ক্রেভানকে ডেকে সেনাপতি বলল, এই বুড়ো, তুই যেখানে খুশি চলে যা। ভেনকে ডেকে বলল, তুই জাহাজে গিয়ে থাকবি। পালাবার চেষ্টা করবি না। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো সব।

প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়াল সবাই। ক্রেভান হাতে একটা কাপড়-চোপড়ের ঝোলা এনেছিল। সেটা শাঙ্কোর হাতে দিয়ে প্রায় ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ক্রেভানের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল, ফ্রান্সিস, তোমার মতো মানুষ এই বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত দেখিনি। ঈশ্বরের কাছে তোমার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। ফ্রান্সিস আস্তে ক্রেভানের পিঠে চাপড় দিল। বলল, আমরা তো এখন জাহাজ থেকে নির্বাসিত। কী অবস্থায় পড়ব জানি না তবু এখানে থাকতে অসুবিধে হলে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবেন। চোখ মুছে ক্রেভান ঝোলা হাতে আস্তে আস্তে চলে গেল। ভেনও এগিয়ে এসে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। চড়া রোদের মধ্যে যোদ্ধাদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল।

রাস্তায় লোকজনের ভিড়। দোকানপাটে কেনাবেচা চলছে। ভাইকিংরা এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে চলল। কিছুদূর যেতেই আগে-দেখা সেই পাথর গাঁথা আধভাঙা দুর্গটা দেখল। তার পাশেই পারপর দুটো পাহাড়। খুব উঁচু নয়। গাছ-গাছালি আছে। সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়। চুড়োয় অবশ্য বেশি গাছ-গাছালি নেই। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল পাহাড় দুটোর মাঝখানে একটা সরু গিরিসংকট। উপত্যকার মতো। বিস্তৃত নয়। সেই গিরিসংকটের কাছে এসে সেনাপতি বলে উঠল, দাঁড়াও সব। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে কিন্তু দু'জন সশস্ত্র প্রহরীকে দেখা গেল। দু'জনের পেছনে লোহার বেশ কয়েকটা গরাদ পোঁতা। মাঝখানে লোহার দরজা মতো। তাতে একটা বড় তালা ঝুলছে।

ফ্রান্সিস, মনে হচ্ছে কয়েদ ঘর। শাঙ্কো বলল।

ঘর নয়। অদ্ভুত ব্যবস্থা কয়েদ রাখার। এর মধ্যেই বন্দীজীবন কাটাতে হবে। নীচের মেঝে পাথুরে, ঝড়বৃষ্টির সময় মাথার উপরে থাকবে শুধু দু'পাশের ঝুঁকে পড়া গাছের ডাল-পাতা। কী অদ্ভুত ব্যবস্থা! ফ্রান্সিস ঐ গিরিসংকটটা দেখতে দেখতে বলল।

এখান থেকে পালানো যাবে না ফ্রান্সিস। সিনাত্রা বেশ ভীত গলায় বলল।

আগেই হাল ছেড়ো না। দেখা যাক সব ব্যবস্থা। ফ্রান্সিস বলল।

একজন প্রহরী এগিয়ে এসে কোমর থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিল। তারপর ফ্রান্সিসদের ঢুকতে ইঙ্গিত করল।

তাহলে বন্দীই হলাম। বিনোলা মৃদুস্বরে বলল। ফ্রান্সিস বলল, ইয়েপুদাই সর্বেসর্বা। খলিফার কোনো ক্ষমতাই নেই। কবি আর কবিতা নিয়ে মশগুল। তাই মানুষ হিসেবে ভালো। দেখা যাক কয়েকটা দিন। ফ্রান্সিস ঢুকতে ঢুকতে মৃদুস্বরে বলল।

ভেতরে সরাসরি সূর্যালোক পড়েছে। এখানে-ওখানে ঝুঁকে-পড়া গাছের ছায়া। দেখা গেল আগে থেকে বন্দী আট-দশজন লোক শুয়ে-বসে আছে। দু'জন মুর, বাকিরা শ্বেতকায়। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মেঝে। ফ্রান্সিস সেখানেই বসে পড়ল। ভাইকিং বন্ধুরাও বসে পড়ল। বন্দী রাখার এই ব্যবস্থায় সবাই অবাক। এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। কিছুটা দূরে গরাদ পোঁতা। পালাবার সব রাস্তাই বন্ধ। দু'পাশে প্রায় খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। এক টুকরো ঘাসও নেই। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। ওপরে দুপুরের আলোকোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক চিন্তা মাথায়। হ্যারি, মারিয়া নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে সত্যি কিন্তু বেশি দিন তো থাকতে পারবে না। শাঙ্কোও যেতে পারবে না। ব্যবসার কাজ ফেলে হ্যারি, মারিয়া ঘরে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে, 'কর্মচারীও মালপত্র নিয়ে আসছে না। স্বাভাবিকভাবেই সেই সার্মেন্তো নামের ভদ্রলোকের মনে সন্দেহ হতে পারে। হ্যারিরা বিপদে পড়তে পারে। হাতে সময় খুব কম।

গরাদ বসানো দরজায় শব্দ হল। দু'জন প্রহরী আর একজন রাঁধুনি খাবার নিয়ে ঢুকল। চিনেমাটির বড় প্লেটে হাতে হাতে খাবার দেওয়া হল। বুনো আনাজ-টানাজ নয়। চাষ করা জমির আনাজপাতি। রান্নাও সুস্বাদু। সঙ্গে সামুদ্রিক মাছ। ফ্রান্সিসরা মোটামুটি পেট পুরে খেল। একটা বেশ বড় মাটির জালা থেকে জল খেল। প্রহরীরা এঁটো প্লেট নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস এবার ভালো করে সব বন্দীদের দেখল। সবার শরীরই বেশ রোগাটে। এমনকি মুর দু'জনেই কেমন রক্তশূন্য চোখমুখ। বুঝল এই পরিবেশে কেউ সুস্থ থাকতে পারে না। ইয়েপুদা অত্যন্ত ধুরন্ধর। ও বন্দীদের

হত্যা করে না। কিন্তু এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, রোদে-জলে, প্রচণ্ড গরমে, শীতে এমনিতেই বন্দীরা অসুস্থ হয়ে মারা যাবে। অসুখে মারা গেলে ওর ঘাড়ে কোনো দোষই পড়বে না।

সারাদিন রোদে পুরে বিকেলে একটু স্বস্তি পেল ফ্রান্সিসরা। খুব হাওয়া ছুটেছে। সন্ধে হল। ফ্রান্সিস পাথরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিল। পিঠের এখানে-ওখানে ছুঁচোলো পাথর যেন হাড়ে বিঁধে যাচ্ছিল। ও ডাকল, শাঙ্কো, শোনো। শাঙ্কো শুয়েছিল। উঠে এগিয়ে এল। বন্দীদের দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল, ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলো তো। জেনে নাও ওরা কী অপরাধে বন্দী হয়েছে। এখানে থাকতে থাকতে কী অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওদের সব কথা জানতে হবে। শাঙ্কো বন্দীদের কাছে গিয়ে গল্প জমাল। নিজের কথা বলল। তারপর খবরাখবর নিতে লাগল। কিছুক্ষণ শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ফিরে যাবে বলল, ঐ মুর যুবক দু'জন ভাই। গুপ্তচর এই অভিযোগে উজির বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সবাই মরেছে। ওরা গ্রামের দিকে গিয়েছিল বলে বেঁচে গেছে। কিন্তু পরে ধরা পড়েছে।

হ্যাঁ, গুপ্তচর এই বদনাম সবরকম অত্যাচার চালানো যায় হত্যাকেও অপরাধ বলে গণ্য করবে না। অন্যদের কথা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা কেউ স্পেন, কেউ পোর্তুগালের মানুষ। একজন ফরাসি, নাম আস্তাসো। ঐ আস্তাসোই এখানে সব থেকে বেশিদিন বন্দী হয়ে আছে। শাঙ্কো বলল।

হুঁ, ওর সঙ্গে কথা বল অনেক কিছু জানা যাবে। প্রহরীদের সামনে নয়। বলে এসো রাতে খাওয়া সেরে ও যেন আমাদের কাছে আসে। তখন কথা হবে।

শাঙ্কো চলে গেল। আস্তাসোকে ফ্রান্সিসের কথা বলল। আস্তাসো বলল বেশ। তোমার বন্ধু বুদ্ধিমান। প্রহরীদের নজর আমি এড়িয়ে যাব।

ওদিকে বিকেলে হ্যারি ও মারিয়া চুপ করে ছোট বিছানাটায় বসেছিল দু'জনেই বেশ চিন্তান্বিত। শাঙ্কো এল না। ফ্রান্সিসদের কোনো খবরই পাওয়া গেল না। একসময় হ্যারি বলল, সন্দেহ নেই। ঐ উজির ইয়েপুদা ফ্রান্সিসদের জাহাজ তল্লাশি করিয়েছে। হ্যারল্ডের সেই ধনসম্পদ ওরা পেয়েছে। কাজেই ফ্রান্সিসদের রেহাই দেয়নি। নিশ্চয়ই বন্দী করেছে।

চিন্তা হচ্ছে ফ্রান্সিসরা বন্দীদশা থেকে পালাতে পারবে কিনা। মারিয়া বলল।

সব নির্ভর করছে ঐ খলিফা হাকিমের ওপর। তিনি কেমন মানুষ তা তো জানি না যদি উজিরের মতো ক্রূরপ্রকৃতির হন তাহলে ফ্রান্সিসদের ভীষণ বিপদে পড়তে হবে। হ্যারি বলল।—যাকগে। আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না ফ্রান্সিস, শাঙ্কো

নিশ্চয়ই বিপদ-আপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। মুসকিল হয়েছে। আপনি সমুদ্রতীরে গিয়ে সমস্ত দেখে আসুন।

নাঃ। ভালো লাগছে না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

না-না। মন খরাপ করবেন না। বীরের পক্ষে সেটা ভালো না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান। বেশি দূরে তো নয়। জানেনও। তবে সাবধান। মুর যোদ্ধারা নাকি এদিকে টহল দিতে আসে। কেউ যেন আপনাকে দেখতে না পায়। আর অন্ধকার হবার আগেই চলে আসবেন। দুশ্চিন্তা করবেন না। রাত জাগবেন না। নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন। শরীরটা সুস্থ রাখতেই হবে। যান। হ্যারি বলল।

মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে বাইরের বাগানটা ছাড়িয়ে পায়ে-চলা রাস্তায় এল। চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। একজন লোক দূরে পায়ে-চলা পথটা দিয়ে চলেছে। আর কোনো মানুষ দেখল না। মারিয়া একটু পা চালিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে চলল। সেই দুটো পাথরখণ্ডের একটাতে বসে পশ্চিমের দিগন্তের দিকে তাকাল। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। দু'পাশে গাছ-গাছালিতে ঘরে ফেরা পাখিরা ডাকছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর কমলারঙের আলোয় দিগন্ত মায়াময় হয়ে উঠেছে। দুশ্চিন্তার মধ্যেও মারিয়ার মন আনন্দে ভরে উঠল। কত পরিচিত দৃশ্য। যতবার দেখে আনন্দ যেন বাঁধ মানে না।

রাত হল। প্রহরী আর রাঁধুনি এসে ফ্রান্সিসদের খাবার দিল। সেই আনাজ মাছের ঝোলমতো, মোটা সুস্বাদু রুটি। এঁটো প্লেট নিয়ে ওরা চলে গেল। গরাদের দরজা বন্ধ হল।

শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে রইল। আস্তাসোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। চারদিক নিস্তব্ধ। মাথার ওপর কালো আকাশে তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে।

কিছু পরে আস্তাসো নিঃশব্দে ফ্রান্সিসের কাছে এল। গলা নামিয়ে বলল—আপনিই ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে ছিল। চোখ খুলে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ। আস্তাসোর গায়ে এখানে-ওখানে ছেঁড়া পোশাক। মুখে অল্প লালচে দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুলও লালচে। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল—একসময় বলিষ্ঠ শরীর ছিল। কিন্তু এখানে রোগা হয়ে গেছে। বেশ শুকনো চোখ মুখ। তবে চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। বুদ্ধিদীপ্ত।

সংক্ষেপে বলুন তো আপনার সব অভিজ্ঞতার কথা। আপনি তো ফ্রান্সের মানুষ। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। ক্রুসেডের লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু ধর্মের নামে অযথা খুনোখুনি রক্তপাত মৃত্যু দেখে অল্পদিনের মধ্যেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লাম। জানেন তো সৈন্যবাহিনী থেকে পালানো কত কঠিন। ধরা পড়ে গেলে সহযোদ্ধাদের হাতেই অবধারিত মৃত্যু। তবু জীবন বিপন্ন করেই পালালাম। এদেশ-ওদেশ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই পৌরোয় এসে পড়লাম। নানা বিপদ-আপদের কথা থাক। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানোয় ছেদ পড়ল। উজির ইয়েপুদার যোদ্ধাদের কুনজরে পড়লাম। আমাকে এখানে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করা হল।

পালাবার চেষ্টা করেননি? ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। এখানে ধারেকাছের দেশের বন্দীদের পেয়েছিলাম। একজন স্পেনীয় যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল। খাবার ভাগ করে খেতাম। পাশাপাশি শুতাম। সুখ-দুঃখের কথা হত। খুব দুঃসাহসী ছিল যুবকটি। কী ভাবে জানি না যুবকটি এই পাহাড়ের প্রায় খাড়া গায়ে ওঁচানো পাথরের খোঁদল ধরে ধরে ওপরে প্রায় পাহাড়ের মাথার কাছে একটা ঝুঁকে পড়া গাছের কাছাকাছি পৌঁছোবার উপায় বের করেছিল। ও বলেছিল প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্ধকারে রাত জেগে ঐ পথটা ও খুঁজে খুঁজে বের করেছিল। আস্তাসো থামল।

তারপর? আগ্রহে ফ্রান্সিস বলে উঠল।

এক অন্ধকার রাতে ওরা পাঁচজন ঐ পথে অসম্ভব কষ্ট করে ঐ পাহাড়ের মাথার গাছটার কাছে পৌঁছেছিল। ঝুঁকে পড়া গাছটার ডাল ধরে ধরে তিনজন নাকি উঠছিল। পালাবার আনন্দে উত্তেজনায় ওরা তিনজনই ডালটা ধরে একসঙ্গে উঠতে গিয়েছিল বোধহয়। ডাল ভেঙে তিনজনের সঙ্গে বন্ধুটিও একবারে নীচে পাথরের মেঝের ওপর আছড়ে পড়েছিল। কেউ বাঁচেনি।

ফ্রান্সিস খুব মন দিয়ে শুনছিল। বলল—তাহলে ওপরে ওঠার একটা উপায় আছে।

হ্যাঁ। কিন্তু সেই ঝুঁকে পড়া গাছটা পরদিনই যোদ্ধারা কেটে ফেলেছিল। আস্তাসো বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। বলে উঠল, তার মানে ওপর থেকে নেমে গাছটা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।

নিশ্চয়ই। নইলে ওরা ওপর থেকে নেমে এসে গাছটা কাটল কী করে? আস্তাসো বলল।

ওপরে ওঠার রাস্তাই বলুন আর উপায়ই বলুন—সেটা ওরা নেমে এসে নষ্ট করে দিতে পারেনি। ফ্রান্সিস বলল।

না। তা পারেনি। আস্তাসো অন্ধকারে মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস আবার ঠেস দিয়ে বসল। দু'চোখ বোঁজা। একটু অপেক্ষা করে আস্তাসো বলল—কী হল?

ছক কষা বোঝেন তো? ছক কষছি। পালাবার ছক। তবে তার আগে ঐ গোড়াকাটা গাছটা পর্যন্ত পৌঁছোতে হবে। ফ্রান্সিস থেমে থেমে বলল।

পাগলামি করবেন না। ঐ মৃত্যুর দৃশ্য দেখলে—

আস্তাসোকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—এইখানে এভাবে থেকেও কি বাঁচার আশা রাখেন?

দেখুন—খলিফা হাকিমকে তো দেখেছেন। তাঁর দরবারও দেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে উজির কিন্তু সব কিছু গোপন রাখে। আস্তাসো বলল।

তাহলে তো খলিফা হাকিমের কানে আমাদের এই নরকবাসের কথা পৌঁছোবেই না। ফ্রান্সিস বলল।

কোনোদিন হয়তো কোনো কারণে শুনতে পারবেন। সেটাই একমাত্র আশার আলো। আস্তাসো বলল।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—দেখুন। আপনার চেয়ে অনেক বেশি দ্বীপ, দেশ আমি ঘুরেছি। নিষ্ঠুর হত্যাকারী প্রবঞ্চক মিথ্যেবাদী হীনমনা মানুষ অনেক দেখেছি। আমি মানুষের মুখ দেখে কথা শুনে সহজেই তার চরিত্র বুঝতে পারি। অবশ্য উদার মনের দয়ালু মানুষও দেখেছি। সংখ্যায় কম। তবে এঁরা আছেন বলেই মানুষের জীবন সুন্দর, পৃথিবী বাসযোগ্য। বলুন—তাই কি না? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। একটু অবাক হয়ে আস্তাসো বলল।

অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—উজির ইয়েপুদা ক্ষমতালোভী, অর্থপিশাচ। ও যে কেন খলিফা হাকিমকে মেরে ফেলেনি সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে পালাবার জন্যে তো আপনাকে ঐ পথটা খুঁজে বের করতে হবে এবং ছক কষতে হবে। আস্তাসো বলল।

অবশ্যই। খোলা আকাশের নীচে তো কম রাত কাটেনি। দেখেছি—তারার আলো খুব অস্পষ্ট হলেও চোখের সামনে অনেক কিছু দেখা যায়। খোঁজ পাবোই। ফ্রান্সিস বলল।

এক কাজ করুন না। আর তেরো দিন পরে পূর্ণিমা পাবেন। আস্তাসো বলল।

এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন? ফ্রান্সিস বলল।

দিনরাত তো ওপরের ঝুঁকে পড়া গাছের ডালপাতার মধ্যে দিয়ে সূর্য-চাঁদের আকাশ দেখে হিসেব রাখতে ভালোবাসি। সময়ও বেশ কাটে। আস্তাসো বলল।

আবার জলঝড়ের আকাশও দেখতে হয়। ফ্রান্সিস একটু হাসল।

তখন পাথুরে মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি। গায়ের ভেজা পোশাক গায়েই শুকোয়। আস্তাসোও অন্ধকারে হাসল।

আস্তাসো আমার অতদিন অপেক্ষা করবার মতো সময় নেই। যত দ্রুত পারি পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

কী আর বলব? আস্তাসো উঠে চলে গেল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজল। যাক একটা ক্ষীণ আশার রেখা দেখা যাচ্ছে। কাল রাতের অন্ধকারে কাজে নামতে হবে। দুপুরের কড়া রোদে তেতে ওঠা পাথরের মেঝে যেমন গরম রাতে তেমনি ঠাণ্ডা। ফ্রান্সিস কোমরে ফেট্টির কাপড়টা খুলে গায়ে যতটা পারল জড়াল।

পরের দিন সকালে শাঙ্কো জিগ্যেস করল—আস্তাসোর সঙ্গে কথা হল? ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল। তারপর সব কথা বলল।

তাহলে তো একবার চেষ্টা করতে হয়। শাঙ্কো বলল।

আজ রাতের অন্ধকারে খোঁজ চালাতে হবে। কতদিন এখানে পচে মরব? ফ্রান্সিস বলল।

আমিও থাকব। শাঙ্কো বলল।

না। আমি একাই দেখব। তোমরা কয়েকজন নীচে হাঁটু মুড়ে বসে তৈরি থাকবে। যদি হাত ফসকে পড়ে যাই তোমরা আমাকে ধরবে। খুব সাবধানে আগে পাঁচজন আছড়ে পড়ে মারা গেছে ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে ফ্রান্সিস দরকার নেই এই ঝুঁকি নেওয়ার। শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

না শাঙ্কো। একটা চেষ্টা করতেই হবে তোমরা আমাকে ধরে ফেলতে পারবে না? ফ্রান্সিস বলল।

এটা কী বলছ? তোমাকে বাঁচাতে আমরা মরতে রাজি। এটা কি নতুন করে বলতে হবে! শাঙ্কো অভিমানের সুরে বলল।

ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে শাঙ্কোর হাত ধরল। চাপ দিয়ে হেসে বলল—তাই তো আমি এত দুঃসাহসী হতে পেরেছি।

সন্ধে থেকে রাত। কিছুক্ষণ পরে প্রহরী আর রাঁধুনি রাতের খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা নিঃশব্দে খেয়ে নিল। প্রহরীরা চলে গেল। শাঙ্কো অন্ধকারে বিনোলাদের কাছে এল। ফ্রান্সিসের রাতের অভিযানের কথা বলল। ওদের কী করতে হবে সেসবও বলল। তারপর ফ্রান্সিসের পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

রাত গভীর হল। ভাইকিংরা কেউ ঘুমোল না। একসময় ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে চাপাস্বরে ডাকল, শাঙ্কো। শাঙ্কোও আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। চাপাস্বরে ডাক হলেও তা শুনে বন্ধুরাও আস্তে আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস মশালের আলোয় গরাদ

দিয়ে দেখল দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দুজন একটা ছোট পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে আছে। বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। প্রহরীদের সংখ্যা বেড়েছে। তবু এই সুযোগ ছাড়া হবে না। শাঙ্কোকে মৃদুস্বরে বলল—যাও, আস্তাসোকে নিঃশব্দে নিয়ে এসো। মাথা নিচু করে যাবে আসবে।

অন্ধকারে শাঙ্কো আস্তাসোকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল, আস্তাসো, সেই ওপরে ওঠার জায়গাটা দেখিয়ে দাও তো।

তাহলে উঠবেন? আস্তাসো একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল।

আমার সংকল্প বড় দৃঢ়, আস্তাসো। মাথা নিচু করে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

আস্তাসো আর কিছু বলল না। প্রায় হামা দিয়ে সে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভেতরের দিকে গেল। অন্ধকারে একটা জায়গায় এল। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসও এল। অন্ধকারে আস্তাসো উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে একটা ওঁচানো পাথরের মাথায় হাত দিয়ে বলল—এই পাথরটা ধরে উঠতে হবে। নীচে একটা খোঁদল আছে। ওখানে পা চেপে উঠুন।

ফ্রান্সিস হাত বুলিয়ে খোঁদলটা পেল। ও পায়ের চাপে উঠে ওঁচানো পাথরটা ধরে পাহাড়ের গায়ে বুক চেপে উঠতে লাগল। ততক্ষণে শাঙ্কোরা চার-পাঁচজন ঠিক নীচে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে খুঁজে খুঁজে আর একটা বেশ উঁচিয়ে থাকা পাথর পেল। ওটা ধরে উঠতে শুরু করল। পাহাড়ের পাথরে বুক চেপে চেপে শরীরের ভর রেখে রেখে সেই সঙ্গে শরীরের ভারসাম্য রেখে রেখে উঠতে ভাবল, সেই দুঃসাহসী যুবকটি কত রাত জেগে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে এই পথটা বের করতে পেরেছে। হয়তো পাথর সরিয়ে ঘষে ঘষে এই পথ করেছে। সেই পাঁচ মৃত বন্দী কী কষ্ট করেই না উঠেছিল।

ফ্রান্সিস একটু থেমে দম নিল। হাঁপ ধরা ভাবটা একটু কমল। ওপরে তাকিয়ে তারার আলোয় দেখল ঝুঁকে পড়া কাটা গাছের কাণ্ডের অনেকটা আবছা দেখা যাচ্ছে। তখনও ওখানে পৌঁছতে হাত পাঁচেক উঠতে হবে। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে একটা ওঁচানো পাথর পেল ওপরে ডানদিকে। পাথরটার পাশেই হাতে ঠেকল একটা লম্বাটে মোটা দড়ির মতো। বুঝল, গাছটার শেকড় নেমে এসেছে। শেকড়টা আস্তে টেনে দেখল বেশ শক্ত। ভাবল, এই শেকড়ের সবটা টেনে বের করতে পারলে বাকি পাঁচ হাত পার হয়ে অনায়াসে কাটা কাণ্ডটা ধরা যাবে। অত সতর্ক ঠান্ডা মাথার ফ্রান্সিসও মুক্তির আনন্দে ভুল করে বসল। শেকড়টা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। শেকড় বেশ কিছুটা বেরিয়ে এল সত্যি, কিন্তু ওঁচানো পাথরটা খুলে এসে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে জোরে গড়গড় শব্দ তুলে

পাথরটা গিয়ে পড়ল ঘুমন্ত কোনো বন্দীর ওপর। মুর যুবকটি ঘুম ভেঙে চিৎকার করে উঠল—মাথাটা গেল! ও—ও—মাথাটা গেল! মুহূর্তে ফ্রান্সিস হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে নেমে এল। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে সচকিত বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ন্ত ফ্রান্সিসকে হাত বাড়িয়ে আটকাল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—শুয়ে পড়ো। ওদিকে মুর যুবকটিও চ্যাঁচামেচি শুরু করেছে। অনেক বন্দীই ততক্ষণে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। একটু পরেই প্রহরীরা গরাদের কাছে ছুটে এল! একজন গলা চড়িয়ে বলল—ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়েছে। একজনের মাথায় পড়েছে। পাথর গড়িয়ে পড়া দেখিনি কোনোদিন।

ও। ঠিক আছে। শুয়ে পড়ো। প্রহরীটি বলল।

তোমাদের বৈদ্যিকে ডাকো।

বৈদ্যি নয়। হেকিম। হেকিম তোমাদের জন্যে রাত জেগে বসে আছে—না? প্রহরী বলল।

খুব লেগেছে। শাঙ্কো বলল।

ঠিক আছে। কাল সকালে দেখা যাবে। প্রহরী সরে গেল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল—প্রহরীদের বললাম। কানেই নিল না।

ওরা এরকমই। শুধু হুকুম তামিল করতে পারে আর বন্দীকে পালাতে দেখলে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে জানে।

তখনই আস্তাসো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কেমন আছেন?

মনটা ভালো নেই। একজন নিরীহ মানুষকে আহত করলাম। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

আপনি তো ইচ্ছে করে পাথর ছুঁড়ে মারেননি। এ তো দুর্ঘটনা। নিজেকে দোষী মনে করবেন না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—যাও, আহত লোকটিকে দেখে এসো।

শাঙ্কো তাড়াতাড়ি সেই মুর যুবকটির কাছে এল। অন্ধকারে মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে বুঝল ফেটে যায়নি। ও তাড়াতাড়ি ওর কোমরবন্ধনী ছিঁড়ে যুবকটির মাথায় বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল। যুবকটি একটু আরাম পেল। গোঙানি বন্ধ হল।

সকালে শাঙ্কো গরাদের সামনে গিয়ে তাগাদা দিল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলা হল। লম্বাটে, রোগা, সাদা দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা তালিমারা ঝোলা কাঁধে হেকিম ঢুকল। শাঙ্কো হেকিমকে আহত যুবকটির কাছে নিয়ে এল। ও ফেট্টি খুলে ফেলল। আস্তে ক্ষত জায়গাটার চারপাশে চাপ দিয়ে দেখল। চোখ দেখল। তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে আরবি শব্দ মেশানো পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—ফাটেনি। সেরে

যাবে। বলে ঝোলা থেকে বোয়াম বের করল। ভেন-এর মতোই দু'হাতে একটা কালো দলামতো নিল। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। তারপর হাতের তালুতে অন্য বোয়াম থেকে কী নিয়ে চেপে চেপে ঘুরিয়ে কয়েকটা বড়ি বানাল। বোয়াম ঝোলায় ভরে উঠে দাঁড়াল। বলল—ভয় নেই। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। হেকিম চলে গেল। শাঙ্কো যুবকটির পাশে বসে বলল—সব কথা তো ভাই বলা যাবে না। এটাকে দুর্ঘটনা বলেই মনে করো। কোনো অসুবিধে হলে আমাকে ডেকো। এখন শুয়ে বিশ্রাম করো।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। কথাটা মনে হতেই বলল—তুমিও দেখিয়ে নিলে পারতে।

কী যে বল! ওরা অভিজ্ঞ বৈদ্যি। বুকে, কনুইয়ে, হাঁটুতে হ্যাঁচড়ানোর দাগ থেকে সব বুঝে ফেলবে।

খুব কেটেছে? শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল, দু-তিনটে জায়গায় পাথরের খোঁচায় বেশ কেটে গেছে। বুঝতে পারছি রক্ত বেরিয়ে এসেছে। বাকি জায়গা ছড়ে গেছে। ভীষণ জ্বালা করছে। কিন্তু আমার কোনো শব্দ করার উপায় নেই। প্রহরীদের কানে গেলে সন্দেহ করবে। একটু থেমে বলল—আমার বেশি কষ্ট হচ্ছে না। একটা নিরীহ মানুষকে আহত করলাম।

এটা একটা দুর্ঘটনা। শাঙ্কো বলল।

ঘটিয়েছি তো আমি। যাক গে, তোমাদের কারো লাগেনি তো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

সে সামান্য। শাঙ্কো বলল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ফ্রান্সিস চুপ করে বসেছিল। পাথর গড়িয়ে পড়ার আগে ফ্রান্সিস আবছা একটা মোটা শেকড় দেখেছিল। শেকড়টা ধরতে চেয়েছিল তাড়াতাড়ি। বিপত্তি ঘটল। শেকড়টা কত লম্বা সেটাই দেখা হল না। অগত্যা দু'একদিন চুপ করে থাকতে হবে। পরে আবার উঠতে হবে।

এসময় একজন প্রহরী গরাদে মুখ চেপে গলা চড়িয়ে বলল—মহামান্য খলিফার দরবারে তোমাদের মধ্যে কে নাকি কী শুনিয়েছ। সে এগিয়ে এসো।

সিনাত্রা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—চলো তো ব্যাপারটা দেখি।

দুজনে গরাদের কাছে এলো। দেখল সেদিন দরবারে যে রোগামতন লোকটি মুখে মুখে কবিতা বলছিল সে দাঁড়িয়ে আছে। সিনাত্রাকে দেখে বলে উঠল, হ্যাঁ

আপনি। শুনুন মহামান্য খলিফার আজ শরীর ভালো নেই। দরবারেও আসেননি। আজ রাতে মহামান্য খলিফার প্রাসাদেই গিজেলের এক মেহফিল হবে। সময়মতো মহামান্য খলিফার দুজন দেহরক্ষী আসবে। আপনাকে মেহফিলে নিয়ে যাবে। আবার পৌঁছে দেবে। আপনার গিজেল মহামান্য খলিফার খুব ভালো লেগেছে।

ওর নাম সিনাত্রা। খুব ভালো গান গায়। আমাদের দেশের ভেড়া-পালকদের গান ও জানে। ওর গলা খুব সুরেলা—ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তো শুনতেই হবে। লোকটি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল।

বুঝবেন না তো। ফ্রান্সিস বলল।

সুর তো বুঝব। পর্তুগীজ ভাষায় অর্থ বললে আরও ভালো লাগবে। ভেড়া-পালকদের গান, মাটি-পাহাড়ের গান সরল সুন্দর। তাই কিনা? লোকটি হেসে বলল।

আপনার নামটা? ফ্রান্সিস বলল।

গরিবের নাম রামাদ্দি।

আপনি কবি?

আমি আর কী কবি! আমার কবিগুরু আবিদি রব্বাহি। কতো বছর আগেকার কবি! আজও বাজারে-ঘাটে-মাঠে লোকে সেইসব কবিতা সুর করে শোনায়। অনেক আরবী কবিতা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। আমি তাঁর দীন ভক্ত। রামাদ্দি হেসে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—দেখুন রামাদ্দি, আমরা এখানে বড়ো কষ্টে আছি। আপনি যদি—

ফ্রান্সিসকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই একটু যেন ভীত স্বরে রামাদ্দি বলে উঠল—এসব মান্যবর ইয়েপুদার হুকুম। এসব ব্যাপার আমাকে কিছু বলবেন না। আমি মুখে মুখে গিজেল বানাই, মেহফিলে বলি—ব্যস! এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

ফ্রান্সিস বুঝল রামাদ্দিকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

রামাদ্দি এবার একটু দুঃখের সঙ্গে বলল—আমার কবিগুরু দরবারের গিজেল শুনিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু কী যে হল, তাঁর শেষ জীবনটা স্বেচ্ছানির্বাসনে কেটেছে। যখন তাঁর কবিখ্যাতি দেশকাল ছাড়িয়ে গেছে তখন এক গভীর রাতে সব ধনসম্পত্তি নিয়ে আর এক আবাল্যবন্ধু আবু হামিদকে সঙ্গে নিয়ে ঐ যে প্রায় ভেঙে পড়া দুর্গটা দেখছেন তারই একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর ও আবু হামিদের যে কী হল কেউ জানে না।

আর তাঁর ধনসম্পদ? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

নিখোঁজ। কেউ জানে না কোথায় গেল সেই ধনসম্পদ। রামাদ্দি বলল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। পরে আপনার কাছ থেকে যতটা আপনি জানেন শুনব। সিনাত্রা যাবে, সানন্দে যাবে। এ তো কত সম্মানের ব্যাপার।

তাহলে চলি।

রামাদ্দি চলে গেল। কেমন এক আত্মভোলা চলার ভঙ্গি। একবার পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে, একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ রামাদ্দির দিকে তাকিয়ে রইল।

রামাদ্দি সত্যিই কবি। অন্যরকম মানুষ। সিনাত্রা মৃদুস্বরে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—সিনাত্রা, এসো কথা আছে।

ভেতরে ঢুকে দুজনে বসল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি তো যাবে, যেভাবে হোক খলিফাকে বলবে আমরা বন্দী হয়ে পড়ে আছি। খুব কষ্ট আমাদের। আমাদের মুক্তি দিন।

ঠিক আছে। সুযোগ পেলেই বলব।

ফ্রান্সিস সরে এসে শুয়ে পড়ল।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধে হল। কিছুক্ষণ পরে গরাদের পাশে মশাল জ্বালানো হল। প্রহরীর সংখ্যাও বাড়ল। তখনই খলিফার দুই দেহরক্ষী এল। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ে অন্যরকম জমকালো পোশাক। মাথায় শিরস্ত্রাণ। সিনাত্রা যে পোশাক পরেছিল, সেটা পরেই প্রহরীর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—যা বলেছিলাম। সিনাত্রা মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল। দেহরক্ষীদের সঙ্গে চলল।

গরাদ ধরে ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। একটু আশান্বিত হল। হয়তো খলিফা এসব জানলে ওদের মুক্তি দিতে পারেন।

বেশ রাতে সিনাত্রা ফিরে এল। হাসিমুখে ফ্রান্সিসদের খলিফার দেওয়া পারিতোষিক নতুন সুন্দর পোশাক, পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা দেখাল।

ঠিক আছে। খলিফা হাকিম গুণীদের সম্মান দিতে জানেন। এবার আসল কথাটা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস, কড়া পাহারায় নিয়ে গেছে আমাকে। রক্ষীরা যেতে যেতে বলেছে পথে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। যে বিরাট ঘরটায় কবিগানের আসর বসেছিল সেখানে বেশ লোকজন জড়ো হয়েছিল। মুখে মুখে কবিতা বলা, গানটান চলল। শ্রোতারা সবাই উৎসাহ দিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছে। কিন্তু উজিরের সেদিকে

কোনো নজর নেই। উৎসাহও নেই। সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। আমি তো খলিফার কাছে যাবারই সুযোগ পাইনি। ফেরার পথেও কড়া পাহারা। সিনাত্রা বলল।

হুঁ। উজির ইয়েপুদা ধুরন্ধর লোক। যাক্‌গে, প্রাসাদ কেমন দেখলে?

অপূর্ব। পাথরের থামে কত কারুকাজ। ছাদে, দেওয়ালে কী সুন্দর ভাস্কর্য। রঙিন ছবি আঁকা। কবি রামাদ্দি বলল খলিফা নিজেও নাকি অবসর সময়ে এসবে হাত লাগিয়েছেন।

হুঁ। খলিফা হাকিম শিল্পী মানুষ। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, ক্রেভান ঠিকই বলেছিল।

জানো ফ্রান্সিস, রামাদ্দি খলিফা হাকিমের সভাকবি।

বলো কী! ফ্রান্সিস বেশ অবাক হয়ে বলল।

হ্যাঁ। অথচ কী বিনয়ী। কী ভদ্র! কোনো গর্ব নেই। ফিরে আসার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে কত প্রশংসা করল। বলল আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করেন। আর একটা কথা, আমি একটা কবিতার পুঁথি লিখেছি, সেটা আপনাকে সসম্মানে উপহার দেব। শুনে আমি তো অবাক।

সত্যি, রামাদ্দি অন্যরকম মানুষ। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে খাবার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, একজন প্রহরী গরাদের কাছ থেকে গলা বাড়িয়ে বলল—সিনাত্রা কে? এদিকে এসো।

সিনাত্রা উঠে গরাদের কাছে গেল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কোও উঠে এল। গরাদের কাছে এসে দেখল রামাদ্দি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ধরা কালো সুতোয় বাঁধা পার্চমেন্ট কাগজের একটা পুঁথি। সিনাত্রার দিকে পুঁথিটা বাড়িয়ে ধরে বলল—কবিবন্ধু, আপনার জন্য এই সামান্য প্রীতি উপহার কাল সারারাত জেগে পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেছি। আপনার বুঝতে সুবিধে হবে।

ভালো করেছেন। আরবী ভাষা তো সিনাত্রা বুঝত না। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

জানেন, পর্তুগীজ ভাষায় অনেক আরবী শব্দ মিশে গেছে। রামাদ্দি বলল।

সবই বুঝলাম। কিন্তু এই নরকে থাকলে আপনার কবিবন্ধু আর কতদিন বেঁচে থাকবেন? ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দির মুখ একটু গম্ভীর হল। বলল—বলেছি তো এসব ব্যাপার থেকে আমি দূরে থাকি। আমার মনের শান্তি আমি নষ্ট হতে দিতে রাজি নই।

কিন্তু মাননীয় খলিফাকে যদি আমাদের এই দুঃখকষ্টের কথা জানানো হয়—

কোন লাভ নেই। এসব ব্যাপারে মহামান্য খলিফা উদাসীন। তাই তো দেশের সব ধর্মের সব মানুষ মহামান্য খলিফাকে এত ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। শুনলে আশ্চর্য হবেন মহামান্য খলিফা যতদিন এখানে শাসনক্ষমতায় আছেন কোনো শত্রুর দ্বারা এদেশ আক্রান্ত হয়নি। তাঁর দরবারে বিচার-টিচার হয়, সব মানুষ তো লোভ ক্রোধ হিংসা থেকে মুক্ত নয়; কিন্তু অপরাধ খুব অল্পই হয় এখানে। রামাদ্দি বলল।

আচ্ছা, আপনি কবি আবিদি রব্বাহির নিখোঁজ ধনভাণ্ডারের কথা বলছিলেন। আমরা এরকম বহুদিন আগের নিখোঁজ গুপ্তধন উদ্ধার করেছি চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে। যদি মহামান্য হাকিম আমাদের সেই সুযোগ দেন তবে—

কোনও লাভ নেই। ধনসম্পদের প্রতি মহামান্য খলিফার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। রামাদ্দি মাথা নেড়ে বলল।

তবে মান্যবর উজিরকেই বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

অত কথা আমি বলতে পারব না। আমি শুধু মান্যবর উজিরকে বলতে পারি ভাইকিংরা আপনাকে কিছু বলতে চান। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না। রামাদ্দি বলল।

বেশ। তাই বলুন। কিন্তু শুধু এটুকু বললে উনি ভাববেন আমরা মুক্তির জন্য অনুরোধ করব। উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে কোনো আগ্রহই বোধ করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। আমি বলব 'একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে'। এর বেশি একটি কথাও বলব না। রামাদ্দি বলল।

ওতেই হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দি হেসে হাত বাড়িয়ে সিনাত্রার হাত ধরল। বলল—চলি কবিবন্ধু। তারপর রামাদ্দি আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে রাস্তায় উঠল। সেই উদাস ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল।

অদ্ভুত মানুষ। ফ্রান্সিস অস্ফুট স্বরে বলল।

যাই বলো ফ্রান্সিস—এরকম কবিতা-পাগল মানুষ আমি মাত্র একজনকে দেখেছি। সেই পাগল কবিকেই দেখেছিলাম। সিনাত্রা বলল।

কবিতার পুঁথিটার চামড়ার মলাটে আরবী ভাষায় নাম লেখা। নীচে পর্তুগীজ ভাষায় অর্থটা লেখা—বিষাদ। ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন নাম কেন? কী বেদনা কবি রামাদ্দির?

বিকেলের দিকে গরাদের কাছ থেকে একজন প্রহরীর হাঁক শোনা গেল—

মান্যবর উজির এসেছেন। ভাইকিংরা এখানে এসো। ফ্রান্সিস পাথুরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। উঠে তাড়াতাড়ি উজিরের কাছে এল। দেখল উজির ইয়েপুদা দাঁড়িয়ে। প্রহরীরা সন্ত্রস্ত। ইয়েপুদা বলল, তুমিই তো দলনেতা?

'হ্যাঁ মান্যবর। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে ইয়েপুদা বলল—কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে শুনি?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি যে আগে আমরা অনেক গুপ্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি ছড়া নকশা পাণ্ডুলিপি এসবের সাহায্যে। সভাকবি রামাদ্দির কাছে শুনলাম অনেকদিন আগে আপনাদের বিখ্যাত কবি আবিদি রব্বাহির ঐশ্বর্য সম্পদ নিখোঁজ হয়ে গেছে। উনি নাকি ঐ আধভাঙা দুর্গের একটি কুঠুরিতে তাঁর এক দীর্ঘদিনের সহচর আবু হামিদকে নিয়ে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। ঠিকই শুনেছো। তারপর বলো। উজির বলল।

আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দেন তবে আমরা কয়েকজন মিলে সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডার উদ্ধার করতে প্রস্তুত। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে উজির জোরে হেসে উঠল। বলল—জানো কয়েকজন শাসক জ্ঞানী পণ্ডিতদের নিয়ে ঐ স্বর্ণভাণ্ডার দীর্ঘদিন খুঁজেছিলেন। আমিও দরবারের দুই পণ্ডিতকে নিয়ে কম চেষ্টা করিনি। আর শোনামাত্র তুমি তা উদ্ধার করবে? পাগলের প্রলাপ।

ঠিক আছে। আপনি আমাদের অনুমতি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

তার মানে পালাবার ফিকির। উজির দেঁতো হাসি হাসল।

বন্ধুদের জন্য আমরা জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকি। তাদের ফেলে রেখে হাজার প্রলোভনেও আমরা সরে পড়ি না। আমাদের এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। এবার আসল কথাটা বলো তো। সেই ঐশ্বর্য ধরো উদ্ধার করলে। তারপরে? উজির মৃদু হেসে জানতে চাইল।

মহামান্য খলিফা হাকিমকে সব ঐশ্বর্য সম্পদ দিয়ে দেব। আমরা একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না। ফ্রান্সিস বলল।

আশ্চর্য! তোমরা এত নির্লোভ? উজির একটু অবাক হয়ে বলল।

হ্যাঁ মান্যবর। যে সম্পদ কষ্ট করে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে সঞ্চিত করিনি, তার প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

বিশ্বাস হল না। উজির মাথা নাড়ল।

আপনিই প্রথম নন। এর আগেও অনেকেই আমাদের বিশ্বাস করেনি। তারপরে গুপ্ত ধনভাণ্ডার যখন উদ্ধার করেছি, তাঁরা উল্লসিত হয়ে অনেকে অর্ধেক ধনসম্পদ আমাদের দিতে চেয়েছেন। আমরা একটা সাধারণ সোনার আংটিও নিইনি। আর যদি আমাদের বিশ্বাস না করেন তবে মহাকবির ঐ স্বর্ণভাণ্ডার চিরদিনের জন্য নিখোঁজই হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। তোমার আর কী বলবার আছে? উজির বলল।

আর দুটো কথা। এক—সভাকবি রামাদ্দি আমাদের সঙ্গী হবেন। কারণ আরবী ভাষা আমরা জানি না। কবি রামাদ্দি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। আর একটা? উজির জানতে চাইল।

যদি আমরা ঐ নিখোঁজ সম্পদ উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস বেশ জোর দিয়ে বলল।

ভেবে দেখি। উজির বলল।

আমারও তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চাই। কাজেই কাল সকালের মধ্যে আমাদের খবর পাঠান। আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে পারব না। ফ্রান্সিস বলল।

আমরাও একটা শর্ত আছে। উজির বলল।

বলুন।

ঐ সম্পদ উদ্ধার হলে সব তোমাদের গোপন রাখতে হবে। কাউকে বলা চলবে না। উজির আস্তে বলল যাতে প্রহরীরা শুনতে না পারে।

কিন্তু কবি রামাদ্দি তো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দি? ওটা উটের মতোই বোকা। উজির বিরক্তির সঙ্গে বলল।

তাহলে আমাদের নজরে রাখতে কেউ কি থাকবে না? ফ্রান্সিস বলল।

দরকার নেই। আমার লোকজনকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

উজির ঘুরে দাঁড়াল। প্রহরীরা সার বেঁধে দাঁড়াল। উজির চলে গেল।

ফ্রান্সিসের বুঝতে অসুবিধা হল না উজিরের লক্ষ্য কী। খলিফাকে অন্ধকারে রেখে সব সম্পদ গোপনে আত্মসাৎ করবে। উজির আগে থেকে অনেকদূর ভেবে রেখেছে। উজির একই সঙ্গে বুদ্ধিমান আর ধূর্ত। এটা বুঝল। উজির চলে গেল ফ্রান্সিসদের সুযোগ দেওয়া যাবে কিনা এসব ভাবতে ভাবতে। রাতে চোখ বুজে ভীষণ ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে ফ্রান্সিস ভাবছিল উজির ওর প্রস্তাবে রাজি হবে কিনা। ও বুঝে নিয়েছে উজিরের সঙ্গে কথায় আর ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। উজির সন্দেহবাতিক। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই উজির বেঁকে দাঁড়াবে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—ঘুমোওনি?

অনেক চিন্তা শাঙ্কো, ঘুম কী আসে! ফ্রান্সিস বলল।

কী ভাবছো? শাঙ্কো জিগ্যেস করল।

আকাশ-পাতাল। মৃদু হেসে ফ্রান্সিস বলল।

সাবধান ফ্রান্সিস। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে—

মায়েদের মতো উপদেশ দিও না তো। শোনো, মনে হয় কাল সকালেই জানতে পারব উজির কী সিদ্ধান্ত নিল। আর একটা কথা, উজিরের সামনে বেফাঁস কিছু বলে বসো না। তোমরা চুপ করে থাকবে, যা কথা বলার আমি বলব।

শাঙ্কোর একটু অভিমান হল। কিন্তু কিছু বলল না। পাশ ফিরে শুল।

সকালে গরাদে মুখ চেপে একজন প্রহরী হেঁড়ে গলায় বলল—রামাদ্দি এসেছেন। ফ্রান্সিস কে? এখানে এসো।

ফ্রান্সিস তখন বসেছিল। বেশ দ্রুতই গরাদের কাছে এল। দেখল রামাদ্দি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি নেই। ফ্রান্সিসকে দেখে বলে উঠল—এ কী ঝামেলায় ফেললেন আমাকে?

কোনও ঝামেলায় আপনাকে ফেলা হবে না। এবার বলুন মাননীয় উজির কী বললেন? ফ্রান্সিস সাগ্রহে বলে উঠল।

আপনাদের মধ্যে নাকি কী সব শর্তটর্ত হয়েছে। যাকগে, ওসব নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। মাননীয় উজির বললেন, আপনারা কী সব খোঁজাখুঁজি করবেন, আমাকে আপনাদের সঙ্গে থাকতে হবে অর্থাৎ সাহায্য করতে হবে।

হ্যাঁ, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমাদের কাজ আমরা করব। প্রয়োজনে আপনার কাছে নানা বিষয় জানতে চাইব। ব্যস। আপনাকে একটা আঙুলও নাড়তে হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রামাদ্দি দ্বিধান্বিত সুরে বলল।

সময় আসুক, সব জানবেন—বুঝবেন—দেখবেন। আমরা দেরি করব না। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরব। আমরা আজ এখনই কাজে নামব।

বেশ, চলুন। কিন্তু উজিরের হুকুম, মাত্র দু'জন ছাড়া পাবেন।

মুশকিল হল। ঠিক আছে। প্রথমে দু'জনই থাকব। পরে আরও লোকজন লাগবে কিনা দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

কোথায় যাবেন? রামাদ্দি জিগ্যেস করল।

ঐ আধভাঙা দুর্গে।

ওটা তো একটা পরিত্যক্ত দুর্গ। কখন ভেঙে পড়ে। রামাদ্দির আবার দ্বিধা।

বন্ধু রামাদ্দি, দুর্গের গাঁথনি অত পলকা হয় না। থাকগে, আমরা দুজন এখন বেরোতে চাই।

রামাদ্দি আর কথা না বাড়িয়ে প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—মাননীয় উজিরের হুকুম দু'জন বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে। আমার সঙ্গে যাবে ওরা।

একজন প্রহরী এগিয়ে এল। গরাদের তালা খুলে দিল। শাঙ্কোকে নিয়ে ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল উজ্জ্বল রোদে ভরা এক সুন্দর সকাল। কিন্তু এই সৌন্দর্য দেখার বা মুগ্ধ হবার সময় কোথায়? সামনে তো অনিশ্চিত ঘটনার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে খুঁজে বের করতে হবে মুক্তির আলো।

প্রথমে কোথায় যাবেন? রামাদ্দি জানতে চাইল।

প্রথমে যাব ঐ ভাঙা দুর্গে। কারণ, ওখানেই কোনও একটা কক্ষে কেটেছে কবি আবিদির শেষ নির্বাসিত জীবন। তাই কিনা? ফ্রান্সিস বলল।

বেশ, চলুন। রামাদ্দি হাঁটতে শুরু করল।

পাথুরে পথ দিয়ে কিছুদূর এসে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রামাদ্দি আঙুল তুলে ভাঙা দুর্গটা দেখাল। কালচে শক্ত পাথরে গাঁথা দুর্গ যেমন হয়। দুর্গে যাবার পথটা একসময় নিশ্চয়ই বড় ছিল। পাথরে বাঁধানো ছিল। এখন পরিত্যক্ত। ভাঙা পাথর ছড়িয়ে আছে। তার ওপর দিয়ে দেখেশুনে হেঁটে চলল তিনজনে। এখানে-ওখানে বুনো ঝোপঝাড়। পাথরের ফাঁক-ফোকরে সবুজ ঘাস গজিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা প্রবেশদ্বারের কাছে এল। এখানে-ওখানে ভেঙে পড়লেও অর্ধচন্দ্রের মতো দেউড়িটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দেউড়ি পার হয়ে তিনজনে ভেতরে ঢুকল। উজ্জ্বল রোদে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুর্গ ঘিরে আধভাঙা প্রাকার দেখা গেল পেছনে। তাও সবটা দেখা গেল না। কারণ, মূল দুর্গের প্রায় গা ঘেঁষে শুরু হয়েছে বিরাট বিরাট গাছের জঙ্গল। খুব ঘন জঙ্গল নয়। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে নানারকম গাছ। বোঝাই যাচ্ছে অনেক বছর ধরে এই গাছগুলো গজিয়েছে। বড় হয়েছে। বিনা যত্নেই।

রামাদ্দি, কবি আবিদি কোন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

এখানেই তো রহস্য। কেউ জানত না। তখন দুর্গটা ছিল প্রায় জনশূন্য। শোনা যায়, তৎকালীন মুর শাসকের কিছু সৈন্য, কর্মচারী নাকি বিভিন্ন কক্ষে থাকত। তারা জানতই না যে অত বিখ্যাত একজন কবি সেখানে আশ্রয় নিয়েচেন। তিনি কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। একমাত্র আবু হামিদ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। শোনা যায়, আবু হামিদ ছিল নিরক্ষর। কবিই তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। প্রভুভক্ত আবু হামিদের কোনও পিছুটান ছিল না। ঘরসংসার বলেও কিছু ছিল না। সে নাকি কবিকে খাদ্য-পানীয় এনে দিত। তাও নাকি গভীর রাতে। রামাদ্দি বলল।

কিন্তু যেখান থেকে খাদ্য-পানীয় আনত তারা তো জানত। ফ্রান্সিস বলল।

মাত্র একজন খোঁড়া দোকানদারের কাছ থেকে আনত। আবু হামিদ নাকি অনেক মেতাশমেস মানে স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়ে গেছিল। সেই খোঁড়া দোকানি কোনোদিন জানতেও পারেনি আবু হামিদ কে? জানতেও চায়নি কেন সে গভীর রাতে খাদ্য-পানীয় নিতে আসে। অত স্বর্ণমুদ্রা পেয়েই সে খুশি ছিল।

হুঁ, চলুন। যতখানি দেখা যায় আগে দেখে নিই। ফ্রান্সিস বলল।

চলুন। রামাদ্দি ওপরে ওঠার ভাঙা সিঁড়িটা। দেখিয়ে বলল।

ভারসাম্য বজায় রেখে ওরা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। এপাশে-ওপাশে কয়েকটা ভেঙে পড়া মেঝে দেখে বোঝা গেল সেখানে থাকবার ঘর ছিল। তারপর ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে ছোট বারান্দা মতো। তারপরেই ভাঙা মেঝের চিহ্ন। ওখান থেকে পেছনের প্রাকার পর্যন্ত বনজঙ্গল স্পষ্ট দেখা গেল। খুব মন দিয়ে চারপাশে তাকাতে তাকাতে ফ্রান্সিস বলল—এখানেও একটা ঘর ছিল। তবে মেঝেসুদ্ধু ভেঙে পড়েছে। ওপরে তাকিয়ে খোলা আকাশ দেখল। এর পরে সিঁড়িটা অর্ধেক মতো উঠে একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর ওপরে কিছু নেই। নীচের দিকে দেখল পাথরের পাটার স্তূপ। ভাঙা-আস্ত মেশানো।

আর কিছু আস্ত নেই। রামাদ্দি বলল।

হ্যাঁ, চলুন।

তিনজনে নেমে আসতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস লক্ষ করল একেবারে নীচে মোটামুটি আস্ত পাথুরে দেওয়ালে বন-জঙ্গলের দিকে একটা চৌকোনা ভাঙা ফোকর। ফ্রান্সিস ঐ ফোকরটার কাছে গেল। ফোকরটা ভালো করে দেখেটেখে বুঝল এখানে একটা জানলা ছিল। নীচে ভাঙা পাথরের স্তূপে দেখল একটা লোহার ডাণ্ডা কিছুটা উঁচিয়ে আছে। রামাদ্দির দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—তাহলে এই দুর্গের জানলাগুলিতে লোহার গরাদ বসানো ছিল।

আস্ত দুর্গটা যারা দেখেছে তারা তো কেউ বেঁচে নেই যে বলবে জানলা ছিল কি না। তবে এব্রো উপত্যকার একটা খুব পুরোনো দুর্গে মোটা মোটা গরাদ বসানো জানলা দেখেছি। বেশির ভাগই অবশ্য ভাঙা। রামাদ্দি বলল। তারপর বলল—ফিরে চলুন। এই ভাঙা দুর্গে কেউ আসে না। এই দুর্গে জঙ্গলে বড় সাপের উপদ্রব। বিষধর সব সাপ।

তিনজনে সাবধানে নেমে এল আধভাঙা সিঁড়ি দিয়ে।

পেছনের বন-জঙ্গলটা একবার দেখে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

রামাদ্দি আঁতকে উঠে বলল—মাথা খারাপ! সাপের আড্ডা ওখানে।

কী করে জানলেন?

বাঃ! ভাঙা দুর্গে তো অনেক সময় দামি ধনরত্ন গোপনে রাখা হয়। অন্তত পাঁচজন চোর সেই ধনরত্ন খুঁজতে এসে নাকি সাপের কামড়ে মারা গেছে। রামাদ্দি বলল।

রামাদ্দি—ফ্রান্সিস হেসে বলল—ধনরত্ন যেটুকু ছিল তা আগেই লোপাট হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় ওরা রাতের অন্ধকারে এসেছিল বলেই সাপের মুখে পড়েছিল। এখন তো উজ্জ্বল রোদের দিন। চলুন, যতটা দেখা যায়।

রামাদ্দি বেজার হয়ে বলল, চলুন।

দুর্গের পাথুরে দেওয়ালে প্রায় গা লাগিয়ে জঙ্গল শুরু হয়েছে। ফ্রান্সিস একবার মাথা উঁচু করে যে ধসে-পড়া ঘর আর ভাঙা জানলাটা দেখেছিল সেটার বরাবর জঙ্গলে ঢুকল। বেশ ঘন বন এদিকটায়। বনের নীচে এই দুপুরেও আবছা অন্ধকার। সাবধানে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা চলে আসতেই দেখল দুটো জোড়া খেজুর গাছ। গাছ দুটোর মধ্যে মাত্র হাতখানেক দূরত্ব।

তাহলে এসব জায়গায় খেজুর গাছও হয়? ফ্রান্সিস রামাদ্দিকে জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মরুভূমিতে হয় আর এখানে হবে না? খেজুর গাছ বাঁচেও অনেক বছর। রামাদ্দি বলল।

ফ্রান্সিস মুখ তুলে দেখল বেশ উঁচু গাছ দুটো। ছুঁচোলো পাতাগুলো অনেকটা ছড়ানো। খেজুরও হয়েছে। তবে পাকা নয়, কাঁচা।

এগুলো কেমন জাতের খেজুর গাছ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে রামাদ্দি বলল, খুব ভালো জাতের খেজুর গাছ। এ সব গাছের খেজুর খুব মিষ্টি হয়। এবার ফিরে চলুন। রামাদ্দি একটু বিরক্ত হয়েই বলল।

সাপের ভয়? তাই না? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কখন দুটো-একটা ফোঁস করে ওঠে তার কি ঠিক আছে?

ঠিক আছে, চলুন। পরে না হয় আসা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড় ঠেলে তিনজন বেরিয়ে এল।

আর কিছু দেখার আছে? আমার তো মনে হয়—

রামাদ্দিকে থামিয়ে ফ্রান্সিস বলল, দেখি ভেবে।

পাটা-ভাঙা, পাথর-ছড়ানো রাস্তাটা দিয়ে তিনজনে পাহাড়ি রাস্তাটায় উঠল। চলল সেই গিরিসংকটের দিকে। বেলা বেড়েছে। খিদেও পেয়েছে। রামাদ্দি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, আমি তাহলে চলি?

কালকে সকালে আসবেন কিন্তু। ঐ দুর্গে যাব।

ঠিক আছে। বেশ ব্যাজার মুখে রামাদ্দি বলল। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

ঘেরা জায়গার বন্দীশালায় আসতে বিনোলারা কয়েকজন এগিয়ে এল। শাঙ্কো ভাঙা দুর্গ দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল।

রাতে ওপরের তারাজ্বলা কালো আকাশ আর ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল—হাতে সময় বেশি নেই। যত দ্রুত সম্ভব ঐ ধনৈশ্বর্যের ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে হবে। মারিয়া, হ্যারি আর কতদিন ঐ বাড়িতে থাকতে পারবে? কিন্তু কোনও সূত্রই তো আজ পাওয়া গেল না।

পরের দিন সকালে রামাদ্দি এল। আবার তিনজন দুর্গের দিকে চলল। রামাদ্দির মুখে হাসি নেই। ফ্রান্সিস আড়চোখে ওর মুখ দেখে বুঝল, কবিতার ভাবনা ছেড়ে এইসব ধনৈশ্বর্যের সন্ধান ওর কবিস্বভাবের বিরোধী। কিন্তু উজিরের হুকুম। ও নিরুপায়।

ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে ওপরে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস ভাবল, প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে কোন ঘরে কবি আবিদি স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন। ফ্রান্সিস আবার সেই ধসে-পড়া মেঝে আর ভাঙা জানলাটার কাছে এল। ভাঙা প্রায় চৌকোনা খোঁদলটা দিয়ে পেছনের বন-জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল। আবার সেই জোড়া খেজুর গাছ দুটো অন্য গাছগুলির মধ্যে দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় ছড়ানো থাকায় খেজুর গাছের পাতাগুলিও দেখা যাচ্ছে। এবার ফ্রান্সিস নীচে ভাঙা পাথরের পাটাগুলির দিকে তাকাল। ভালো করে হিসেব করে দেখল মেঝের পাথরের পাটাগুলি ভেঙে পড়লেও সব একেবারে নীচে পড়ে যায়নি। কারণ, নীচের ঘরের মেঝেটা অটুট আছে। সেখানেই ভাঙা পাথরের পাটাগুলি পড়েছে। কিছু লোকের সাহায্য পেলে সরানো যাবে। যদি ধরে নেওয়া যায় এখানে একটা ঘর ছিল তাহলে এই ঘরে যা কিছু ছিল, যেমন খাওয়ার বাসন-কোসন, জলের জায়গা, শোবার জন্য কাঠের কোনও আসবাব সবই চাপা পড়ে গেছে পাথরের পাটার তলায়। ফ্রান্সিস রামাদ্দিকে বলল, ঐ তলার পাথরের ভাঙা পাটাগুলি সরাতে হবে। আপনি উজিরকে গিয়ে বলুন আমাদের কিছু লোক লাগবে। আমরা মাত্র তিনজন ওসব সরাতে গেলে সাত-আটদিন লেগে যাবে।

কিন্তু ওসব সরিয়ে কী হবে? রামাদ্দি কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

ঠিক আছে। আগে তো জায়গাটা পরিষ্কার করা হোক। ফ্রান্সিস বলল।

কী যে পাগলামি! রামাদ্দি বিরক্ত হয়ে বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, আমার পাগলামি বলেই ধরে নিন না। তারপর বলল, কাজটা আমি এখনই শুরু করতে চাই। দেশে ফিরব। খুব তাড়া আমাদের।

কিন্তু এখন উজিরের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তো উনি খেপে যাবেন। আপনাদের ছেড়ে চলে এলাম কেন তার জবাবদিহি তো করতে হবে। রামাদ্দি বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি খুব বুদ্ধিমান মানুষ তো। ধরে নিতে পারেন এটা আমাদের দু'জনের পালাবার ফিকির। ফ্রান্সিস বলল।

কী জানি! রামাদ্দি কথাটা ঠিক বুঝল না।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, কাল থেকে এখানে আসা-যাওয়ার সময় পাগড়িপরা একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। উজিরের নজরদারিতে কোনও ফাঁক নেই। এক কাজ করুন—ঐ লোকটিকে বলুন এখানে এসে আমাদের নজরে রাখতে। সুবিধে পেলে আমরা পালিয়ে যেতে পারি একথাও বলবেন।

একটু ভেবে নিয়ে রামাদ্দি বলল, ঠিক আছে, যাচ্ছি। এসব ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায় ততই ভালো।

কথাটা বলে রামাদ্দি নীচে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে সেই পাগড়িপরা লোকটি এল। কোনও কথা না বলে একটা লম্বা পাথরের পাটাতনে চুপ করে বসে রইল। ভাবভঙ্গি নির্বিকার।

রাজি হবে? শাঙ্কো দেশের ভাষায় মৃদুস্বরে বলল।

আলবৎ রাজি হবে! ধনৈশ্বর্য পাবে অথচ একটা আঙুল নাড়ার কষ্টও হবে না—এ হয়? ফ্রান্সিসও দেশিয় ভাষায় বলল।

ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কিছু সময় গেল। রাস্তার দিকে পাথরের টুকরোর ওপর দিয়ে লোকজনের চলার শব্দ হল। একটু পরেই একদল যোদ্ধা উঠে এল। পেছনে রামাদ্দি।

নিন—লোকজন আনা হয়েছে। আপনার ইচ্ছে পূরণ করুন। একটু বিরক্তির সঙ্গেই রামাদ্দি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—কবিরা বোধহয় একটু অভিমানী হয়। এবার রামাদ্দি হেসে বলল—সত্যি, এভাবে বলা আমার উচিত হয়নি। মাফ চাইছি।

ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল—নীচে যে ভাঙা পাটা পাথরের স্তূপ পড়ে আছে, ওগুলো সব হাতে হাতে ফেলে দিতে হবে।

যোদ্ধারা কিছুই বুঝল না কেন ঐ সব ধসে-পড়া ভাঙা পাথর তুলে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু যোদ্ধা তো। প্রশ্ন করতে ওরা অভ্যস্ত নয়। ওরা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নীচে

নেমে এল। বন-জঙ্গলের দিকে পাথরের দেওয়ালটা ভেঙে গেলেও সবটা ভেঙে পড়েনি। ওরা পাথরের ভাঙা ও আস্ত পাটাগুলো তুলে সেই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে বাইরে ফেলতে শুরু করল। নিস্তব্ধ জায়গাটায় পাথর ফেলার শব্দ শুরু হল। বেশ কিছু পাটা ফেলা হতেই পাথরের মধ্যে একটা কাঠের পায়া উঁচু হয়ে আছে দেখা গেল। সেখানকার পাথর ফেলে দিতেই একটা শোবার আসবাব দেখা গেল।

খুব সাধারণ আসবাব। ধুলো-কাদায় মাখামাখি। ফ্রান্সিস খুশির চোখে শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, শাঙ্কো, এবার আমি নিশ্চিত। এর ওপরে একটা ঘর ছিল। কবি আবিদি সেই ঘরেই স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন।

ভাঙা দেওয়ালের দিকটায় দেখা গেল বেশ কয়েকটা ময়লা চামড়া মেশানো হলদেটে কাগজ। ফ্রান্সিস বলে উঠল, শাঙ্কো, যাও, খুব সাবধানে কাগজগুলো তুলে আনো। আর কাউকে হাত লাগাতে দিও না। শাঙ্কো খুব একটা বিস্মিত হল না। ফ্রান্সিসের অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কারের প্রত্যক্ষদর্শী শাঙ্কো। ও একছুটে গিয়ে খুব সাবধানে কাগজগুলো তুলতে লাগল। তবু জীর্ণ পাতাগুলোর এখানে-ওখানে ছিঁড়ে গেল। রামাদ্দির বিস্ময়ের শেষ নেই। শাঙ্কো সব ক'টা কাগজ সাবধানে তুলে এনে ফ্রান্সিসের হাতে আস্তে আস্তে একটা একটা করে দিতে লাগল। প্রথমটায় খুব অস্পষ্ট কিছু লেখা দেখে ফ্রান্সিস বুঝল আরবি অক্ষর। ওর বোধগম্য নয়। তখনই বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস কোথাও কোথাও খসে পড়া পাতাগুলির একটা রামাদ্দির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—সাবধানে ধরুন। রামাদ্দি সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে পাতাগুলি নিতে লাগল।

পরে পড়বেন। সাবধানে, ছেঁড়ে না যেন। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল।

রামাদ্দি যন্ত্রচালিতের মতো পাতাগুলি হাতে জড়ো করতে লাগল। তখনই সেনাপতি উঠে এল। যোদ্ধারা সন্ত্রস্ত হয়ে কাজ থামাল।

কাজ চলছে? যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে সেনাপতি গম্ভীর গলায় বলল। দু'একজন যোদ্ধা বলে উঠল—হ্যাঁ, জনাব।

ফ্রান্সিস বলল—রামাদ্দি, ভালো করে দেখুন তো, কিছু লেখা আছে মনে হচ্ছে।

একটা কাগজ আলতো হাতে নিয়ে একটুক্ষণ অস্পষ্ট হয়ে আসা অক্ষরগুলো দেখে রামাদ্দি বলল, আপনার অনুমান ঠিক।

কী লেখা আছে? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

ভালো পড়া যাচ্ছে না। যা পড়া যাচ্ছে সেটুকু পড়ে মনে হল, কেউ রোজনামচা মতো কিছু লিখেছে। তবে সন-তারিখ কিছু নেই।

রামাদ্দি, ওসব কবি আবিদির ছায়াসঙ্গী আবু হামিদের লেখা রোজনামচা।

তাড়াতাড়ি পাঠোদ্ধার করুন। এই লেখাগুলো থেকে অনেক কিছু জানা যাবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সব। ফ্রান্সিস বলে উঠল।

দেখছি বানান-টানান ভুল আছে। রামাদ্দি বলল।

স্বাভাবিক। আবু হামিদ খুব উচ্চশিক্ষিত ছিল না। এক কাজ করুন, বাইরে চড়া রোদে গিয়ে বসুন। সাবধানে পাতাগুলো পরপর সাজাবার চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে পাঠোদ্ধার করুন। দেখবেন, কোনও কাগজ যেন একেবারে ছিঁড়ে না যায়। একটু তাড়াতাড়ি করুন।

বিস্মিত রামাদ্দি কাগজগুলো নিয়ে ভাঙা ঘরের বাইরে চলে গেল। একটা লম্বাটে পাথরের পাটায় বসে আলতো হাতে কাগজগুলো নিয়ে নিয়ে পরপর সাজাল। তারপর পড়তে লাগল। সেনাপতি কোনও কথা না বলে ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখছিল। তার বিরক্ত মুখ দেখেই শাঙ্কো বুঝল, সেনাপতি এসবের কোনও অর্থই বুঝে উঠতে পারছে না। যোদ্ধারা কাজ থামিয়ে দাঁড়িয়ে একটু একটু হাঁপাচ্ছিল। ফ্রান্সিস ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—মেঝের কোনার দিকটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। হাত লাগাও ভাই। ওরা সেনাপতির মুখের দিকে তাকাল। সেনাপতি মাথা তুলে সম্মতির ইঙ্গিত করল। শুরু হল পাথর সরানোর কাজ। ভাঙা দেওয়ালের বাইরে পাথরের ভাঙা আস্ত পাটা পড়তে লাগল। আবার ঠক্ ঠকাস্ শব্দ শুরু হল। তখনই দেখা গেল কোনার দিকটা ভেঙে পড়েছে। ফ্রান্সিস দ্রুত এগিয়ে এসে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। বাইরে কড়া রোদ। কিন্তু ওখানটা খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট একটা উঁচিয়ে থাকা গোল লোহার কড়ামতো দেখল ভাঙা পাথরগুলির মধ্যে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হল। ও উজিরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব গোপন রাখবে। দু'তিনজন যোদ্ধাও ঐ লোহার কড়াটা অস্পষ্ট দেখেছিল। তাদের একজন ফ্রান্সিসকে বলল—ওটা কী? ফ্রান্সিস প্রশ্নটার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে বলল—তেমন কিছু না। দেওয়ালে গাঁথা থাকে মশাল রাখার যে কড়া তেমনই কিছু। তোমরা ভাই কাজ বন্ধ রাখো।

যোদ্ধারা ওখান থেকে সরে ওপরের ভাঙা সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি কাছেই দাঁড়িয়েছিল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার? ওখানে কী আছে? একজন যোদ্ধা হাত নেড়ে বলল—কিছু না। একটা ভাঙা লোহার কড়া।

ও। সেনাপতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল। তখনই রামাদ্দি কাগজগুলো নিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলো আবু হামিদেরই লেখা রোজনামচা। যথাসম্ভব পরপর সাজিয়েছি। অনেক শব্দ পড়া যায়নি। সবই কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে।

আসুন। ফ্রান্সিস সরে এসে সিঁড়িতে বসল। রামাদ্দিকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল। রামাদ্দি পাশে বসল।

এবার পরপর বলে যান। যতটুকু পড়তে পেরেছেন, সাজাতে পেরেছেন—পড়ুন। রামাদ্দি পাতাগুলো একটা একটা করে নিয়ে পড়তে লাগল—

শহরে জোর গুজব—সীমান্তে শত্রুসৈন্য—ক'দিন ধরেই গুজবের পর গুজব—আতঙ্ক। গভীর রাত। ঘুম ভেঙে—জনাব রব্বাহিকে—রব্বাহি প্রচণ্ড উত্তেজিত—পায়চারি—ভীষণ বিপদ—জনাব রব্বাহিকে—অনেক রাতে—মুখে মুখে গিজেল—লুকিয়ে লিখি—এরকম দেখিনি। আজ দেখছি—অন্যরকম—দেখছি—হামিদ—সব ধনসম্পদ—পালাব—লুঠ হয়ে যাবে। রামাদ্দি থামল। বলল—পাতা নেই। তারপর আবার লেখা—চোরকুঠুরি থেকে—কাঠে গিল্টি করা—ভার—জনাব তৈরি—অন্ধকার পথ—কাঁধ ভেঙে আসছিল—জনশূন্য চারদিক—আমাকেই দুর্গে ঢোকার ব্যবস্থা—পরিত্যক্ত ঘর—। রামাদ্দি থামল। বলল—পাতা নেই। একটা পাতা পড়াই যাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—তারপর?

রামাদ্দি পড়তে লাগল—খাদ্য-পানীয়—গভীর রাতে—খোঁড়া সুলেমান—সব জমা করি। রামাদ্দি থামল। বলল—পড়া যাচ্ছে না।

যা পড়তে পারছেন বলে যান। ফ্রান্সিসের গলায় স্পষ্ট উত্তেজনা। রামাদ্দি পড়তে লাগল—একটা বিষধর সাপ—মেঝেয় ঘোরে—মারতে দিলেন না—সিন্দুক রাখা—ফোঁস ফোঁস শব্দ—ঘুম—ভয়—আদর করেন—পোকামাকড়—বনজঙ্গল ঘুরে—জমাই—জানালার গরাদে—রাত জাগেন—গিজেল শুনি—গোপনে লিখি—জমিয়ে রাখি—এক গভীর রাতে—চিৎকার—অর্থহীন ঐশ্বর্য ছুঁড়ে ফেলে দেব—সিন্দুক ওঠা—গরাদ—বাইরে জোড়া খেজুর গাছ—খেজুর গাছ—দীর্ঘজীবী—মানুষের জীবন—ফেলে দেব সব—ছুঁড়ে—ঈশ্বরের আরাধনাই—শ্রেষ্ঠতম—সঞ্চয়ে শান্তি নেই—ছুঁড়ে ফেলে দেব। মহা শান্তি—ফুঁসে উঠল সাপ—। রামাদ্দি থামল। বলল—আর কোনও কাগজ নেই। হয়তো আরও কিছু গুছিয়ে লেখা ছিল। ফ্রান্সিস উত্তেজনার মধ্যে কথাগুলির ফাঁকগুলো মনে মনে সাজিয়ে ভেবে নিচ্ছিল। হ্যারির কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। হ্যারি থাকলে ঠিক সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারত। কিন্তু হতাশ হওয়া চলবে না। ও বলে উঠল—রামাদ্দি, মান্যবর উজিরকে খবর পাঠান, আর সব যোদ্ধাকে চলে যেতে বলুন। ওদের কাজ শেষ।

রামাদ্দি এ কথার কোনও অর্থই বুঝল না। ও ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো পাশে বসে সব শুনছিল। মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস যখন বলছে জানবেন এর পেছনে কোনও—মানে—গোপন কারণ আছে। ও যা বলছে তাই করুন।

রামাদ্দি উঠে দাঁড়াল। কাগজগুলো রেখে সেনাপতির কাছে এল।

কী সব বকবক করছিলেন? গিজেল বানাচ্ছিলেন? বিরক্ত সেনাপতি বলল।

ঐ রকমই। তবে লেখা গিজেল। এক্ষুনি মান্যবর উজিরকে খবর দিন। উনি যেন তাড়াতাড়ি আসেন। রামাদ্দি বলল।

সেনাপতি চলে গেল। বাইরে পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল—ঠক্ ঠকাস্। রামাদ্দি যোদ্ধাদের কাছে গেল। বল—ভাই, কাজ শেষ। মান্যবর উজির আসছেন। তোমাদের ছুটি। মান্যবরকে আমি যা বলার বলব।

যোদ্ধারা আস্তে আস্তে চলে গেল। শাঙ্কো দেশের ভাষায় মৃদুস্বরে বলল—উনি আসছেন। তুমি কি নিশ্চিত?

নীচে একটা গোল লোহার কড়া দেখেছ তো? ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

হ্যাঁ, খুব অস্পষ্ট। শাঙ্কো বলল।

ওটা একটা গিল্টিকরা সিন্দুকের কড়া। ওটাতেই রয়েছে কবি আবিদি রব্বাহির গুপ্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার। অবশ্য এখনও সঠিক সেটা বলার সময় আসেনি। অপেক্ষা করি।

সাবাস ফ্রান্সিস! তোমার সব অনুমান সত্যি। শাঙ্কো খুশির স্বরে বলে উঠল।

ওদের মৃদুস্বরে কথা বলতে দেখে রামাদ্দি কাছে এল। বলল—কী কথা হচ্ছিল?

এই ঘরের ওপরের ঘরেই কবি আবিদি রব্বাহি তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসনের শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গী আবু হামিদ। সাপ পোষ মানে কিনা জানি না। তবে এক বিষধর সাপের কামড়ে আবিদি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু হামিদের মৃত্যুর কারণ বা সময় এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

তবে তো তাঁদের পবিত্র দেহাবশেষ এইখানেই পাওয়া যাবে। রামাদ্দি বলল।

নিশ্চয়ই পাবেন। যদিও এতদিন পরে কতটা অক্ষত আছে বলতে পারব না। ফ্রান্সিস বলল।

আর কী সব খুঁজছিলেন সে সব? রামাদ্দি জানতে চাইল।

মান্যবর উজির এলে সবই জানবেন, দেখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল পাথুরে রাস্তায়। ফ্রান্সিস আর

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঝোপজঙ্গল সরিয়ে সরিয়ে দেখতে লাগল।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। দ্রুতপায়েই উঠে এলেন উজির। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—কী ব্যাপার? উদ্ধার করতে পেরেছ সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডার?

না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

শুনে উজির দু'হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গি করলেন। বললেন—তাহলে আমাকে কেন এভাবে ছুটিয়ে মারলে?

সেনাপতিকে বলুন একটা শক্ত দড়ি আর জাহাজের একটা নোঙর আনতে। ফ্রান্সিস বলল।

কী হবে ও সবে? উজির অবাক।

একটু তাড়াতাড়ি আনতে বলুন। ফ্রান্সিস শান্ত স্বরে বলল।

বিরস মুখে উজির সেনাপতিকে শক্ত দড়ি আর একটা নোঙর আনতে বললেন। রামাদ্দি তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে। ও তখন ভাবছে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! পরক্ষণেই ভাবল, ফ্রান্সিস তো কবি আবিদির মৃত্যুর ঘটনা বেশ গুছিয়ে বলে গেল। এটা কী করে সম্ভব? এত কথা যে বলতে পারে সে কখনওই পাগল নয়। সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। শুধু উজির হাতে ধরা ঘোড়া চালানোর চাবুকটা হাতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আবার ছেড়ে দিচ্ছিলেন। বেশ অসহিষ্ণু ভঙ্গি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দড়ি আর নোঙর নিয়ে সেনাপতি এল। এত তাড়াতাড়ি কী করে আনল সেটা আর কেউ জিগ্যেস করল না। ফ্রান্সিস বলল, মান্যবর, এবার সেনাপতিকে চলে যেতে বলুন। ওঁকে আর দরকার নেই।

উজির আর কারণ জানতে না চেয়ে সেনাপতিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সেনাপতি ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ফ্রান্সিস চুপ করে কান পেতে রইল। বাইরে সেনাপতির ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। সেটাও মিলিয়ে গেল এক সময়। ফ্রান্সিস উজিরের দিকে তাকিয়ে বলল—সব গোপন রাখব কথা দিয়েছিলাম। তাই সবাইকে সরিয়ে দিলাম। কবি রামাদ্দিকে আপনি কোনও গুরুত্বই দেননি। তাই উনি থাকুন। উনি অন্যরকম মানুষ। এবার আমার সঙ্গে আসুন।

ফ্রান্সিস ধীর পায়ে সেই ভেঙে পড়া জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। উজির পাশে এসে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিস সেই কড়াটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—ওটা একটা কাঠের গিল্টিকরা সিন্দুক। ওটার মধ্যেই আছে বিখ্যাত কবি আবিদি রব্বাহির ঐশ্বর্যভাণ্ডার।

উজির ভীষণভাবে চমকে উঠে বললেন—বলো কী? তাঁর তখন দু'চোখ কপালে।

ওটা তুলতেই দড়ি-নোঙর আনিয়েছি। ওখানে নামতে গেলে যে কোনও মুহূর্তে মেঝে ভেঙে পড়তে পারে। তাতে প্রাণহানি ঘটবে। এবার কাজে নামা যাক। শাঙ্কো, দড়ি নিয়ে এসো। রামাদ্দিও আসুন।

শাঙ্কো তো এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত। ও দড়ি এনে নোঙরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। ওরা দক্ষ নাবিক। দড়ির নানারকম গিঁট বাঁধতে ওস্তাদ। তারপর ঐ ভাঙা গর্তের মতো জায়গাটায় নোঙরটা নামিয়ে দিল। আবছা আলোয় লক্ষ্য স্থির করে নোঙরের বঁড়শির মতো মুখটা আস্তে আস্তে ঐ কড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর টেনে ধরল।

রামাদ্দি, হাত লাগান। ফ্রান্সিস দড়িটা ধরে বলল—খুব বেশি ভার হবে না। আবু হামিদ একাই কাঁধে করে এতখানি পথ এসেছিল।

বিস্ময়াভিভূত রামাদ্দি যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে এসে দড়িটা ধরল। দেখে উজিরও এগিয়ে এসে ধরলেন। চারজনে মিলে টানতে লাগল। একটু পরেই ভাঙা-আস্ত পাথরের পাটাতনে ঢাকা-পড়ে-যাওয়া সিন্দুকটা উঠে আসতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওটা তোলা হল। সত্যি কাঠের ওপর সোনা-রুপোর সুন্দর কাজ করা সিন্দুক। কিন্তু কোনও তালা ঝুলছে না। উজির একলাফে এগিয়ে এসে ডালা ধরে টান দিলেন। বেশ শক্তভাবে আঁটা কতদিন আগের সিন্দুক! দু'একবার টানাটানি করে জোরে শ্বাস ফেলে সরে দাঁড়ালেন। এবার শাঙ্কো এগিয়ে এসে জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই ডালাটা খুলে গেল। কিন্তু এ কী?—ভেতরটা শূন্য! পড়ে আছে চামড়া মেশানো কাগজের একটা বান্ডিল মতো। পাশে ওল্টানো একটা পাথরের দোয়াত আর ছুঁচোলো করে কাটা কলম। দোয়াতের কালো কালি কাগজের কোনায় আঠার মতো সেঁটে আছে। উজির স্তব্ধ হয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু রামাদ্দি উল্লাসে আনন্দে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। দ্রুত হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কাগজগুলো। ওপরের কাগজটায় আরবি ভাষায় লেখা কয়েক লাইন পড়েই সব কাগজগুলি বুকে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। চরম বিরক্তিতে নির্বাক উজির সেই কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন—থাম্ উজবুক।

কিন্তু কে থামাবে রামাদ্দিকে? রামাদ্দি কেঁদেই চলল। উজির অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে যেন। উজির উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন—এই তোমার আবিষ্কার! কতকগুলো বস্তাপচা কাগজ!

শাঙ্কোও বিস্ময়ে নির্বাক। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

এই রামাদ্দি, এই সিন্দুক তোল—তোল।

কাকে বলা? রামাদ্দি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। কাগজগুলো বুকে জড়িয়ে বসে বসে কেঁদে চলেছে।

ঠিক আছে, আমিই ছুঁড়ে ফেলছি। উজির কথাটা বলে ছুটে এসে ভারী সিন্দুকটা তুলে নিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে সেটাকে বাইরে ফেলে দিলেন। খুব জোরে শব্দ হল না। কতদিন আগেকার সিন্দুক। হয়তো ভেঙে কাঠের ডালা ছিটকেই গেল। সেই শব্দে ফ্রান্সিস চমকে উঠে ভাঙা দেয়ালের দিকে তাকাল। গরাদ থাকলে উজির কি পারতেন ঐ সিন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলতে? সঙ্গে সঙ্গে রামাদ্দির পড়া শেষ দিকটা মনে পড়ল—সব ছুঁড়ে ফেলে দেব—মহা শান্তি—! ফ্রান্সিসের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে হাসি ফুটে উঠল। উজিরের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল—বাইরে ঐ জঙ্গলের দিকে চলুন।

তার মানে? উজিরের বিস্ময়ের শেষ নেই।

ওখানেই ছড়িয়ে আছে কবি আবিদির ঐশ্বর্যভাণ্ডার। চলুন। ফ্রান্সিস একই ভাবে শান্ত স্বরে বলল। উজির বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন। লোকটা বলে কী?

ফ্রান্সিস ভাঙা সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলল—আসুন। উজির কী বুঝল কে জানে। ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। পেছনে শাঙ্কো। ফ্রান্সিসের উজ্জ্বল চোখ-মুখ দেখেই বুঝল—ফ্রান্সিস এবার ঠিক খুঁজে পেয়েছে।

তিনজন পেছনের জঙ্গলের কাছে এল। দুর্গের ভাঙা জানালাটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে বলল—ওই জানালা বরাবর জোড়া খেজুর গাছ পর্যন্ত এলাকাটা ভালো কের খুঁজতে হবে। সাবধান—বিষধর সাপ আছে। বুনো ঝোপ-জঙ্গল, গাছের নীচে পাবে মূল্যবান মণিরত্ন, সোনা-রুপো। রামাদ্দি থাকলে খুঁজতে সুবিধে হত। কিন্তু উনি এখন হিসেবের বাইরে। এসো। উজির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঝোপ-জঙ্গল কখনো উপড়ে ফেলে কখনো ডাল-টাল ভেঙে ফেলে নীচের পাথরকুচি মেশানো মাটি দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে দেখতে দেখতে এগোতে লাগল। কিছু পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস বুঝল প্রায় দেড়শো বছর আগের ঘটনা। পাথরকুচি মাটি জমে উঁচু হয়েছে। খুঁড়ে না ফেললে কিছু পাওয়া যাবে না। তখন জোড়া খেজুর গাছের কাছে এসে একটা ছোট বুনো গাছ হ্যাঁচকা টান দিয়ে উপড়ে ফেলল। এক চাপড়া পাথরকুচি মেশানো মাটি উপড়ে এল সেই সঙ্গে। দেখল চৌকোনা কিছুর একটা কোনা বেরিয়ে আছে। শাঙ্কো দ্রুত বসে পড়ে দু'হাতে ঘাস ছিঁড়ে মাটি সরিয়ে দেখল একটা ধুলো-মাটি মাখা চৌকোনা কিছু। ওটাও কয়েকটা টানে তুলে ফেলে ডাকল—ফ্রান্সিস, দেখো তো এটা কী? ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে শাঙ্কোর

কাছে এল। কোমর থেকে ফেট্টিটা খুলে চেপে চেপে মাটি, ঘাস, ঘষে তুলে ফেলতে ফেলতে দেখল সোনার লম্বাটে চৌকোনা পাটা মতো। তাতে কিছু লেখা। কিন্তু ভাষাটা বুঝল না। ওটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস উজিরের কাছে এল। উজিরের হাতে দিয়ে বলল—দেখুন তো, সোনার ওপরে কী যেন কুঁদে লেখা? উজির নিরেট সোনার জিনিসটা দেখে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। মাটিমাখা লেখাগুলো দেখতে দেখতে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কবি আবিদি রব্বাহিকে দেওয়া মানপত্র। হিব্রু ভাষায় লেখা। নীচে একজন খলিফার নাম রয়েছে। সন-তারিখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—এবার ওই জোড়া খেজুর গাছ পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটারই জঙ্গল, ঘাস খুঁড়ে ফেলুন। কিন্তু এখন নয়। গোপনে। রাত্রে। কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক নিয়ে খুঁড়বেন। কারণ আপনি সব গোপন করবেন বলেছিলেন।

—সব ধনৈশ্বর্য এখানে আছে? উজির আগ্রহে অধীর।

ফ্রান্সিস বলল—অবশ্যই আছে। একটা নমুনা তো আপনার হাতে। তারপর শান্তস্বরে বলল—এবার আমার শর্ত মনে করুন। আমাদের সবাইকে মুক্তি দিন।

—আগে সব উদ্ধার করি। উজির বলল।

—তাহলে আজ রাতেই কাজে নামুন। সারারাতে কিছু সম্পদ তো পাবেনই। তাহলে কাল সকালে আমাদের মুক্তি দিন। ফ্রান্সিস বলল—আমরা তাড়াতাড়ি পোতো বন্দরে গিয়ে জাহাজে উঠবো।

একটু ভেবে নিয়ে উজির বলল—কয়েকটা দিন থাকো। কিছু ভাগটাগ তো নেবে।

—একটি স্বর্ণমুদ্রাও চাই না। আমরা শুধু মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস দৃঢ় স্বরে বলল।

—ঠিক আছে। কাল সকালে দেখা যাবে। উজির বলল।

তখনই দেখা গেল রামাদ্দি ওদের দিকে ছুটে আসছে। ওর দু'গাল, বুকের কাছে পোশাক চোখের জলে ভেজা। ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া কালি লেগে আছে। উজির দ্রুত সোনার মানপত্রটা ঢোলা আলখাল্লার বুকের কাছে লুকিয়ে ধরে রইল। রামাদ্দি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফ্রান্সিসের কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে কান্নাভেজা গলায় বলল—কী অমূল্য সম্পদ যে আমাকে দিলেন! ফ্রান্সিস বুঝল ওর কাঁধের কাছে পোশাক রামাদ্দির চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে। হেসে বলল—বানান ভুল আছে কিন্তু। রামাদ্দি সে কথা কানেই তুলল না। বলল—আমার মহা সৌভাগ্য গুরুদেবের শেষ লিখিত গিজেলের আমিই প্রথম পাঠক। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ওর আনন্দ উদ্ভাসিত মুখের

দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই রামাদ্দি বলে উঠল—আপনি কি এই মহা-সম্পদ খুঁজছিলেন?

—এর কাছে সেসব তুচ্ছ। ফ্রান্সিস হেসে বলল। উজিরের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে বন্দীশালায় ফিরে যাচ্ছি।

কাল সকালেই আমরা মুক্তি চাই।

—রাতটা তো হাতে আছে। সকালেই খবর পাবে। উজির বলল।

—চলো শাঙ্কো। ফ্রান্সিস বলল—আমাদের কাজ শেষ।

উজিরের কাছে ফ্রান্সিসদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তায় এসে দেখল সেই লোকটা আজ দাঁড়িয়ে নেই। দুজনে হাঁটতে লাগল। শাঙ্কো বলল—অত মূল্যবান সম্পদ জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলল?

—মানুষের মন বড় বিচিত্র শাঙ্কো। কতরকম মানুষই তো দেখলাম।

—অত দামি দামি জিনিস কারো নজরে পড়ল না? শাঙ্কো বলল।

—দুর্গে সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ। তখনও সামান্য হলেও গাছ-গাছালি ছিল। সেই সময় যোদ্ধারাও বোধহয় বেশি থাকতো না দুর্গে। তারা জঙ্গলে যাবে কেন? তবে চোরটোর হয়তো গিয়েছিল। কিন্তু সব মূল্যবান সামগ্রী তো পায়নি। রাতের অন্ধকারে হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যদি পেয়েও থাকে কিন্তু ভয়ে বাইরে প্রকাশ করেনি। তবে লোকমুখে হয়তো কিছু গল্পটল্প চালু ছিল। নইলে এখানে চোরেরা আসবে কেন? গভীর রাতে সাপের কামড় খেয়ে মরতে লেকে কি যায়?

আধভাঙা দুর্গের বাইরে এল সবাই। উজির তো খুশিতে ডগমগ। সোনার মানপত্র লুকিয়ে নিয়ে দ্রুত লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘোড়ায় উঠল। জোরে ঘোড়া ছোটাল। রামাদ্দি সেই গিজেল লেখাগুলো নিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিল। সেই মন্থর গতিতে হেঁটে চলল পাথুরে রাস্তা দিয়ে। সে-ও আনন্দিত। তবে ধনসম্পদের চেয়েও অনেক মূল্যবান গুরুদেবের লিখিত গিজেল পেয়ে।

একজন প্রহরী এসে গরাদ দেওয়া দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো ঢুকতেই বিনোলারা দ্রুত ছুটে এল। শাঙ্কো একটু ক্লান্ত স্বরে বলল—খাওয়ার সময় সব বলবো। এখন খিদেয় পেট জ্বলছে। খেতে খেতে শাঙ্কো হাত ঘুরিয়ে চোখ-মুখে নানা ভাব প্রকাশ করে ফ্রান্সিসের কৃতিত্বের কথা বলতে লাগল।

রাতে ফ্রান্সিসের পাশে শুয়ে শাঙ্কো বলল—কী মনে হয় তোমার? উজির আমাদের মুক্তি দেবে?

—অবশ্যই। ধনসম্পদ রাত জেগে খুঁজে পাবেই। দু'এক রাত লাগতে পারে সব

সব উদ্ধার করতে। উজিরের কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কাজেই আমাদের মুক্তি দিতে আপত্তি করবে না। কারণ তাতে ওর কোনো লাভ নেই।

ভোর হল। সকালের খাবার খাওয়া হয়েছে সবে। গরাদে মুখ রেখে চড়া গলায় এক প্রহরী বলল—শুধু ভাইকিংরা বাইরে বেরিয়ে এসো। বাকিদের কয়েদ চলবে। মান্যবর উজিরের হুকুম।

শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে পড়ল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, উঠে এসো! আমরা মুক্তি পেয়েছি। ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এসে গরাদের সামনে জড়ো হল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতেই আস্তাসো ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দু'হাত জড়িয়ে ধরল। খুশি তবু দু'চোখে দুঃখ, কাতরতা। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে আস্তে আস্তে বলল—ভাই আস্তাসো, দুঃখিত। তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আমরাও যে এত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাব ভাবিনি। উজির ইয়েপুদা মানুষটা বড় ধূর্ত। একটু থেমে বলল—ঈশ্বরের কাছে তোমাদের দ্রুত মুক্তি কামনা করছি। আর কোনো কথা বলতে পারল না।

শব্দ করে গরাদের দরজা খেলা হল। বাইরে এসে ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল রোদের আকাশ। সাদাটে খণ্ড মেঘ নিথর দাঁড়িয়ে। আঃ মুক্তি! পৃথিবী কী সুন্দর!

ভাইকিংরা দল বেঁধে পাথর ছড়ানো রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সদর রাস্তায় উঠে এল। হাঁটতে লাগল পোতো বন্দরের দিকে।

রোদের তাত বাড়ছে। জোরে হাওয়া বইছে। ধুলো-বালি, শুকনো পাতা উড়ছে। রাস্তায় লোকজন। দু'পাশের বাড়ি-ঘর শেষ হল। শুরু হল চাষ-আবাদের এলাকা।

হঠাৎ শাঙ্কো বলে উঠল—ফ্রান্সিস, ওই দেখো কবি রামাদ্দি ছুটে আসছে। দেখা গেল রামাদ্দি ছুটতে ছুটতে আসছে। ওদের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমরা মুক্তি পেয়েছো শুনে ছুটে আসছি। বলেই সিনাত্রাকে জড়িয়ে ধরল। বলল—কবি-বন্ধু, কাল সারারাত জেগে কবিগুরুর গিজেলগুলো পড়েছি। কবি-বন্ধু, তোমাকে ছাড়া আর কাকে শোনাবো সেসব? কী অপূর্ব সেইসব গিজেল!

—কিন্তু আমরা যে দেশে ফিরে যাব। বড় তাড়া আমাদের। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—সবাই দাঁড়াও। রামাদ্দির দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক আছে। একটা গিজেল বলুন। ওই রোদ, ধুলো-পাতা ওড়া পরিবেশ রামাদ্দিকে দমাতে পারল না। ও সুর করে একটা গিজেল বলল—অর্থাৎ পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—কবে শুনেছিলাম ইবন্ মন্জিরের গিজেল—

ঐশ্বর্য সবার জন্য নয়। বিশ্বাস করেছিলাম। সঞ্চয় করেছি ঐশ্বর্য, খ্যাতি, সম্মান। আজ আমি সেই বিশ্বাস হারিয়েছি। উপলব্ধি করেছি ঐশ্বর্য সবার জন্য। খ্যাতি, সম্মান তুচ্ছ। ঐশ্বর্য আজ আমার কাছে তুচ্ছ।

—ব্বাঃ কী সুন্দর! মুগ্ধস্বরে সিনাত্রা বলে উঠল।

—কবি রামাদ্দি, রাত জেগে আপনি এখন ক্লান্ত। এবার ফিরে যান। বিশ্রাম করুন। ফ্রান্সিস শান্তস্বরে বলল।

—না না। আমার অভ্যাস আছে রাত জাগার। কত রাত—

—তবু আপনার মতো মানুষ যত দীর্ঘজীবী হয় আমাদের ততই মঙ্গল। ফিরে যান।

—বেশ। আপনার কথা রাখতেই হবে। আপনি শুধু বুদ্ধিমান নন, হৃদয়বানও। রামাদ্দি বলল।

সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে রামাদ্দি বলল—কবি-বন্ধু, গায়ক-বন্ধু, তাহলে বিদায়। রামাদ্দি ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধুলো-পাতা ওড়া পথ দিয়ে ফিরে চলল।

—চলো। ফ্রান্সিস বলল। আবার চলা শুরু হল। সিনাত্রা মৃদুস্বরে বলল—আশ্চর্য মানুষ। কেউ কোনো কথা বলল না।

জাহাজের ডেকে উঠে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো, এখুনি নৌকোয় চড়ে চলে যাও। মারিয়া, হ্যারিকে নিয়ে এসো। তোমরা এলে সবাই একসঙ্গে খাবো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে হালের দিকে ছুটল। ভেন হাসিমুখে এগিয়ে এল।

—ভেন, তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—না না। ভালো কথা, কয়েকজন যোদ্ধা এসেছিল। সব বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ওই যে ডেকে জড়ো করা।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—যাক, নতুন অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্যে কিছু সোনার চাকতি বাঁচল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, হ্যারিরা ফিরে এলে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে জাহাজ চালাবো। মাতৃভূমির দিকে।

বন্ধুরা সমস্বরে ধ্বনি তুলল—ও হো-হো।

তথ্যসূত্র :

১। দ্য ভাইকিংস—নিপোর্ড পি পোর্তুগাল—পান্ডি আর

২। ওরাল ট্র্যাডিশান অব অ্যানসিয়েন্ট অ্যারাবিক পোয়েট্রি—ব্রিকাকি পি. জে.

৩। স্প্যানিশ অ্যান্ড পোর্তুগীজ মনাস্টিক হিস্ট্রি—বিশ্‌কো সি. জে.

ইবু সলোমনের রত্নভাণ্ডার

বিকেল বিকেল সময়ে পোর্তো বন্দর থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ ছাড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য পশ্চিমদিগন্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের কাছে নেমে এল। লাল রং ছড়িয়ে পড়ল প্রায় মধ্য আকাশ পর্যন্ত। মারিয়া জাহাজের রেলিঙ ধরে বরাবরের মতো সূর্যাস্ত দেখছিল। ওর মনে আজ খুব আনন্দ। কতদিন পরে য়ুরোপে এসেছে ওরা। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পাশের দেশগুলিতে তো য়ুরোপের দেশগুলির মতো অত বাড়ি-ঘর নেই, উঁচু উঁচু গির্জার চুড়োও দেখা যেত না। লোক জনও পরিচিত পোশাক পরা নয়। মালবাহী যাত্রীবাহী জাহাজগুলির চলাচলও কম। এখানে তো মাঝে মাঝেই তেমনি জাহাজের দেখা পাচ্ছে। জাহাজগুলোর মাথায় মাস্তুলের উপরে উড়ছে পতপত করে নানা য়ুরোপীয় দেশের পতাকা—স্পেনের, ফ্রান্সের, জার্মানির এমনকি দূরের দেশ ফিনল্যাণ্ডের পতাকাও দু'একটা দেখেছে। হ্যারি অনেক দেশের খবর জানে, পতাকাও চেনে। জলদস্যুদের ক্যারাভেলের (ছোট ধ্রুতগামী জাহাজ) সাক্ষাৎ এখনও পায়নি। তবে ওরাও কম বুদ্ধিমান নয়। ওদের ক্যারাভেল জাহাজে নানা দেশের পতাকা ওড়ায়। কিন্তু কাছাকাছি এসে লুঠপাটের মতলব থাকলে হঠাৎ দুটো ট্যাঁড়া-দেওয়া সাদা হাড় আর নরকঙ্কালের মাথা আঁকা কালো পতাকা উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে যাত্রীজাহাজে নয়তো মালবাহী জাহাজের ওপর। অবাধে লুঠপাট চালিয়ে সবকিছু নিয়ে অন্য কোনও দেশের পতাকা উড়িয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। অবশ্য এটা য়ুরোপের এলাকা। বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের নজরদারি জাহাজ ঘুরে বেড়ায়। জলদস্যুদের মতলব বুঝতে পারলে সেই জাহাজ কয়েকশো মাইল তাড়া করে ধরে ফেলে। নিরীহ যাত্রীদের গভীর সমুদ্রে অসহায় অবস্থায় পেয়ে সর্বস্ব লুঠ করা, হত্যা করা কোনও সভ্য দেশই সহ্য করে না। বন্দী করে দেশে নিয়ে যায়। ক্যাপটেন তো বটেই সঙ্গী জলদস্যুরাও রেহাই পায় না। প্রকাশ্য স্থানে জনসমক্ষে ফাঁসিকাঠে দেয়। তাই এই অঞ্চলে জলদস্যুদের ভয় অনেক কম।

চারদিক অন্ধকার করে সন্ধ্যা নেমে এল। আকাশে বাঁকা চাঁদের আলো উজ্জ্বল হল। ভাইকিংরা রাতের খাওয়া সেরে জাহাজের ডেকে অনেকেই এসে জড়ো হল। বসে যায় নাচগানের আসর। সিনেত্রা সুরেলা গলায় দেশের গানও গায়। নিজের তৈরি গানও গায়। ফ্রান্সিস ওকে খুব উৎসাহ দেয়। সবাই খুশি। স্বদেশ আর বেশি দূরে নয়।

দুদিন পরে সেদিন রাতে আর আসর বসেনি। সবাই কেবিন ঘরে, ডেক-এ হালের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জোরে হাওয়ার আরামে ঘুমোচ্ছে সবাই। নজরদার পেড্রোও মাস্তুলের মাথায় ওর ছোট্ট জায়গাটায় গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গভীর রাত তখন। আবছা চাঁদের আলোয় একটা ছোটো জাহাজ বেশ দ্রুত দুলতে দুলতে এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজে ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। দশ-বারো জন য়ুরোপীয় নিঃশব্দে লাফিয়ে লাফিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে আসতে লাগল। সকলের হাতেই খোলা তরোয়াল। সমুদ্রে ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজে দুলুনিতো আছেই। জাহাজটায় গায়ে জোর ধাক্কা লাগলেও ফ্রান্সিসদের কারো ঘুম ভাঙল না। হালের কাছেই ঘুমিয়ে থাকা শাঙ্কোর সামনে একজন তরোয়াল হাতে দ্রুত এসে জোরে তরোয়ালের খোঁচা দিল। শাঙ্কো উঃ শব্দ করেই উঠে বসল। অবাক চোখে দেখল অল্প দাড়িগোঁফওয়ালা একজন য়ুরোপীয় লোক ওর দিকে তাকিয়ে মুখে আঙুল চেপে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল। লোকটার দশাসই চেহারা। গায়ে য়ুরোপীয় পোশাক। বেশ দামি। মাথায় লালচে লম্বা চুল সমুদ্রের হাওয়ায় এলোমেলো। কোমরে চামড়ার ফেট্টি। জলদস্যু নয় বোঝাই যাচ্ছে। তবে এ কে? ওদিকে বাকি কয়েকজনের গায়ে সাধারণ পোশাক। বোঝাই যাচ্ছে দামি পোশাক পড়া লোকটাই দলপতি। অন্য ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গীরা তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছিল। সবাই উঠে বসতে লাগল।

শাঙ্কো জিগ্যেস করল—তোমরা কারা?

—ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসী। তোমরা নোর্স। তাই না? লোকটা মৃদুস্বরে বলল। লোকটা ফিনদের ভাষায় বলল। ফিনল্যাণ্ড শাঙ্কোদের দেশ থেকে উত্তরে। খুব একটা দূরে নয়। শাঙ্কো মোটামুটি বুঝল। বলল হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং। য়ুরোপে আমরা নোর্স বলেও পরিচিত। কিন্তু হঠাৎ তরোয়াল উঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছ কেন?

—পাশেই আমাদের জাহাজ। নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজে খাবার জন্যে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসিনি। লোকটি দাঁত বের করে হাসল।

—তা তো ওরকম তরোয়ালের খোঁচা খেয়েই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের জ্বালাতে এলে কেন? শাঙ্কো বলল।

—খুব সহজ। তোমাদের জাহাজে দামি কিছু জিনিস মানে সোনা রূপো হীরে মুক্তো নিশ্চয়ই আছে। জলদস্যু হিসেবে তোমরাও জাহাজ লুঠ কর। আমরা সেসব লুঠ করতে এসেছি। বলে না, চোরের ধন চুরি করা। লোকটা, আবার দেঁতো হাসি হাসল।

—আর কিছু?

—সেটা পরে মানে শ্বেতাঙ্গ লোকদের ধরে বন্দী করে আরবীয় বনিকদের কাছে বিক্রিও করি। আশাতীত স্বর্ণমুদ্রা পাই। —আবার দেঁতো হাসি।

শাঙ্কো চুপ করে রইল। নিরস্ত্র অবস্থায় এদের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। যা বলে শুনে যাও। যা করে দেখে যাও। এরা লুঠেরার দল। ও শুধু বলল—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এটা উত্তর পোর্তুগাল। কাছেই সিনহো শহর বন্দর। তারই শহরতলিতেই আমরা আস্তানা গেড়েছি। এখানে অনেক জায়গায় আমরা দলবদ্ধভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আস্তানা করেছি।

—তাহলে সিনহো বন্দর নগরটা লুঠ করলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

—উঁহু। এই অঞ্চলের শাসক মুর। মুরদের রাজত্ব এখানে। শাসকের নাম ইবু গ্যাব্রিওল। সাংঘাতিক লোক, হিংস্র প্রকৃতির। সব সময় সন্দেহ। অবশ্য আমাদের ব্যবসায়ী বলে জানে। পশুর লোম, চামড়া, হাতে বোনা সুন্দর কাপড়টাপড়, কার্পেট এসব ধনী আরবীয় বণিকদের কাছে কেনা বেচা করি। থাকগে ওসব। তোমরা কতজন জাহাজে আছ? লোকটা জানতে চাইল।

—বেশি না। জনা পাঁচ-ছয়।

—তাহলে তো কেল্লা ফতে। একটু গলা চড়িয়ে সঙ্গীদের বলল—অ্যাই, তোরা পাঁচজন নীচে কেবিন ঘরটাতে তল্লাশি চালা। নিশ্চয়ই এদের লুঠ করা দামি সম্পত্তি পাবি।

দলনেতার কথা শেষ হতেই সিনাত্রা সুরেলা গলায় গেয়ে উঠল—চলো হে বন্ধুরা—পাহাড়ের উপত্যকায় বসন্ত এসেছে—এ-এ। শাঙ্কো সাঙ্গে সঙ্গে কাঠের ডেক-এ জুতো ঠুকে থপ্ থপ্ নাচ শুরু করে দিল। দলপতি সঙ্গে সঙ্গে থাম, বলে জোরে চেঁচিয়ে উঠেই সিনাত্রার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়াল চালাল সঙ্গে সঙ্গে। সিনাত্রার কাঁধের কাছে পোশাক কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তবে খুব বেশি গভীর ক্ষত হল না। কারণ শাঙ্কো দ্রুত এক ধাক্কায় সিনাত্রাকে সরিয়ে দিয়েছিল।

ওদিকে ডেক-এ অনেকের চলাফেরার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুমের মধ্যেও সতর্ক থাকা ফ্রান্সিসদের চিরদিনের অভ্যেস হয়ে গেছে। পরক্ষণেই সিনাত্রার গান আর শাঙ্কোর নাচের শব্দে ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। মারিয়াও ঘুম ভেঙে দেখল ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে এক ঝটকায় তরোয়ালটা বের করে ফেলেছে।

—কী হল? মারিয়া ভীতস্বরে বলে উঠল। ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপাস্বরে বলে উঠল—ওপরের ডেক-এ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নইলে এত গভীর রাতে সিনাত্রা কক্ষনো গান গায় না, শাঙ্কোও নাচ জুড়ে দেয় না। ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু ওপরে উঠল না। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপরে কী ঘটছে আর এক্ষুনি ওপরে উঠবে কিনা, শাঙ্কোরা কোনও সঙ্কেত দেয় কিনা তার জন্যে কান পেতে রইল।

ওপরের ডেক-এ এবার দলপতি নিঃশব্দে তরোয়াল উঁচিয়ে সিঁড়িঘর দেখাল। তারপর নিজেই সিঁড়িঘরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে পেছন ফিরে সঙ্গীদের নামতে ইঙ্গিত করল। পাঁচজন সঙ্গী খোলা তরোয়াল হাতে দলপতির পেছনে এসে দাঁড়াল। অন্যেরা ঘুরে ঘুরে শাঙ্কোদের পাহারা দিতে লাগল। বিনোলা এই সুযোগের জন্যে তক্কে তক্কে ছিল শেষ সঙ্গীটির ওঁচানো তরোয়ালের ডগাটা সিঁড়িঘরের মাথায় লেগে গেল। ও টাল খেয়ে মাথা নিচু করতেই বিনোলা বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে মাথার কাছে ঝুলন্ত কাচ-ঢাকা আলোটা এক থাবড়ায় নিভিয়ে দিয়েই শেষ সঙ্গীটির ওপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় অন্ধকারে শেষ সঙ্গীটি ছিটকে পড়ল সামনের সঙ্গীদের ওপর, সবাই মিলে অন্ধকারে টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল সবার সামনে দলপতির উপর। সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় দলপতি মুখ থুবড়ে পড়ল সিঁড়ি থেকে ছিটকে নীচের কাঠের মেঝেয়। দলপতির হাত থেকে অন্ধকারে কোথায় ছিটকে পড়ল তরোয়ালটা। ওর নাক ভেঙে গেল। ঠোঁট ফেটে গেল। সারা মুখে রক্ত ছুটল। পেছনের সঙ্গীদেরও কয়েকজনের কপাল ফেটে গেল, কারো হাঁটু ভাঙল, কারো হাত। তাদের হাতের তরোয়ালও ছিটতে গেল। শুধু দুজন সবার ওপরে ছিল। তাদের হাতেধরা তরোয়াল হাতেই রইল। সকলের ওপর পড়ল বিনোলা, অক্ষত। ওর ওপরে তো কেউ ছিটকে পড়েনি। সিঁড়িঘরের অন্ধকারে আর্তনাদ, গোঙানি, শুরু হল। বিনোলা ততক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে কয়েক হাত দূরে ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে পড়েছে। ফ্রান্সিস বিনোলাকে তুলে পেছনে ঠেলে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—কেউ লড়তে এসো না, নির্ঘাৎ মারা যাবে। যে দুজনের হাতে তরোয়াল ছিল তারা উঠে দাঁড়াল ঠিকই, কিন্তু বাকি সবাই তখন ভাঙা কনুই,-পা, ফাটা কপাল নিয়ে গোঙাতে শুরু করেছে। অন্ধকারে সিঁড়িঘরে আর্তনাদ, গোঙানি চলল। তরোয়াল হাতে দুই সঙ্গী অন্ধকারে ফ্রান্সিসকে দেখতেই পেল না। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় এগিয়ে এসে সামনের সঙ্গীটির গলায় তরোয়ালের ডগা চেপে বলল—তরোয়াল ফেলে দাও। ও কিছু না বুঝে থমকে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের ডগা আরো জোরে চেপে ধরল। কেটে গেল গলা। অন্যজন তখন ভয়ে তরোয়াল ফেলে দিয়েছে।

ফ্রান্সিস সিঁড়িঘর দিয়ে আসা নিস্তেজ আলোয় ভালো করে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া, মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে এসো। কোনও ভয় নেই।

একটু পরেই মারিয়া মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে এল। মোমবাতিটা বিনোলা হাতে নিয়ে তুলে ধরল। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল, সামনেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে দলপতি। পরনে দামি পোশাক ও কোমরের চওড়া চামড়ার কোমরবন্ধনী সোনার কাজ করা। নাক-চোখ মুখ রক্তে মাখামাখি। ফ্রান্সিস সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল—বিনোলা এটাই গুণ্ডা দলের সর্দার, তাই না?

—হ্যাঁ, বিনোলা বলল।

—যা দেখছি মাসখানেক বিছানা থেকে উঠতে পারবে না। কিন্তু এই গুণ্ডার দল এখানে এল কী করে?

—একটা ছোটো জাহাজ চড়ে। এরা ফিনল্যাণ্ডের লোক। এখানে উত্তর পোর্তুগা ডেরা বেঁধেছে। নিজেদের সাধারণ ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয়। আসলে দাস-ব্যবসায়ী। তবে খুব উঁচু দরের। শুধু শ্বেতাঙ্গদের ধরে। তারপরে প্রচুর আরবীয় স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বড়লোক আরবীয় বণিকদের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। বিনোলা বলল।

—ব্বাঃ! তাহলে তো শুধু মুখ-হাত-পা ভাঙলে চলবে না, সবকটাকে নিকেশ করতে হবে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল।

আহত সঙ্গীরা তখন কেউ ভাঙা পা চেপে ধরে, হাতে কনুই চেপে ধরে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল। সকলেই মুখচোখ বিকৃত করে ব্যথাবেদনা সহ্য করছে। মৃদু গোঙাচ্ছেও। যে সঙ্গীটি তরোয়াল ফেলে দিলেছিল সে এবার করুণ স্বরে বলে উঠল—আমাদের মেরো না। সর্দারের নির্দেশেই আমরা এই জঘন্য কাজ করতে বাধ্য হয়েছি।

—ঠিক আছে তোমাদের জাহাজে চলে যাও। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো—বরং উপোস করে মরবো কিন্তু এরকম দস্যুতা আর ক্রীতদাস ব্যবসায়ে জড়াবে না।

দুজনই একসঙ্গে বলে উঠল—আমরা প্রতিজ্ঞা করছি। ফ্রান্সিস আহতদের দিকে তাকিয়ে বলল—সবাই ওপরের ডেক-এ যাও। কেউ নিজেদের জাহাজে গিয়ে উঠতে পারবে না। চলো, আমরাও যাচ্ছি। আহতরা হাত-পা চেপে ব্যাথায় গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

ওদিকে ওপরে যে কজন দলপতির সঙ্গী ছিল তারা বিনোলাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল। দলপতি আর সঙ্গীদের হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ার জোর শব্দ শুনল। বুঝল ওরা পরস্পর জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ল। তারপরই

আর্ত চিৎকার। ওরা হকচকিয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো এই সুযোগটা কাজে লাগাল। দেশীয় ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল— সবাই এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে থাকো। সবাই সারি ভেঙে হালের দিকে, সামনের দিকে, সিঁড়িঘরের দিকে ছুটোছুটি শুরু করল। কিন্তু সব কজনকে সামলাবে কী করে? ওরা অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে পরে হাঁপাতে লাগল। এবার শাঙ্কো আবার গলা চড়িয়ে বলল—ওদের ওপর ঝাঁড়িয়ে পড়ো। তরোয়াল কেড়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ক্লান্ত সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এসব লড়াই শাঙ্কোরা অনেক বার লড়েছে। দুজন সঙ্গীর হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। শাঙ্কোরা কয়েকজন ছুটে গিয়ে তরোয়াল দুটো তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। সঙ্গীরা এত দ্রুত আক্রমণের আশঙ্কা করেনি। হতবাক হয়ে শাঙ্কোদের দিকে তাকিয়ে রইল। তরোয়াল হাতেই রইল। শাঙ্কো জোর গলায় বলে উঠল— তরোয়াল ফেলে দে। লড়তে এলে কেউ বাঁচবি না। বাকিরা তবু তরোয়াল ফেলল না। তখনই আহত সঙ্গীরা গোঙাতে গোঙাতে ডেক-এ উঠতে লাগল। সবাই উঠে এল। নীচে দলপতির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। অসাড় পড়ে আছে।

ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। চারদিকে ভোরের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস-বিনোলা-মারিয়াও এবার ডেক-এ উঠে এল। তিনজনের হাতে তরোয়াল দেখে ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিদের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ওরা পিছু হটে গেল। শাঙ্কো আর এক বন্ধু তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে ছুটে এস। সঙ্গীরা এবার ভয়ে হাতের তরোয়াল ডেক-এর ওপর ফেলে দিল।

ফ্রান্সিস দলপতির ছোট জাহাজটার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল দলপতির পাঁচ-সাতজন সঙ্গী খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এর ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—তোদের মারাত্মক জখম সঙ্গীদের তো দেখতেই পেলি। তোদের দলপতি অজ্ঞান হয়ে নিচে পড়ে আছে। ওরা ওকে নিয়ে আসছে। তোরা গোপনে ক্রীতদাস ব্যবসা করিস। এই জঘন্য নির্মম কাজের জন্যে তোদের সভ্য সমাজে স্থান নেই। লড়তে এলে সব কটাকে আহত নয়, একেবারে নিকেশ করে দেব।

ওদিকে দলপতিসহ তার সঙ্গীদের সিঁড়ি দিয়ে ছিটকে গড়িয়ে পড়ার জোর শব্দে অন্য ঘুমন্ত ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হ্যারিও ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল। তিলমাত্র দেরি না করে অস্ত্রঘরের দিকে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠল, ভাইসব, তরোয়াল নিয়ে ডেক-এ উঠে আসো। ওরাও উঠে পড়ে দ্রুত অস্ত্রঘরের দিকে যেতে লাগল। তরোয়াল নিয়ে ওরা সিঁড়ির দিকে

ছুটল। আবছা আলোয় কেউ দেখল সিঁড়ির নিচে কে কনুই চেপে ভর করে দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। অন্যরকম পোশাক। কেউ দলপতিকে ডিঙিয়ে ছুটল। কেউ ওর কাঁধ, হাত মাড়িয়ে দিয়ে গেল। দলপতি আবার সটান শুয়ে পড়ল। কয়েকজন ওর মুখ, বুক মাড়িয়ে দিয়ে ছুটে গেল। দলপতি আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

দু-তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। বাকিরা কাছে এসে দাঁড়াল। বাকিরা আহত ও অন্য সঙ্গীদের ঘিরে দাঁড়াল।

—সিঁড়িতে নীচে কে পড়ে আছে? হ্যারি জিগ্যেস করল।

—এই জাহাজের দলপতি। ওর সঙ্গীদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। কথাটা বলে ফ্রান্সিস গায়ে লাগা ছোট জাহাজের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল—সবার আগে একটা কাজ করতে হবে। তোদের জাহাজে নিশ্চয়ই কিছু শ্বেতাঙ্গকে ক্রীতদাস হিসেবে আরবীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করবি বলে বন্দী করে রেখেছিস। এক্ষুনি সবাইকে আমাদের জাহাজে তুলে দে। তোদের দলপতি আর সঙ্গীদের তখন তোদের জাহাজে তুলে দেব। তার আগে নয়।

সঙ্গীরা দলপতিকে না দেখে আর সঙ্গীদের ঐ অবস্থা দেখে বুঝেছিল একটা কিছু হয়েছে। দু'তিনজন তরোয়াল ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সাতজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে ডেক-এ নিয়ে এল। শতচ্ছিন্ন পোশাক। মাথার চুলে জট পাকানো। তবে সুস্থ সবাই। ক্রীতদাসের ব্যবসাতে সুস্থদেহী যুবকই বেশি দাম দিয়ে কেনা হয়। শেষের জনকে দু তিনজন সঙ্গী ধরে ধরে নিয়ে এল। বয়স্ক। মাথার চুল দাড়ি গোঁফ সাদা। বেশ দুর্বলও। পরনে শতচ্ছিন্ন পোর্তুগীজ পোশাক। হ্যারি বলে উঠল-আশ্চর্য। এই বৃদ্ধকে তো একটা রুপোর মুদ্রা দিয়েও কেউ কিনবে না। একে বন্দী করে রেখেছিস কেন?

—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ফ্রান্সিস বলল। সুস্থরা সবাই সহজেই দুলনির মধ্যেও ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। কিন্তু বৃদ্ধকে কাঁধে চাপিয়ে সঙ্গীরা আর কয়েকজন ভাইকিং মিলে এই জাহাজে নিয়ে এল।

—এর পরেও এই জঘন্য ব্যবসায়ীদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত? ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলে উঠল। হ্যারি শান্তস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, ভুলে যেও না এরা সভ্যদেশের মানুষ। সভ্যজগতেই ওরা মানুষ হয়েছে। কাজই সভ্যভদ্র নীতিবাদী মানুষদের তো ওরা দেখেছে। দেখো না এদের সভ্য, সৎ ও ভদ্র জীবন কাটাবার জন্যে একটা সুযোগ দিয়ে। ভুল বুঝতে পেরে অন্যায় অমানবিক কাজ ছেড়ে হয়তো ভালো হতে পারে। যারা পারবে না তারা উচ্ছন্নে যাক।

—ঠিক আছে। তোমার কথাই মেনে নিলাম। সেই বৃদ্ধকে তখন শাঙ্কোরা ধরে ধরে সিঁড়িঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ঐ বৃদ্ধকে আমার কেবিন ঘরে নিয়ে যাও। ওকে প্রথমে ভালো করে স্নান করাবে। নতুন পোশাক পরাবে। ভেনকে ডেকে আনবে। ভেন যেমন বলে করবে। তারপর ওকে মারিয়ার জিম্মায় রেখে চলে আসবে। শাঙ্কোরা বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মারিয়াও ওদের পেছনে পেছনে চলল। এবার ফ্রান্সিস সুস্থ দুই সঙ্গীকে—তোমরা সিঁড়ির নীচে যাও। তোমাদের সর্দারের জ্ঞান ফিরুক বা না ফিরুক তুলে নিয়ে ডেক-এ এসো।

ওরা দুজনেই ছুটল সিঁড়িঘরের দিকে। একটু পরেই ওরা অনেক কষ্টে দলপতিকে এনে ডেক-এ শুইয়ে দিল। দলপতির তখন জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু নড়াচড়া নেই। কোনোরকমে চোখ খুলে পিটপিট করল। মুখ দিয়ে শব্দও করতে পারছিল না। আহত সঙ্গীরা ডেক-এর এক পাশে শুয়ে-বসে ছিল। অল্পস্বল্প কাতরাচ্ছে নয়তো গোঙাচ্ছে। ওদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—সবাই যেভাবে পারো তোমাদের জাহাজে গিয়ে ওঠো। তারপর ডেক-এ সবাই এসে দাঁড়াবে।

—ওরা একা একা গিয়ে জাহাজে উঠতে গেলে বেলা হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমরা একটু সাহায্য করলে ওদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে পারব। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

হ্যারি বিনোলাকে ডেকে ঐ আহতদের ওদের জাহাজে উঠতে সাহায্য করতে বলল। সুস্থ দুই সঙ্গী আর কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুকে নিয়ে বিনোলা ওদের অনেক কষ্টে ঐ দুলুনির মধ্যে ওদের জাহাজে তুলে দিল। দলপতিকে ওরা তখন কেবিন ঘরে নামিয়ে নিয়ে গেলে বাকিরা এসে ওদের ডেক-এ সার দিয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে গলা চড়িয়ে বলতে শুরু করল—ভালো করে শোনো। আমরা তোমাদের চেয়ে সংখ্যা বেশি। তোমাদের সবকটাকে নিকেশ করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যারা আহত হবে তাদের ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। ক্ষুধার্ত হাঙরের পাল তাহলে খুশিতে লাফালাফি করবে। কিন্তু আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে তোমাদের মুক্তি দিলাম। ফ্রান্সিস থামল। দলপতির সঙ্গীরা ততক্ষণে ফ্রান্সিসের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে বুঝে গেছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল ওরা। ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—কিন্তু একটা শর্ত আছে। কেউ আর দাস-ব্যবসার মতো জঘন্য কাজে জড়াবে না। সোজা তোমাদের

জন্মভূমিতে ফিরে যাবে। যারা আবার এখান থেকে ডেরা বেঁধে ঐ ব্যবসায় সাহায্য করবে তারা নরকে যাক। ব্যস্-আর কিছু বলার নেই। এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে দাও। এক্ষুনি—যাও।

সঙ্গীদের মধ্যে নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রাতের আবছা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নিঃশব্দে যে কাছিটা ওরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছির সঙ্গে বেঁধেছিল, শাঙ্কো ছুটে গিয়ে সেই কাছিটা তরোয়াল দিয়ে কয়েকবার পেঁচিয়ে কেটে ফেলল। ওদের জাহাজটা যেন জোরে ধাক্কা খেয়ে দুলতে দুলতে বেশ দূরে চলে গেল। তিনটে পাল নামানো ছিল। দ্রুত সেই তিনটে পাল খুলে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দস্যু ও দাস-ব্যবসায়ীদের জাহাজ অনেক দূরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্তৃত সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিস নিজেদের কেবিন ঘরে এল। দেখল সেই বৃদ্ধটি বিছানার একপাশে বসে আস্তে আস্তে খাচ্ছে। সামনে মারিয়া দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধের খাওয়া দেখাশুনো করবে। বৃদ্ধের পরনে নতুন পোশাক। বোঝা যাচ্ছে সযত্নে বৃদ্ধকে স্নান করানো হয়েছে। মাথার পাকা চুলও অনেকটা বিন্যস্ত। ফ্রান্সিসরা ঢুকতে বৃদ্ধ তৃপ্তির হাসি হেসে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিসও হেসে বলল—কী? এখন ভালো লাগছে তো? পোর্তুগীজ ভাষাতেই জিগ্যেস করল।

বৃদ্ধ কোনও কথা না বলে মাথা কাত করল। তারপর আস্তে আস্তে খেতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল বৃদ্ধ পোর্তুগীজ। ও বলল—আপনার নাম কী?

—আলফানসো। খাওয়া থামিয়ে বৃদ্ধ মৃদুস্বরে বলল।

—আপনি পোর্তুগীজ?

—হ্যাঁ, দক্ষিণ পোর্তুগালে সমুদ্রের ধারে একটা গ্রামে আমার জন্ম।

—তবে এখানে এলেন কেন?

বৃদ্ধ ফোকলামুখে হেসে বলল—আমি আপনাদের দেশে স্ক্যান্ডানেভিয়াতেও গেছি। আপনাদের দেশের ভাষা, শুধু বুঝিই না বলতেও পারি। ফরাসি জার্মান আরবী ফার্সি মিলিয়ে পাঁচ-ছটা ভাষা আমি আমার মাতৃভাষার মতোই বলতে পারি।

ফ্রান্সিস অবাক হয়ে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারিও অবাক। বলল —এত দেশ ঘুরেছেন কেন?

—জ্ঞানসংগ্রহের জন্যে। একটা সত্য জেনেছি প্রত্যেক জাতিই তার মাতৃভাষাকে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

ফ্রান্সিস বলল—আপনার এই অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছি—বেশ অত্যাচার হয়েছে আপনার ওপর। দেশ-দেশান্তরে গেছেন, ঘুরেছেন। শরীরটা আপনার তাই ভেঙেও পড়েছে। আপনার কাছে সবকিছু জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু এখন নয়। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নিন। রাতের খাওয়ার পরে আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলব। ততক্ষণে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। ওদিকে বাকি সাত শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসদের জন্য একই ব্যবস্থা হল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে এসে বসল। আলফানসোকে অনেক তরতাজা মনে হল।

—আপনি এখন ভালো আছেন তো? ফ্রান্সিস একপাশে বসে আলফানসোকে জিজ্ঞেস করল। আলফানসো হেসে মাথা কাত করল। তারপর বলল-শুনলাম তোমরা ভাইকিং। তোমার নাম ফ্রান্সিস। অনেক গুপ্তধন নাকি বুদ্ধি খাঁটিয়ে খুঁজে বের করেছ।

—ওসব থাক। আপনার কথা বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো এক ইতিহাস। গপ্‌পো লেখা যায়। তবে সব সত্যি, গপ্‌পো না। থেমে বলল-শোনো তোমাদের বিরকা নগরেও আমি কিছুদিন ছিলাম। একটা সত্যিই আমি বুঝেছি তোমরা দুঃসাহসী বীরের জাত। অন্যায় তোমরা সহ্য কর না।

—আবার জলদস্যু হিসেবে আমাদের দুর্নামও আছে। হ্যারি হেসে বলল।

—হ্যাঁ তাও শুনেছি। দেখো, সবাই যদি নীতিবাদী সত্যবাদী হত, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারত তাহলে তো স্বর্গই হত এই পৃথিবী। যাক গে—সে সব কথা। অতি সংক্ষেপে প্রথম থেকেই বলি। একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে যে। ফোকলা মুখে হেসে আলফানসো বলল।

—নিশ্চয়ই শুনব। আপনি জ্ঞানীগুণী মানুষ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই এমন একজন মানুষের এইরকম দুরবস্থা হল কেন সেটাই বুঝতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ছোটবেলা কেটেছে দক্ষিণ বন্দর এলাকায়। অভাবী ঘরের সন্তান। দুবেলা খেতেই পেতাম না। পড়াশুনা করার কথা তো স্বপ্নেও ভাবতাম না। দিনরাতের অনেকটা সময় সমুদ্রতীরেই কাটাতাম। আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম সীমাহীন সমুদ্রের দিকে। কত কথা ভাবতাম। সমুদ্রের সঙ্গে সেই আমার বন্ধুত্বের শুরু। সবে যুবক তখন। এক মালবাহী জাহাজে এক আবছা অন্ধকার সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম। নামেই নাবিক। ডেক মোছা থেকে শুরু করে রান্নার সাহায্য

করা সবই করতে হত। স্পেনের এক বন্দরে একরাতে নেমে পড়লাম। কাজ করে যে অর্থ রোজগার করেছিলাম তাই নিয়ে এক সস্তা সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম। থেমে একটু দম নিল আলফানসো।

ঠিক আছে। এখন ঘুমোন। পরে না হয়—হ্যারি বলল।

আলফানসো মৃদু হেসে ওর পাকা চুলভর্তি মাথা নাড়ল। বলল—দেখো, স্মৃতি—তা যত সুখেরই হোক বা যত দুঃখের, যত বেদনারই হোক—অনেকটা কবিতা বা গানের মতো মনে করতে বসলে ডুবে যেতে হয়। বলতে ভালো লাগে। নিজেকে যেন নতুন করে বার বার চেনা যায়। যা হোক-একটা দুঃখ কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই আমার ছিল। অভাব দারিদ্র্য নয়—অশিক্ষার নিরক্ষরতার দুঃখ। এই দুঃখ দূর করব-শিক্ষিত হব এই সংকল্পটা আমার বরাবরই ছিল। তাই যেখানে গেছি, সেই দেশের ভাষা তো বটেই, সাহিত্য, ইতিহাস জানার সুযোগ নিয়েছি। সেই দেশে পৌঁছেই খোঁজ করেছি শিক্ষার জায়গার। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা নেব সে সাধ্য তো ছিল না।

শিক্ষাদানের স্থানে কাকুতি-মিনতি করে শিক্ষার্থীদের সবার পেছনে জায়গা জুটিয়েছি। আশ্চর্য কি জান তাঁরা কিন্তু কেউ আমাকে বিমুখ করেননি। উপোসী থেকেও সেসব জায়গায় গেছি। পাঠ শুনেছি। কোনও কোনও রাত কোনও কোনও দিন আমার অনাহারে কেটেছে। একটা সত্য আমি জীবন দিয়ে বুঝেছি—যদি সততার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের জ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা কর—কোনও বাধাই বাধা নয়। কথাটা বলে আলফানসো পোশাকের হাতা দিয়ে চোখ মুছল। ফ্রান্সিসরা কেউ কোনও কথা বলল না।

—যাক ওসব কথা। সবশেষে উত্তরের অত ঠান্ডা সহ্য করতে পারলাম না। চেয়ে চিন্তে ছেঁড়া পোশাক পরে থাকা—বেশ অসুস্থ হয়ে ফিরে এলাম ফরাসিদের দেশে। জান তো ফরাসিরা ভীষণ কবিতা ভালোবাসে। কত জায়গায় কবিতার আসর বসে। সময় পেলে শরীর সুস্থ থাকলে সেইসব আসরে যেতাম। মানুষ, পোশাক নিয়ে ওখানে কারো কোনও কৌতূহল নেই। কিছুদিনের মধ্যে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করে ফেললাম। এবার আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা কাজে লাগালাম। সমুদ্র আজও আমার কাছে বিস্ময়। প্রকৃতির বিচিত্র রূপও দেশে দেশে দেখেছি। কবিতা লিখতে লাগলাম। কিছু কিছু আসরে কবিতা পাঠও করতে লাগলাম। আমার মাতৃ ভাষা ফরাসি নয়। কাজেই অনেক কবির সঙ্গে এইজন্যেই আমার বন্ধুত্ব হল। এবার অভিজাত শ্রেণীর আসরেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হল। অর্থ ও খাদ্য যথেষ্ট পেলাম। আমি যেন নতুন জীবন পেলাম। এমনি এক আসরে

পরিচয় হল এক বিখ্যাত কবির সঙ্গে। তিনি অযাচিতভাবে আমার কবিতার খুব প্রশংসা করলেন। কয়েকদিন মেলামেশার পর বললেন—আপনি বিদেশি। কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভালোবেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা লিখেছেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তাই আপনি নতুন একটা ধারা আনতে পেরেছেন। এটা কম কথা নয়। তবু আমি অনুরোধ করছি—দেশে ফিরে যান। নিজের মাতৃভাষায় কাব্যসাহিত্য রচনা করে স্বদেশের ভাষাকে সমৃদ্ধ করুন। একেই বলে মাতৃঋণ শোধ করা। আন্তরিক চেষ্টা করুন। আলফানসো থামল। কয়েবার জোরে শ্বাস নিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—ফ্রান্সিস ওঁকে বিশ্রাম করতে দাও। ঘুমিয়ে পড়ুক। মারিয়া একটু ভয়-মেশানো সুরে বলল।

আলফানসো মৃদু হেসে হাত তুলে অভয় দিল। তারপর বলতে লাগল—সেই রাতে সরাইখানার শুয়ে খুব গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম সেই কবির কথাগুলো। তারপর প্রায় শেষ রাতে স্থির করলাম—আর বিদেশে-বিভুঁইয়ে নয়। দেশে এই সিনহো বন্দর নগরে ফিরে এলাম। দেখলাম—স্বদেশের চেহারা পাল্টে গেছে। দুর্ধর্ষ মুরজাতি স্বদেশের অনেক অংশ দখল করে নিয়েছে। এখানেও যিনি শাসক তিনিও মুর। ইবু সালোমান। দুর্ধর্ষ সাহসী যোদ্ধা ওরা। তবে মুররা ছিল পরধর্ম-অসহিষ্ণু। দোষ কী দেব বলো? জীবনকে যে যেমনভাবে দেখে। কিন্তু আশ্চর্য কি জান এই ইবু সালোমান একেবারে অন্য ধাতুতে তৈরি। নিজের ধর্মের প্রতি যেমন পরধর্মের প্রতিও তেমনি শ্রদ্ধা। শুধু তাই নয়—নিজে যথার্থ কবি। মুওয়া মু মুহাম মানে আরবী ভাষায় মুখে মুখে কবিতা বানিয়ে বলা—মানে—

—হ্যাঁ। জানি—জিগেল। সুর করে বলা হয়। হ্যারি বলল।

—তোমরা জান? আলফানসো একটু আশ্চর্য হল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই প্রকৃতির এক মুর শাসকের পরিচয় আমরাও পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্য অদ্ভুত মানুষ এই ইবু সালোমান। তাঁর কথা বলে শেষ করতে পারব না। যাক-কী করে তাঁর সংস্পর্শে এলাম, কী করে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে গেলাম সে অনেক কথা। বিরাট তাঁর বাড়ির একটি ঘর নির্দিষ্টই ছিল। জিগেলের আসর বসত সেখানে। সেই ঘরের পাশেই একটি শয়নকক্ষের পালঙ্কে তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে ডাকতেন। কত রাত আমরা কাব্যর্চচা করেছি। আরবী ভাষা জানাই ছিল। ভাষা শিক্ষার সূত্র আমার আয়ত্তে ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই আমি আমার পুরোনো কবিতাগুলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে তাঁকে শোনাতে লাগলাম। তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

আমি তো খোদ কবিতার দেশেই সুনাম অর্জন করেছিলাম। কাজেই আমার কবিতার গভীরতা তিনি সহজেই বুঝতেন। আলফানসো থামল। তারপর বলতে লাগল—তিনি কিন্তু আরবীয় ধনী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা সূত্রেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর প্রচুর কুফি বা আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা জমিয়েছিলাম। সব রাখতেন একটা সোনার গিল্টিকরা লম্বাটে সিন্দুকে। আমি সেটা দেখেছিলাম। তাঁর কড়া হুকুম ছিল কেউ যেন সেটা স্পর্শ না করে। কিন্তু সেই সিন্দুক ভর্তি স্বর্ণমুদ্রাই তাঁর কাল হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইবু গ্যাব্রিওল ছিল পিতার ঠিক উল্টো প্রকৃতির/দুর্বিনীত, হিংস্র প্রকৃতির, চূড়ান্ত স্বার্থপর। কিছু অসৎ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হয়ে উঠেছিল অত্যাচারী নিষ্ঠুর। মাঝে মাঝেই ও অসৎ সঙ্গীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে মজা করতে যেত। কোনও কারণে রেগে গেলে প্রজাদের বাড়িঘর, ক্ষেত-খামারে আগুন লাগিয়ে দিত। এই জায়গায় ইবু সলোমন ছিলেন ভীষণ দুর্বল। পুত্রস্নেহে অন্ধ। কারণ, ঐ একটি মাত্র সন্তানই তাঁর বেঁচেছিল। অসৎ বন্ধুদের পরামর্শে সে ক্রমে ক্রমে যোদ্ধাদের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নিজের কব্জায় নিয়ে এল। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। কারণ, যোদ্ধারা জানত ইবু সালোমনকে প্রজারা দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাদের বাগ মানানো খুব কঠিন] বন্ধুরা পরামর্শ দিল—পিতাকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে না পারলে শাসকের আসন পাওয়া যাবে না। ইবু সালোমন সবই জেনেছিলেন। এক রাতে মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত বলশালী প্রহরীকে নিয়ে যে কোথায় চলে গেলেন কেউ জানতেই পারল না। জানল কয়েকদিন পরে ফিরে না আসার জন্যে। তিনি ফিরেছিলেন একা। বিশ্বস্ত প্রহরীর কথা জিগ্যেস করাতে তিনি বলেছিলেন—তারা প্রচুর অর্থ নিয়ে স্পেনে চলে গেছে। তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধানের পরেই জানা গেল পালঙ্কের নীচে রাখা স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই সেই সিন্দুকটাও উধাও। কিন্তু সিন্দুকটা নিয়ে কেউ কিছু জিগ্যেস করতে সাহস করল না। এমনকি প্রধান পরামর্শদাতাও না। আলফানসো থামল। ফ্রান্সিস বেশ আয়েসি ভঙ্গি তে বসে শুনছিল। এবার দ্রুত উঠে বসল। হ্যারি তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বলে উঠল—ঠিক আছে। এখন থাক। আপনি বিশ্রাম করুন। পরে শুনব সব। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যারি একমাত্র তুমিই আমার চিন্তাভাবনা, মনোভাব সঠিক বুঝতে পার। মারিয়াও বুঝতে ভুল করে। যাক গে—আলফানসো, আপনি আরামে ঘুমিয়ে পড়ুন। পরে আমার কিছু জানার আছে।

আলফানসো এতক্ষণ একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর কোনও কথা না বলে পাশ ফিরে ঘুমের উদ্যোগে করল।

পরের সারাদিন এ বিষয়ে আর কথা হল না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সবাই বসল।

—এবার আপনার কথা সংক্ষেপে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—ইবু সালোমন কবি ছিলেন সত্যি। সেই সঙ্গে অত্যন্ত বুদ্ধিমানও ছিলেন। কে কেমন মানুষ, কী তার উদ্দেশ্য, বিশ্বাসযোগ্য কিনা সহজেই বুঝি নিতেন। একমাত্র পুত্র যে অত স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সহ্য করবে না সেটা তিনি খুবই সহজেই বুঝে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঐ যে বললাম অন্ধ পুত্রস্নেহ। তিনি কাউকে কিছু বললেন না। ছেলেকে তো নয়ই। নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সেই সময়ে যে জিগেলগুলো রচনা করেছিলেন তা মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষারত নির্ভীক এক মানুষের মর্মকথা। অপূর্ব জিগেল সে সব। কথাগুলো বলার সময় আলফানসোর গলা কান্নার বুজে এল। বলতে লাগলেন—সেই রাতটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেই শয়নকক্ষে অনেক রাত অব্দি পরস্পরকে জিগেল শোনাচ্ছিলাম। রাত গভীর হল। দুজনেই বিশ্রাম নিলাম। ওঁর একটাই পছন্দের জিনিস ছিল—ক্লান্তিবোধ হলে একটা সুদৃশ্য কাচের বড় লম্বাটে নলওয়ালা পাত্রে আঙুরের রস রাখতেন। সেখান থেকে নিজেই পাশে রাখা একটা গ্লাসে ঢেলে খেতেন। আমাকেও দিতেন। সেই ঘরে অন্য কারো প্রবেশের অধিকার ছিল না। একে যদি বিলাসিতা বল তো বলতে পার। কিন্তু আলবোলার নল মুখে তামাক খেতে তাঁকে কোনোদিন দেখিনি। যাক গে—হঠাৎ তিনি গ্লাসে অর্ধেকটা নিয়ে তাড়াতাড়ি রেখে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন—কোন রকম শব্দ শুনলেন? শব্দটা আমিও শুনেছিলাম। গভীর রাতের স্তব্ধতায় এরকম শব্দ শোনা যায়। উনি বলে উঠলেন—একটা জিগেল বলছি। লিখে ফেলুন তো। সুন্দর চামড়া মেশানো কাগজ ওখানে বরাবরই থাকত। বাজপাখির পাখা থেকে তৈরি কলমও। আমিও গ্লাস রেখে লিখতে লাগলাম। এক পংক্তি লিখেই বুঝলাম এটা তাঁর পূর্বেই ভেবে নেওয়া কবিতা। আমি দ্রুত লিখতে লাগলাম। তাড়াতাড়িই শেষ হল কবিতাটা। উনি ম্লান হেসে বললেন, এটাই আমার শেষ কবিতা। জিগেল না কিন্তু। আমার সব লেখা কবিতা আপনি রেখে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আমি বললাম। আপনি রাজি হলেই সব বাঁধিয়ে রাখব।

—তাই রাখুন। অনেক সুখ দুঃখ বেদনার স্মৃতি তো জড়িয়ে আছে ঐ কবিতাগুলোর সঙ্গে। তবে এই শেষ কবিতাটা শুধু আলাদা করে আপনার কাছে রেখে দিন। একমাত্র আপনার মতো একজন যথার্থ উচ্চমানের কবিই এই কবিতাটার অর্থ বুঝবেন। অন্যের কাছে এটা দুর্বোধ্য মনে হবে। অবশ্য সেই অর্থের বাইরেও একটা অন্য অর্থও আছে। এখন নয়—পরে—অর্থাৎ আমার অবর্তমানে—মানে—

আমি বাধা দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাব তখনই বাইরের দিককার দরজায় মৃদু টক্‌টক্‌ শব্দ শোনা গেল। ইবু সালোমান আস্তে বললেন—দয়া করে দরজাটা খুলে দিন। গভীর রাতের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শব্দটা বেশ জোরেই শোনা গেল। আমি তো হতবাক। একে তাঁর এই কক্ষে কারো প্রবেশের হুকুম নেই। তার ওপর এত রাতে কে এল? তাঁর অন্দরমহল থেকে কি কেউ এল? কিন্তু বাইরের দরজা দিয়ে তাঁরা আসবেন কেন? এলে ভেতরের দরজা দিয়েই তো আসবেন। আবার টোকা দেওয়ার শব্দ। এবার একটু জোরে।

—যান। খুলে দিন দরজা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যেন আপন মনে —নিঃশব্দ মৃত্যু। এর অপেক্ষাতই ছিলাম। আমি চমকে উঠলাম। একথার অর্থ কী? আবার টোকা দেওয়ার শব্দ। উনি নিঃশব্দে আঙুল তুলে দরজাটা দেখালেন। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিলাম। ঘরের মৃদু আলোয় দেখলাম তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইবু গ্যাব্রিওল দাঁড়িয়ে। তার পেছনে তার দুজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। কঠিন মুখ তাদের। গ্যাব্রিওল একটু হেসে বলল—বাড়ি যান। অনেক রাত হয়েছে। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। এক ঝলক পেছনে তাকিয়ে দেখি ইবু সালোমন দু'চোখ বন্ধ করে নিথর বসে আছেন। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে। বোধ হয় কিছু প্রার্থনা করছেন।

—যান। ইবু গ্যাব্রিওল প্রায় চাপা ধমকের সুরে বলল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম নিঃশব্দ মৃত্যুর অর্থ কি? আমি দ্রুত বাইরে চলে এলাম। বুকে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে কী করে সরাইখানায় ফিরে এলাম বলতে পারব না। একটু থেমে ভগ্নস্বরে বৃদ্ধ আলফানসো বলল—ওটাই তাঁর শেষ কবিতা। কথাটা বলে আলফানসো দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উত্তেজনায় তখন ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল। বসে পড়ল আবার। আলফানসো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল একটু পরে শান্ত হল। ফ্রান্সিসরা তিনজনেই ততক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। হ্যারি আস্তে আস্তে চলে গেল। ফ্রান্সিস নিঃশব্দে কম্বলটা টেনে নিয়ে মেঝেয় পেতে শুয়ে পড়ল। মারিয়া হাত বাড়িয়ে আলফানসোকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল।

পরেরদিনও খাবার খেতে খেতে আলফানসোকে ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল,

—এখন আপনার শরীর কেমন?

আলফানসো খুশির হাসি হেসে বলল—বুকে জমে থাকা এত কথা তোমাদের বলতে পেরে আমি যেন হালকা বোধ করছি। তোমাদের ধন্যবাদ।

ফ্রান্সিস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আমরা এরকমই। তবে ইবু সালোমনের

শেষ কবিতার প্রসঙ্গটা অন্তত আমার মনে একটা প্রশ্ন তুলেছে। সেই কবিতাটা এখন কোথায়?

—সে তো আর এক ইতিহাস। আলফানসো বলল।

—সে সব আমার জানা। শুনুন অতি সংক্ষেপে বলছি—ইবু গ্যাব্রিওল দেশটায় অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সর্বপ্রথমে সে আপনাকেই বন্দী করেছিল। ইবু গ্যাব্রিওল অত্যন্ত ধুরন্ধরের মতো পরিকল্পনা করে এগিয়েছিল। অবশ্য তার অসৎ বন্ধুরাও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। ফ্রান্সিস বলল—তাই কিনা?

—ঠিক তাহলেই বুঝতেই পারছ যে অমানুষটা নিজের দেবতুল্য পিতাকে হত্যা করতে পারে, সে আমার ওপর কী রকম অত্যাচার করতে পারে! ওই অমানুষটাকে আমি কতবার বলেছি—ইবু সালোমান তাঁর স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার সম্বন্ধে একটি কথাও আমাকে বলেননি। সেটা ও বিশ্বাসই করতে চাইল না। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ইবু সালোমনের শেষ কবিতাটা লুকিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু অতটুকু কয়েদঘরে কোথায় লুকোব। সব পোশাক কেটেকুটে খোলার সময় কাগজটা মেঝেয় পড়ে গেল। ঘামে জলে লেখাগুলো প্রায় মুছে গেছে তখন। ওটা এক লাফে তুলে নিয়ে ও পড়ল। মুখ বেঁকিয়ে বলল—ও! উদ্ভট পাগলের প্রলাপ। এ পড়ে কী হবে?

—কবিতা ওরকমই হয়। আমি মৃদুস্বরে বলেছিলাম।

—জাহান্নামে যাক সব। কথাটা বলে ও কবিতা লেখা কাগজটা একটা টানে দু ফালি করে ফেলল। হাত বাড়িয়ে বললাম ঐ পাগলের প্রলাপটা একেবারে ছিঁড়ে ফেল না। আমাকে দাও। ও কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। কী যে দুঃখ হল আমার, কী বলবো!

—কবিতাটা মনে আছে আপনার? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিগ্যেস করল।

—আমিই তো লিখেছিলাম। কতবার পড়েছি। আলফানসো বলল।

—মারিয়া। কাগজ-কলম বের করো। লিখে ফেলো তো। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ওর চামড়ার সুদৃশ্য ব্যাগ থেকে কাগজ আর পাখার কলম বের করে তৈরি হল। আলফানসো আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—

চির উদাসীন লোভাত বয়ে চলেছে।
কোথাও প্রচণ্ড ঘূর্ণির আবর্ত।
হিংসা দ্বেষ স্বর্ণতৃষা
হানাহানি রক্তপাত অমোঘ মৃত্যু।

জেনো অতল তলে
গভীর অবঞ্চল প্রশান্তির সম্পদ।
যারা আজীবন কাঁদে
একটু শান্তির জন্যে
তাদের সেই প্রশান্তির সম্পদ।
বিলিয়ে দাও।
সার্থক হোক তোমার মনুষ্যজীবন।

লেখা শেষ হলে ফ্রান্সিস কাগজটা হ্যারিকে দিল। হ্যারি কয়েকবার পড়ে বলল—সত্যি অপূর্ব! একজন প্রকৃত মানবপ্রেমীর অন্তরের ডাক।

—সত্যি তাই। এই শেষ কবিতাটার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কবিতাটায় একটা রহস্যময় নির্দেশ আছে। আলফানসো বলল।

একটু ভেবে নিয়ে হ্যারি বলল—হতে পারে। অসম্ভব নয়।

ফ্রান্সিস আলফানসোর দিকে তাকাল। বলল—লোভাত কী?

—একটা নদী, উত্তরের দিকে।

—কত দূরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সিনহো থেকে একদিনের পথ। আলফানসো বলল।

—খুব বড় নদী? ফ্রান্সিস বলল।

—শীতকালে নয়। কিন্তু বর্ষাকালে আর সমুদ্রে জোয়ারের সময় দু'পাশের বসতি ভাসিয়ে দিয়ে বন্যা হয়।

—দু'পাশের বসতি কি খুব ঘন?

—না না। ছাড়া ছাড়া কয়েকটা গ্রাম মতো। আলফানসো বলল।

—আমাদের জাহাজ ঢুকবে? হ্যারি জিগ্যেস করল।

—উঁহু। অত গভীর নয়। আলফানসো মাথা এপাশ-ওপাশ করল।

—ইবু সালোমান কি মাঝে মাঝেই ঐ নদীর দিকে যেতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—জানি না। তবে আমি বার দুয়েক দেখেছিলাম তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত দেহরক্ষী এতামকে সঙ্গে নিতে।

—হুঁ। তিনি ঐ নদী দেখতে যেতেন। তাই না? হ্যারি বলল।

—মনে হয় উনি নগরের হইহট্টোগোল থেকে কিছুদিনের জন্যে প্রকৃতির কোলে যেতে ভালোবাসতেন। একটা ছোট্ট কবিতায় লিখেছিলেন—

নগরবাসী বন্ধু—
সে ও হে প্রকৃতির মায়ের কোলে—
অনেক সান্ত্বনা পাবে।

—সন্দেহ নেই তিনি সত্যিকারের কবি ছিলেন। আলফানসো, আমাদের জাহাজেও আছে একজন ভালো গায়ক বন্ধু। তাকে পেলে আপনি খুশি হবেন। হ্যারি বলল।

আর কোনও কথা হল না। আলফানসো শুয়ে পড়ল। মারিয়া মেঝেয় কম্বল পাততে পাততে বলল—আমি এখানে শোব আজ।

—কী যে বলো। ঐ কাঠের মেঝেয় তোমার কষ্ট হবে। ফ্রান্সিস আপত্তি করল।

—পারব। মারিয়া শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসও শুয়ে পড়ল। আলফানসো ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে জাহাজচালক ফ্লেজারের কাছে এল। বলল—ফ্লেজার আমাদের জাহাজ উত্তর পোর্তুগালের বন্দর নগর সিনহোর কাছে এসেছে। আমরা ঐ বন্দর-নগরে যাব না। এবার অন্যভাবে ছক কষেছি। ঐ অঞ্চলের শাসক ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। নিজের পিতাকে সকলের অগোচরে ধুরন্ধর খুনির মতো ছক কষে হত্যা করেছে। ওকে বিশ্বাস নেই। তুমি উত্তরের দিকে দিক ঠিক রেখে চালাও। যেতে যেতে ডানদিকে একটা নদী—লোভাতের মুখ পাবে। ঐ নদীতে আমাদের যেতে হবে। জাহাজ ঢুকবে না। নৌকো নিতে হবে। যতটা দ্রুত পার চলো। আমরা আর বিনা কারণে এক মুহূর্তও দেরি করব না।

—ঠিক আছে। হুইল ঘুরিয়ে ফ্লেজার বলল।

দুজনে সরে এসে রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। শাঙ্কোও এসে দাঁড়াল।

—কী ঠিক করলে, ফ্রান্সিস? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমরা সিনহো নগরে যাব না। ইবু গ্যাব্রিওলের থাবা এড়িয়ে লোভাত নদী এলাকায় যাব। শুধু তুমি, শাঙ্কো আর আমি নৌকা নিয়ে সমুদ্রের মুখ থেকে নদীতে ঢুকব। আগে নদীটা ঘুরে ভালো করে দেখব।

—তবে কি ঐ নদীতেই ইবু সালোমনের আরবী স্বর্ণভাণ্ডার গোপনে রাখা আছে? হ্যারি জিগ্যেস করল।

—অবশ্যই কোনও সন্দেহ নেই।

—কিন্তু কোথায়? লোভাত নদী কত লম্বা তা তো জানি না। হ্যারি সংশয় প্রকাশ করল।

—উজিয়ে গিয়ে দেখতে হবে। খোঁজাখুঁজি করতে হবে। হয়তো কাছাকাছি কোথাও সূত্র পেয়ে যাব। উৎস পর্যন্ত যেতে হবে। ইবু সালোমন খুব বেশি দূর যাননি বলেই আমার বিশ্বাস। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু সঠিক জায়গাটা খুঁজে পেতে তো অনেকদিন লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা তো সব খোঁজখবর না নিয়ে এখনই বলতে পারব না। একটা সমস্যা তো আছেই—মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ জমছে। কখনও কখনও বৃষ্টিও হচ্ছে। পুরো বর্ষা আসতে খুব একটা দেরি নেই। তার আগেই সবরকম খোঁজাখুঁজি চালাতে হবে। গোপনে রাখা কুফির মানে আরবী স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।

জাহাজের গতি বাড়ানো হয়েছে। মনে হয় দু একদিনের মধ্যেই লোভাত নদীর মুখে পৌঁছতে পারব। তারপর কাজে নামতে হবে। তাও ভাটার সময়। নদীর জল তখন সমুদ্রমুখী বইবে। নদীটা কত বড়, স্রোত কেমন,উজানে নৌকো চালাতে হলে অনেককিছু জানার আছে, বোঝার আছে।

শাঙ্কো বা হ্যারি কেউ কোনওকথা বলল না। ওরা জানে ফ্রান্সিস অনেক ভেবেচিন্তে ছক কষে।

এও তো হতে পারে—শাঙ্কো বলতে গেল।

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—জানি তুমি কী বলবে। হ্যাঁ, তাও হতে পারে। হয়তো গোপন স্বর্ণ ভাণ্ডার সেখানে নেই। কিন্তু আছে কিনা তুমি বা আমি কেউ এক্ষুনি বলতে পারব না। দেখাই যাক না।

আর কোনও কথা হল না। ফ্রান্সিস পুবদিকের একটু মেঘলা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো, নজরদার পেড্রোকে গিয়ে বলো আজ রাতে ওর বিশ্রাম নেই। সারারাত পুবদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। শাঙ্কো বাধ্যর মতো সঙ্গে সঙ্গে পেড্রোর খোঁজে চলল।

—হ্যারি, আমরাও আজ রাতে ঘুমোতে পারব না। তৈরি থাকতে হবে। লোভাত নদীর মুখ নজরে পড়বেই। কারণ, এখন সারারাত চাঁদের উজ্জ্বল আলো থাকবে। নদীমুখ চিনতে আমরা অভ্যস্ত। চলো, এখন বিশ্রাম করে নিই।

রাতের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস সেই যে ডেক-এ এসে ঐ রেলিঙ ধরে দাঁড়াল, আর নামল না। হ্যারি মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসই বলল—হ্যারি, তোমার শরীর কিন্তু আমাদের মতো শক্তপোক্ত নয়। তুমি শুয়ে পড়ো গে।

রাত গভীর হতে লাগল। একটানা সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দের বিরাম নেই। মাস্তুলের ওপরে নজরদার পেড্রো তো নজরদারির ব্যাপারে চির অভ্যস্ত। চারদিকে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। আকাশে কালচে মেঘের আনাগোনা চলছে। কখনও চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। মেঘ সরে যেতেই আবার চারদিকে জ্যোৎস্নার বন্যা। ঢেউ ভেঙ্গে জাহাজ দ্রুত চলেছে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মাস্তুলের ওপর নজরদার পেড্রোর হাঁক শোনা গেল—ডানদিকে—নদীর মুখ। তখন হ্যারিও ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে চাঁদ তখন উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে। মাথার ওপরে আকাশ সাদাটে হয়ে এসেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই। অস্পষ্ট হলেও দুজনে লোভাত নদীর মুখ দেখল। জাহাজ আরো কাছে এল। সূর্য উঠল। ভোরের নরম রোদে দেখা গেল নদীর জল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বেশ ঘোলাটে জল। নদীটা মোটামুটি দেখে নিয়ে বুঝল জাহাজ ঢোকার মতো বড় নদী নয়। অভিজ্ঞ চোখে বুঝল খুব গভীর নয় লোভাত নদীর জল। এখন ভাটার টান চলেছে।

—খাঁড়ি নয়। জলের গভীরতাও তেমন নয়। কী বলো? হ্যারি বলল।

—হুঁ। এখানেই তীরে কোথাও জাহাজ নোঙর বাঁধতে হবে। নদী ধরে এগোতে গেলে নৌকা ছাড়া গতি নেই। তাও ভাটা চলছে। নৌকো স্রোতের বিপরীতে চালাতে হবে। ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে বলল।

ততক্ষণে শাঙ্কোরা কয়েকজনও এসে দাঁড়িয়েছে। শাঙ্কো বলল—কিন্তু কতদূর যেতে হবে তাও তো বুঝতে পারছি না।

—বাঃ শাঙ্কো! এটা একটা কথা হল? আমরা তো নদীতে এখনও ঢুকতেই পারিনি। তার আগেই বুঝে যাব কোথায় কতদূর যেতে হবে! ফ্রান্সিস বলল।

—না না, তা কেন? একটু থতমত খেয়ে শাঙ্কো বলল।

—তাহলে ঐ ভাবনা ছাড়ো। যাও—তিনটে নৌকার ব্যবস্থা করো। দাঁড় বেশি সংখ্যায় নাও। কয়েকজন সকালের খাবার খেয়েই লোভাত নদীতে ঢুকব। ফ্রান্সিস বলল!

শাঙ্কোরা কয়েকজন তিনটে নৌকোয় নেমে এল। নৌকোর সব কিছু খুঁটিয়ে দেখল। পরীক্ষা করল কোথাও ফুটো রয়েছে কিনা—কাঠ ফেটেছে কিনা। একটায় দেখা গেল মাঝামাঝি একটু জল জমেছে। জলটা ছেচে ফেলে কাঠের টুকরো জুড়ে জায়গাটা শক্ত করা হল।

ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে রাঁধুনি বন্ধু খাবার দিয়ে গেল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—আলফানসো, ইবু সালোমনের শেষ কবিতাটা তো আপনার মুখস্থ। আচ্ছা, কবিতাটার ঠিক অর্থটা কি?

—তেমন কঠিন অর্থ কিছু না। সমুদ্রে বা নদীর জলে যে প্রবল ঘূর্ণি এখানে-সেখানে দেখা যায়, মানুষের জীবনেও তেমনি সেই ঘূর্ণি আছে। হিংসা হানাহানি রক্তের ঘূর্ণি।

স্বাথপর নির্মম হৃদয়ের মানুষদের জীবন ঐ ঘূর্ণির মতো। কিন্তু সেই সব ঘূর্ণির

নিচে যে জলভাগ সেখানকার জল কিন্তু শান্ত অচঞ্চল। স্থিতধী মহান মানুষেরাও তেমনি। সুন্দর অর্থ তাঁরা ঘূর্ণিপাকের নীচে অচঞ্চল থাকেন।

—দেখুন, আমি কাঠখোট্টা মানুষ। কবিতা-টবিতা তেমন বুঝি না। কথাটা বলে ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি, তুমি কিছু বলো।

হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল—আমারও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু তবু আমার মনে খটকা যাচ্ছে না মনে হয় কবিতাটা আলফানসোকে লক্ষ্য করেই যেন লেখা। নইলে বিলিয়ে দাও কথাটা আসত না। আবার দেখো প্রশান্তি সম্পদ। প্রশান্তি নিশ্চয়ই মানুষের মনের সম্পদ। এটাই সঠিক বুঝতে পারছি না।

একপাশে বসে মারিয়া ওদের কথা শুনছিল। বলল—মনের সম্পদ কি বিলিয়ে দেওয়া যায়? সোনা হীরে মুক্তা এসব বিলোনো যায়। তারপর খাদ্যটাদ্যও। কিন্তু মনের সম্পদ? সেটা কি বিলোতে পারে?

আলফানসো, আপনি কী বলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আলফানসো কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। দুজনের ব্যাখ্যা ভাবল। তারপর চোখ পিটপিট করে তাকাল। বলল—ফ্রান্সিস, তোমার বন্ধু সত্যিই জ্ঞানী। শব্দের গভীর অর্থ বোঝে। রাজকুমারীও কম যান না। উনি কবিতা লেখেন কিনা জানি না। তবে কবিতার অর্থ উদ্ধারে নিঃসন্দেহে দক্ষ। একটু থেমে বলল—এভাবেও অর্থটা করা যায়। সত্যি কথাটা হল—কবিতার দু'এক পংক্তি মনে হতেই আমি আর শেষটুকু মনে করার কথা ভাবতামই না। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেত। তাই খুব গভীরে বোঝবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। তোমরা দুজন যেভাবে পংক্তিগুলির অর্থ উদ্ধার করেছ, একজন সামান্য কবি হিসেবে আমি তোমাদের ভূয়সী প্রশংসা করছি। হ্যাঁ, এইবার আমি সত্যিই বুঝতে পারছি উনি শেষ কবিতাটার মধ্যে দিয়ে আমাকেই কিছু একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। সাগ্রহে বলে উঠল—হ্যারি, তোমরা তৈরি হও। আমার চিন্তায় যেটুকু ধোঁয়াশা ছিল তা কেটে গেছে। দেরি করা চলবে না। সকালের খাবার খেয়ে ইবু গ্যাব্রিওল কিছু আঁচ করার আগেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব।

ফ্রান্সিস অবশ্য দুটো নৌকা নিল। নৌকো দুটো তৈরিই ছিল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে একটা নৌকোয় হ্যারি বিনোলা আর সিনাত্রাকে নিয়ে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। অন্যটায় ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বসল। দুটো নৌকোই ছেড়ে দেওয়া হল। খুব উঁচু ঢেউ উঠছে না। নদীমুখে আসতেই দেখা গেল মুখটায় নদীর ঘোলা জল এসে মিশে যাচ্ছে। স্রোত খুব তীব্র নয়। সামনে রইল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর

নৌকো। দুজনেই দাঁড় বাইতে লাগল। গতি বাড়াতে হবে। পেছনেরটায় হ্যারি বিনোলা আর সিনাত্রা। নদীর ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে বেশ দ্রুতই চলল নৌকো দুটো। ফ্রান্সিস দু'ধারে তাকিয়ে দেখল—বাঁদিকে টানা উঁচু-নিচু পাহাড়। ডানদিকে কিন্তু বনভূমি। বড় বড় গাছগাছালি ঝোপঝাড়। নৌকো দুটো চলল। কিন্তু দু'পাড়ে কোনও জনবসতি নেই। তবে বাঁদিকে পাহাড়ি এলাকা কমে গিয়ে গাছগাছালি দেখা গেল।

মাথার ওপর সূর্যের তেজ তেমন নেই। মাঝে মাঝে হালকা মেঘে সূর্য ঢাকাও পড়ছিল। তাই দুপুর হয়ে এলেও দাঁড় টানতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। একটা ছোটো বাঁক আসতেই দেখা গেল জনবসতি শুরু হয়েছে ডানদিকে। কাঠ-পাথরের বাড়ি। গাছের ডাল ফালা করে জানালা-দরজা তৈরি করা হয়েছে। নদীর পাড়ে বেশ কিছু দেশীয় মাছধরা নৌকো। তীরে খুঁটিতে জাল শুকোচ্ছে। বোঝা গেল জেলেপাড়া। এদের মাছ ধরাই প্রধান পেশা। তবে খাটো ছোট ফসলি জমিও দেখা যায়। শাঙ্কোই প্রথম একটু অধীর হয়ে হ্যারির দিকে তাকাল। বলল হ্যারি, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কখন থামব কিছুই তো বুঝতে পারছি না

—অধৈর্য হয়ো না। বলবার সময় এলে ফ্রান্সিস নিজেই সব বলবে। হ্যারি শান্তস্বরে বলল।

—আমরা কি কোনও গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছি? বিনোলা বলল।

—অবশ্যই। নইলে কি হাওয়া খেতে এসেছি? সমুদ্রে কি হাওয়া কিছু কম? হ্যারি বলল।

তখনই ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—এভাবে হবে না। হ্যারি, নৌকো ভেড়াতে বলো।

দুটো নৌকো তীরে ভেড়ানো হল। দেখা গেল তীরে বেশ কয়েকটা দেশীয় জেলে নৌকো বাঁধা। তীরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে কয়েকটা পাথরখণ্ড। তার উপর বসে কয়েকজন জেলে জাল বুনছে। পরনে গ্রামের জেলেদের সাধারণ পোশাক। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন পোশাক। সবচেয়ে সামনে একটা পাথরের কাছে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল। কোমরে হাত দিয়ে জেলেরা কেউ কেউ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ফ্রান্সিসদের নৌকোও দেখছিল। অন্যরকম নৌকো। বোঝাই যাচ্ছে এরা বিদেশি।

নৌকো থেকে ফ্রান্সিস সেই বৃদ্ধের কাছে এল। সঙ্গে হ্যারিও এল। ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল—এই গ্রামটার নাম কি?

—ইরেকাস। বৃদ্ধ ফোকলা মুখে হেসে বলল—আপনারা কারা?

—আমরা বিদেশি। আমাদের জাহাজ এই লোভাত নদীর মুখেই নোঙর করা আছে। এই নদীতে জাহাজ তো ঢোকে না। তাই নৌকোতে চড়ে এসেছি। সমুদ্রে ঘূর্ণিটুর্নি দেখেছি। শুনলাম এই লোভাত নদীতেও নাকি একটা বেশ বড় ঘূর্ণি আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—সেটা কোথায়?

আঙুল বেশ দূরের একটা ছোট পাহাড় দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল—ঐ খানে। বেশ দূরে। ওখানে নদীটা বাঁক খেয়েছে। ওখানেই আছে ঘূর্ণিটা বর্ষাকালে তো সে ভয়ংকর চেহারা নেয়। এখনও কম নয়। কত নৌকো যে ঐ ঘূর্ণির কাছাকাছি যেতেই ডুবে গেছে তার হিসেব নেই। আমরা ভুলেও ওদিকে মাছ ধরতে যাই না।

—তাহলে তো এখন ওটার কাছে যাওয়াই যাবে না। হ্যারি বলল।

—বলেন কী! ঘূর্ণির প্রচণ্ড টানে নৌকাসুদ্ধ তলিয়ে যাবেন। একজন জেলে বলে উঠল।

—তাহলে কী করবে? হ্যারি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল।

—নৌকো দুটো এখানেই থাক। আমরা নদীতীর দিয়ে হেঁটে ঐ ঘূর্ণির কাছে যাব। চলো এসো সবাই।

সবাই নৌকো থেকে নেমে এল।

শাঙ্কোরা যখন নৌকো দুটোকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধছে তখন সিনাত্রা বলল—ফ্রান্সিস, সেই সকালে খেয়েছি। তারপর এই দুপুরে হতে চলল—। ফ্রান্সিস হেসে ডান হাতের চেটো দেখিয়ে বলল—গির্জার পাদরিদেরও খেতে হয়। ব্যবস্থা হচ্ছে। ফ্রান্সিস জেলেদের কাছে গেল। একজন বয়স্ক জেলেকে বলল—আপনি তো আমার পিতৃতুল্য। আপনি গররাজি হলেও আমি মোটেই দুঃখিত হব না। বয়স্ক জেলে হাঁ করে ফ্রান্সিসদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হেসে ফ্রান্সিস বলল—লোভাত নদীর সেই মুখ থেকে নৌকো চালিয়ে আসছি। কিচ্ছু পেটে পড়েনি। যদি আমাদের জন্যে সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমরা নতুন উদ্যমে কাজে নামতে পারি।

—সেকি কথা? আপনারা তো আমাদের অতিথি! দেখছি কী করা যায়।

বৃদ্ধ জাল বুনছিল। জাল বোনা বন্ধ রেখে চলে গেল ঘরগুলোর দিকে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল—আপনাদের খেতে দেবার মতো খাবার হয়ে গেছে।

একটা মোটামুটি বড় বাড়ির উঠোনে একধরনের লম্বাটে শুকনো পাতায় ওদের খাবার দেওয়া হল। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ে খেতে লাগল। মাছের ঝোল মতো আর রুটি দুটো করে। খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—

এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম চলবে না। আমার সঙ্গে চলো।

নদীতীরের বালিমাটি অনেক দূর টানা চলে গেছে। সেই ভেজা ভেজা বালিমাটির এলাকা ধরে ফ্রান্সিস হাঁটতে শুরু করল দূরে নদীর বাঁকের দিকে। আগে-পাছে হেঁটে চলল সবাই। কিছুদূর যেতেই বালিমাটি এলাকা শেষ। পাথুরে মাটি শুরু হল। মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো পাথুরে চাই। সেখানে উঠে চলা শুরু হল। চলার গতি অনেক কমে গেল। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মাটি ছোটো ছোটো চাঁইয়ে উঠে পাশ কাটিয়ে গাছগাছালির গুঁড়ি এড়িয়ে বাঁকের কাছ আসাতে দেখা গেল নদীটা এখানে অনেকটা বাঁক নিয়েছে। দুপাশের পাথুরে মাটির ঢাল নেমে এসেছে। দুপাশের দূরত্ব এখানে অনেক কম। দুপাশের ঢালে ধাক্কা খেয়ে তীব্র স্রোতের জলে একটা বড় আকারের ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, তুমি কি এই ঘূর্ণির কথাই ভাবছিলে?

—হ্যাঁ। লক্ষ করেছো নদীর দুই তীরের দূরত্ব এখানে অনেক কম। এপারে উঁচু উঁচু গাছ আর ঝোপঝাড় টানা চলে গেছে। ওপারে অবশ্য মাত্র একটা চেস্টনাট গাছ দেখছি।

—তাহলে কি ইবু সালোমন এখানেই এসেছিলেন। হ্যারি বলল।

—অবশ্যই। ভুলে যেও না তিনি সঙ্গে ছসাতজন বলশালী দুঃসাহী দেহরক্ষী এনেছিলেন।

—কিন্তু তারা তো কেউ ফিরে আসেনি?

—এখানেই প্রশ্ন। উত্তর সহজ—সেই দুঃসাহসী দেহরক্ষীদের সাহায্যে তিনি এখানেই কোথাও আরবী স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে অন্য সব রাজা-শাসকরা যা করে তিনিও তাই করেছেন। তাদের ছলেবলে কৌশলে হত্যা করেছেন। হ্যারি বলল।

—এতো তোমার অনুমান। হ্যারি বলল।

—দেখি আমার অনুমান সত্যি কিনা। এবার চলো, ঘূর্ণিটার যত কাছে সম্ভব যাব। ফ্রান্সিস বলল।

বড় বড় গাছ-ঝোপঝাড় তীরের কাছ পর্যন্ত নেমে গেছে। তারপর নদীর জল বয়ে চলেছে। ঘূর্ণি বরাবর শেষ দুটো গাছের একটা কাণ্ড ধরে ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘূর্ণিটার দিকে তাকিয়ে রইল। পাশে দাঁড়ানো শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস,

এই ঘূর্ণির যা পাক দেখছি নৌকো তো নৌকো, জাহাজ ও ডুবে যেতে পারে।

—হ্যাঁ, সমুদ্রেও কোথাও কোথাও ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় এরকম প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। জাহাজও পাক খেতে খেতে ডুবে যায়। এই ঘূর্ণিটা তেমন বড় কিছু না। তবে জেলে নৌকো ডুবে যাবে। তাই জেলেরা এদিকে নৌকোয় চড়ে মাছ ধরতে আসে না।

—আলফানসো বলেছিল ইবু সালোমনের পালঙ্কের নীচে নাকি একটা লম্বাটে সিন্দুকে স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার সযত্নে রাখা ছিল। তাহলে ইবু সালোমান তাঁর দেহরক্ষীদের দিয়ে এই ঘূর্ণির মধ্যেই ফেলে দিয়েছিলেন সেই স্বর্ণভাণ্ডার? হ্যারি ভাবতে ভাবতে বলল।

—মনে হয় সেটাই হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তাহলে তো এই সিন্দুক উদ্ধারই করা যাবে না। হ্যারি হতাশ ভঙ্গিতে বলল।

—এইটাই সবচেয়ে জটিল ধাঁধা। তিনি কি সব জেনেও ঐ সিন্দুকটা এখানে ফেলে দিয়ে গেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো ওটা চিরকালের জন্যে মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। হ্যারি বলল।

—না। সিন্দুকটা এখানেই ফেলা হয়েছিল। কীভাবে ফেলা হয়েছিল এটা জানতে পারলেই বোঝা যাবে তিনি কি সিন্দুকটা চিরদিনের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন? তারপর—একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল-হ্যারি, সেই ছেলেবেলায়—তুমি তো জানো কতদিন সমুদ্রের সামনে বসে থেকেছি আমি। কত জাহাজ কত দূর দূর দেশ থেকে আসত। নাবিকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুনতেই বড় হয়েছি আমি। এক বৃদ্ধ নাবিক আমায় বলেছিল—এক সামুদ্রিক ঘূর্ণির কথা। প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খেতে খেতে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে তলিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য! গভীরে জল ছিল অনেক শান্ত। ঘূর্ণির পাক কতদূর পৌঁছোয়নি।এত দ্রুত তলিয়ে গিয়েছিল যে তখনও তর দম ফুরোয়নি। সে শান্ত জলে দুপায়ের তলায় পাথর বালিতে ধাক্কা দিয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় শান্ত এলাকা দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল। বেঁচে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কাজেই এই ঘূর্ণির প্রবল মোচড় ওপরেই। একেবারে তলায় জল কিন্তু শান্ত। আসলে অগভীর এই লোভাত নদী। তা নইলে সহজেই দু-তীর বন্যায় ভেসে যেত না। মনে হয় ইবু সলোমন সেই সিন্দুক তুলে আনার জন্যে একটা ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

—কেন? হ্যারি বলে উঠল।

—হয় তো তিনি তখনও পুত্রের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাননি। কত দূরাচারী নির্মম নরঘাতকও তো পরে সাধুপুরুষ হয়েছেন। তাই তাঁর শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল হয়তো পুত্র ইবু গ্যাব্রিওলের মানসিক পরিবর্তন হবে। সে শুধরে যাবে। তখন এই স্বর্ণভাণ্ডার তুলে এনে পুত্রকে দিয়ে যাবেন।

হ্যারি চুপ করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—হ্যাঁ ফ্রান্সিস, তোমার অনুমান ঠিক। মানুষের এরকম পরিবর্তনের অনেক কাহিনি আছে।

—তাই-সেই শয়নকক্ষের বাইরে পুত্রের মৃদু পদশব্দ শুনেই বুঝেছিলেন—নিঃশব্দে মৃত্যু হবে তাঁর। পুত্র তাঁকে হত্যা করতে আসছে। তাই তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও সৎ আলফানসোকে গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডারের হদিস তাঁর শেষ কবিতায় জানিয়ে দিয়ে গেছেন। কীভাবে সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে হবে, তারপর কীভাবে হতভাগ্য সর্বহারাদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে হবে তার ইঙ্গিতও দিয়ে গেছেন।

কথাটা শুনে হ্যারি চোখ বুজে ভাবল। তারপর তাকিয়ে বলল-সাবাস ফ্রান্সিস! তুমি কবি না হয়েও শেষ কবিতাটার অর্থ সঠিক উদ্ধার করতে পেরেছ। তাহলে উদ্ধারের একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে।

—অবশ্যই আছে। এবার এই ঘূর্ণির দু'পাশের গাছের সারি, ঝোপজঙ্গল সব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। দেখা যাক কোনও সূত্র পাওয়া যায় কিনা। কারণ, নৌকোয় চড়ে গিয়ে সিন্দুক ঐ ঘূর্ণিতে ফেলে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ঐ ঘূর্ণির মধ্যে সিন্দুক ফেলতে গেলে তো যেতেই হবে। কীভাবে দুঃসাহসী দেহরক্ষীরা ওখানে গিয়েছিল? উড়ে উড়ে তো যায়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কীভাবে গিয়েছিল? হ্যারি বলল।

—সেই সূত্রটাই পেতে হবে। আজ তো বিকেল হয়ে এসেছে। চলো, ঐ জেলেদের গ্রামে ফিরে যাই। আজকের রাতটা ঐ গ্রামে কাটিয়ে কাল তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে এখানে চলে আসব। মোটেই দেরি করা চলবে না। ইবু গ্যাব্রিওল কিন্তু ভীষণ ধুরন্ধর। তাছাড়া এসব লোকেরা অত্যন্ত সন্দেহবাতিক হয়। যে নিজের পিতাকে নিঃশব্দে হত্যা করতে পারে, সে সব পারে। তার শাসনের বিরুদ্ধে কেউ কোথাও তলে তলে লোক ক্ষ্যাপাচ্ছে কিনা তা জানতেও ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছে। গুপ্তচরদের পোশাকে তো আর তাদের আসল পরিচয় লেখা থাকে না। সে ভালো করেই জানে ইবু সালোমন মাঝে মাঝেই এই লোভাত নদী এলাকায় প্রকৃতির কোলে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। সুতরাং এমনটা হতেই পারে যে স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার লুকিয়ে রাখতে তিনি এই নদী এলাকাটাই বেছে

নিয়েছিলেন। কাজেই লোভাত নদীর তীর বরাবর সব জায়গা ওপরই নজর রাখতে ইতিমধ্যেই গুপ্তচর পাঠিয়েছে। ইরেকাস গ্রামে আমরা এসে ডেরা বেঁধেছি এ খবর খুব সহজেই পাবে ওরা। কারণ, আমরা বিদেশি। এখানকার মানুষ নই। আমাদের শনাক্ত করা সহজ।

—তুমি ঠিকই বলেছ, ফ্রান্সিস। হ্যারি মাথা ওঠানামা করে বলল।

ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো, বিনোলা, তাড়াতাড়ি ফিরে চলো। নদীর তীর কিন্তু চলার পক্ষে ভালো রাস্তা নয়। বেশ সময় লাগবে ফিরে যেতে। সন্ধের মধ্যেই ইরেকাস গ্রামে পৌঁছাতে হবে।

সবাই ফিরে চলল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ ভেঙে ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে ওরা যখন ঐ গ্রামে ফিরে এল তখন সন্ধে নেমেছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে সেই বৃদ্ধের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। দেখল বৃদ্ধটি চুপ করে উঠোনের একপাশে একটা গাছের কাটা গুঁড়িতে বসে আছে। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি। বৃদ্ধ কিছু বুঝতে না পেরে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—দেখুন, আমরা এখানে এসেছি ঐ ঘূর্ণিটা দেখতে। তবে সন্ধে হয়ে এল, ভালো করে দেখাই হল না। কালকে একটু সকাল সকাল গিয়ে ভালো করে দেখব। মুশকিল হল সেই সমুদ্রমুখে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। জাহাজে ফিরে আবার কাল সকালেই আসা অসম্ভব। কাজই আমাদের আজকের রাতটা এখানে থাকতে হবে। আমাদের এই ক'জনকে খেতে দিতে। আপনাদের তো খরচ হবে। তাই অনুরোধ করিছ—ধারে-কাছে গম, চিনি এসবের দোকান টোকান আছে?

—আছে একটু দূরে। সেখান থেকেই এসব কিনি আমরা। বৃদ্ধ বলল।

—তাহলে আমরা আপনাকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। আপনারা কিনে আনুন। এই দামটা আপনাকে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল।

—আপনি সত্যিই বিবেচক। এতজনকে খাওয়ানো—

বৃদ্ধকে থামিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—সেটা বুঝি বলেই এই মূল্য ধরে দিচ্ছি। আপত্তি করবেন না।

—ঠিক আছে। দিন । বৃদ্ধ বলল।

—শাঙ্কো, দুটো স্বর্ণমুদ্রা দাও।

—শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে দিল। বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে বলল—দুটো হলেই হবে।

—তিনটেই রাখুন। শাঙ্কো হেসে বলল।

বৃদ্ধ আর আপত্তি করল না। মুদ্রা তিনটি নিয়ে নিচু দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

ক্লান্ত ফ্রান্সিসরা উঠোনের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে বসল। শাঙ্কো ঘরের দরজার কাছে গেল। ডাকাডাকি শুরু করল। এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শাঙ্কো তেষ্টার কথা বলে একটা মাটির বড় পাত্রে খাবার জল নিয়ে এল। বলল—মেপে খাও সবাই। রাতে খাওয়ার পর জলে যেন কম না পড়ে। সবাই মুখের কাছে পাত্রটা ধরে অল্প অল্প জল খেল। বেশি খেতে ভরসা পেল না। এবার ওরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

একটু রাতে ঐ উঠোনেই দুপুরের মতোই খেতে দেওয়া হল। বৃদ্ধের ছেলে মাঝখানে একটা জ্বলন্ত মশাল একটা গর্তে ঢুকিয়ে রাখল। সেই লম্বাটে শুকনো পাতা। পাঁচটা করে রুটি দেওয়া হল প্রত্যেকের পাতে। ভাজা, ঝোল মতো মিলিয়ে প্রত্যেককে চারটে করে মাছ দেওয়া হল। সঙ্গে আনাজের ঝোল। সবাই ক্ষুর্ধাত। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাত ফাঁকা। ফ্রান্সিস মাছভাজা চিবুতে চিবুতে একটু জোরে বলল—আর চেও না। পেট ভরে খেতে গেলে হয়তো এদের খাবারে টান পড়ে যাবে।

খাওয়ার পর উঠোনেই সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে পড়ল। নদীর দিক থেকে বেশ ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগল। ক্লান্ত ভাইকিংরা প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তাকিয়ে রইল নদীর ওপারের গাছগাছালি আর উঁচু পাহাড়টার দিকে। জ্যোৎস্না-ধোওয়া রাত। চাঁদ পাহাড়ের মাথায়। নিস্তব্ধ রাত। নদীর জলে গাছগাছালি আর পাহাড়ের উপর উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল। বড় সুন্দর দৃশ্য। সেই সঙ্গে নদীর ঢেউয়ের মৃদু শব্দ। ফ্রান্সিস মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইল। এবার সহজেই বুঝল কেন ইবু সালোমন মাঝে মাঝেই এই লোভাত নদী দেখতে আসতেন। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

সকালে বাসি রুটি আর ঝোল খেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। গতকালের মতো একই জায়গায় নৌকোগুলো তীরে পুঁতে রাখা খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁটতে লাগল সবাই। আজকে সূর্যের তেজটা কম। মাঝে মাঝে কালচে মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। তবে রাস্তা বলে তো কিছু নেই। তাই একটু মন্থর গতিতে হাঁটতে হচ্ছিল। ঘূর্ণির কাছাকাছি পৌঁছে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। ঘূর্ণি বরাবর তীরের দিকে ঝুঁকেপড়া গাছগুলোর কান্ড খুব খুঁটিয়ে

দেখতে থাকো। গাছের কাণ্ডের কোথাও কুড়ুলের কোপের দাগ বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক চিহ্ন মানে মানুষের হাতে তৈরি কোনও কিছু নজরে পড়লেই আমাকে ডাকবে। ছড়িয়ে পড়ল সবাই। ঝুঁকে পড়া ডাল সরিয়ে বা উঁচু ঝোপগাছের ডালপালা সরিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করল।

ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ শোনা যেতে লাগল। খোঁজাখুঁজি চলছে। হঠাৎ শাঙ্কোর চড়া গলা শোনা গেল—ফ্রান্সিস, এদিকে এসো তো। ফ্রান্সিস খোঁজা বন্ধ রেখে ঝোপঝাড় ঠেলে শাঙ্কোর কাছে ছুটে এল। শাঙ্কো বিরাট উঁচু গাছের নীচে ঝোপঝাড় ভাঙছে তখন। ফ্রান্সিসকে গাছটার প্রায় পনেরো হাত ওপরে কাণ্ডটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—ঐ দেখো।

ফ্রান্সিস মুখ উঁচু করে দেখলে ওখানটার কাছাকাছি সব ডালগুলো কাটা। তার মানে কেউ ওখান পর্যন্ত উঠেছিল গাছ বেয়ে। ওখানে একটা মোটা কাছির অংশ পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আশ্চর্য! কাছিটা কাটা। হাত দুয়েক কাটা কাছি ঝুলছে। ফ্রান্সিস জোর গলায় ডাকল—হ্যারি, দেখে যাও।

ওদের জোর গলায় ডাকাডাকি শুনে হ্যারি ছুটে এল। খোঁজাখুঁজি রেখে বিনোলাও ছুটে এল। হ্যারি কাছে এলে কাটা কাছিটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—দেখো, আমার অনুমান সত্যি কিনা।

হ্যারি প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সে চুপ করে ভাবছে তখন ফ্রান্সিস বলল—বুঝিয়ে দিচ্ছি। লক্ষ করো, এখানে ওপারের পাহাড়ি ঢাল অনেকটা নদীর বুকে নেমে এসেছে। তাতে নদীর দুই তীরের দূরত্ব অনেক কমে গেছে। ওপারের ঢালের পরেই মাত্র একটা বিরাট চেস্টানাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যারি ওপারের চেস্টনাট গাছের সঙ্গে এপারের এই উঁচু গাছটার দূরত্ব আন্দাজ করে বলল—হ্যাঁ, দুটো গাছের দূরত্ব অনেক কম।

—ওপারে না গিয়েও আমি বলে দিচ্ছি—ওপারের চেস্টনাট গাছটার দশ-পনেরো হাত ওপরের কাণ্ডে ঠিক এমনি একটা মোটা কাছি বাঁধা আছে। সেটাও কেটে ফেলা হয়েছে।

তার অর্থ দাঁড়াল—ইবু সালোমনের নির্দেশে তাঁর দুঃসাহসী যোদ্ধারা দু'পারের দুটো গাছে ঐ উচ্চতায় একটা মোটা কাছি শক্ত করে বেঁধেছিল। এবার কল্পনা করো ঐ কাছিটা ঠিক ঘূর্ণির ওপর দিয়ে গেছে কিনা। হ্যারি ঘূর্ণিটার দিকে তাকাল। হিসেবে করল। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কাছিটা টানা হলে ঠিক ঘূর্ণিটার ওপর দিয়েই যাবে। ও বলে উঠল—সাবাস ফ্রান্সিস। এবার সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। একজন বা দুজন দেহরক্ষী—

—দুজন। অত ভারী সিন্দুকটা একজনের পক্ষে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। টানা কাছিটায় একটা মোটা দড়ির ফাঁস পরানো হয়েছিল। সেই ফাঁসে সোনার মুদ্রাভর্তি সিন্দুকের দু'পাশের কড়া দুটোয় দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ঝুলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঐ ঘূর্ণিটার ঠিক ওপরে। দড়ির নানারকম গিঠ বাঁধা ফাঁস দড়িতে ঝুলিয়ে মালপত্র এ জাহাজ থেকে ঐ জাহাজে নিয়ে যাওয়া এসব রীতিতে আমরা অভ্যস্ত। দেহরক্ষীরা সেটাই করেছিল।

—তারপর ওপর থেকে দড়ি কেটে সিন্দুকটা ঐ ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এই তো? হ্যারি বলল।

—ঠিক তাই। এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা ভেবে নিয়েছি।

—তাহলে তো যে কথাটা আমি আগে বলেছিলাম সেটাই বলি—ইবু সালোমন কি ঐ সম্পত্তি চিরদিনের জন্য মানুষের নাগালের বাইরেই রেখে দিতে চেয়েছিলেন? হ্যারি বলল।

—এই জায়গায়টাতেই আসল রহস্য। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

তোমার কী মনে হয়? হ্যারি জানতে চাইল।

—না। উনি প্রয়োজনের সময় এই গোপনে ফেলে দেওয়া সিন্দুকটা উদ্ধারের উপায় রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল। কবিতাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। শেষের দিকের পংক্তি—তাদের সেই প্রশান্তির সম্পদ বিলিয়ে দাও।' তাহলে তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে সেই সম্পদ উদারতা ভালোবাসা বা ওরকম কিছু না—এমন কিছু যা অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ স্বর্ণ সম্পদ—তাই কিনা? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রেখে হ্যারি বলে উঠল—আবার বলছি সাবাস ফ্রান্সিস।

—এখনও কিন্তু সেই সিন্দুক উদ্ধার করতে পারিনি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, একটা সূত্র পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি এখনও খুঁজে পাইনি। আজ আর খোঁজাখুজি নয়। এখন আমরা ঐ ইরেকাস গ্রামে ফিরে যাব। চলো সব।

আবার ইরেকাস গ্রামের দিকে চলা শুরু হল। সেই পাথর-পাথুরে মাটি গাছ-ঝোপের মধ্যে দিয়ে। দুপুর পেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস একটু চিন্তিত স্বরে বলল—হ্যারি, দুপুরে খাওয়ার কথা কিছু তো বলে যাইনি। হ্যারি হেসে বলল—তুমি যখন নিজের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে চুপ করে থাক তখন অন্য দিকগুলো তো আমাকেই ভাবতে হয়। চিন্তা নেই—শাঙ্কোর কাছ থেকে আরো দুটো স্বর্ণমুদ্রা বৃদ্ধকে দিয়ে বলে রেখেছি—আরো দু'একদিন আমরা এখানে থাকব। আপনি আমাদের.

খাওয়ার ব্যবস্থা রাখবেন। এই জন্যেই হ্যারি, তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলে না। এমনকি—মারিয়াও মাঝে মাঝে আমার মন বোঝে না। স্বাভাবিক রাজকুমারী তো সেদিনের।

—তা ঠিক, হ্যারি, ফ্রান্সিসের কথার উত্তর দিল।

রান্না হয়ে গিয়েছিল। পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ভাইকিংরা আর দেরি করল না। নিজেরাই উঠোনের একপাশে জড়ো করে রাখা লম্বাটে শুকনো পাতা নিয়ে এসে খেতে বসে গেল। খেতে খেতে পাশে বসা শাঙ্কোকে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো একটা খুব দরকারি কাজ তোমাকে করতে হবে। একা। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তুমি কাল দুপুরে খেয়ে একটা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে যাবে। জাহাজে উঠে যত লম্বা পাও একটা শক্ত কাছি আর মোটামুটি হাতকুড়ি শক্ত দড়ি নিয়ে আসবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—এটা এমন কিছু কাজ নয়। সমস্যা হল-এখন ভাটার টান চলছে। নৌকো গুলো নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু ফেরার সময় জোয়ারের টান না পেলে উজান বেয়ে আসতে বেশ কষ্ট হবে।

—তাহলে একটা নৌকোতে না হয় বিনোলা যাবে। তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। কাছিটা পাকিয়ে রাখতে একটা নৌকোর জায়গায় না হয় দুটো নৌকোয় ছড়িয়ে রাখব। আর একটা নৌকো নিয়ে আসব।

—যেমন সুবিধে বুঝবে। তবে ঐ নৌকোটায় আমার নামের আদ্যক্ষর 'এফ' আমি খোদাই করে রেখেছি। ওটা চেপেই ডুবো পাহাড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে সোনার ঘন্টার দ্বীপে গিয়েছিলাম। আমি মারা গেলে ঐ নৌকোটা রাজার যাদুঘরে সোনার ঘন্টাটার পাশে রেখে দিও।

—ফ্রান্সিস, মৃত্যুচিন্তা মনকে দুর্বল করে দেয়। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যারি, ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা। বেঁচে থাকতে আমাকে উজ্জীবিত করে। মৃত্যু তো অমোঘ সত্য। আমি কক্ষনো ভুলি না—যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। কাপুরুষের কলঙ্কিত মৃত্যু নয়—বীরের মৃত্যু।

—এজন্যেই সত্যি বলছি, মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে। হ্যারি আবার মৃদুস্বরে বলল। তারপর বলল—এই যে তুমি দু'ধারের গাছে কাছি বেঁধে দুরন্ত ঘূর্ণির ঠিক ওপরে কাছি বেয়ে বেয়ে যাবে বলে স্থির করেছ—জান এটা কতবড় মারাত্মক ঝুঁকি!

—সে তো হাত ফসকে ঘূর্ণিতে পড়ে গেলে। শোনো একটা সূত্র পাওয়া বাকি। সেটা পেলে নির্বিঘ্নে ঐ সিন্দুক ঘূর্ণির মধ্যে থেকে তুলে আনতে পারব। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? নির্বিঘ্নে? জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে?

—আলবাৎ পাড়ব। কিন্তু হ্যারি, আমার মন বলছে অত সহজে সিন্দুকটা উদ্ধার করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে উঠোনেই খাওয়ার-দাওয়া চলছে। দুপুরের মতো বৃদ্ধ এদিক ওদিক ঘুরে তদারকি করছে। হ্যারি হেসে বলল— আপনি ঘরে যান। বিশ্রাম করুন। বৃদ্ধ আর কোনও কথা না বলে চলে গেল।

'রাতে আগের মতোই উঠোনে এখান-সেখানে শুয়ে পড়ল সবাই। নদীর দিকে থেকে সারাদিনের গরমের পর ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সবাই। শুধু ফ্রান্সিস মাথার পেছনে দুহাতের চেটো রেখে চোখ বুজে শুয়ে আছে। হাতে সময় নেই। শাঙ্কোদের ফিরতে দেরি হয়ে গেলে সমস্যা বাড়বে। সবাইকে নিয়ে ঐ বাঁকে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সন্ধের অন্ধকারের আগে কতক্ষণ আর সময় পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলল। আকাশে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে যেন। আগণন তারা জ্বলছে। হালকা সাদা মেঘ উড়ছে। আঃ পৃথিবী কী সুন্দর! এই চোখে দেখা আকাশই তো শেষ সীমা নয়। সহপাঠী হ্যারির সঙ্গে এক পাকা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বৃদ্ধর পাথরের ঘুপ্‌চি ঘরে ওরা জনা দশবারো ছাত্র পড়ত। বৃদ্ধের নাম মনে নেই। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলত বৃদ্ধই। তোমরা যে আকাশটা দেখ সেটা ছাড়িয়ে এই যে শূন্যতা তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। এরকমই কী যেন। ফ্রান্সিস মনে মনে ভাবছিল—হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল তখনই। দেখল ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

—ঠিক জানি। ঘুমোওনি। হ্যারি বিড়বিড় করে বলল। হ্যারি, ছেলেবেলাটা সত্যি বড় সুন্দর তাই না?

—কী এমন নতুন কথাটা বললে আঁ?

—শাঙ্কোরা যে কখন ফিরতে পারবে তাই ভাবছি। ফ্রান্সিস একই চিন্তিত স্বরে বলল।

—ভেবে কী করবে? যখন আসার আসবে। কিন্তু রাত জাগলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। হ্যারি বলল।

—ও আমার অভ্যেস আছে তা জান। ফ্রান্সিস পাশ ফিরতে ফিরতে বলল।

পরেরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল বৃদ্ধকে গিয়ে বলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন দুজনের মতো খাবার এক্ষুনি বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করেন। বেশি কিছু না। শুধু রুটি মাছের ঝোলমতো। হ্যারি সেই বৃদ্ধকে দেখল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি কাছে গিয়ে বলল দেখুন বাধ্য হয়ে আপনাকে একটু বিরক্ত করছি। বৃদ্ধ কোমল মুখে হেসে বলল বলুন কী ব্যাপার। রান্না ভালোই হচ্ছে না?

—না, না। এত সুস্বাদু মাছ আমরা কোনদিন খাই নি। আচ্ছা এই মাছগুলোর নাম কী?

—লিতানি। এই নদীতে প্রচুর পাওয়া যায়। বর্ষার সময় তো হাজারে হাজারে মাছ। কাছাকাছি গ্রাম থেকে ব্যবসায়ী আসে। নৌকো ভর্তি করে মাছ কিনে নিয়ে যায়। সেই সব মরশুমে আমাদের আয় যথেষ্ট হয়। বলতে পারেন ঐ আয়ের ওপরেই আমরা বেঁচে আছি।

—শুনে ভাবতে লাগল। এখন যা বলছিলাম আমাদের দুই বন্ধু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে আমাদের নোঙ্গর করা জাহাজে যাবে। খুব দরকারি কিছু জিনিস নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। কাজেই এই দুজনের জন্যে—

—বুঝেছি।

—যদি বলেন রান্নার ব্যাপার আমরা সাহায্য করতে পারি।

—সে কি! আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের নিজেদের রান্না করা খেতে দিলে আমাদের গ্রামের অমঙ্গল হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন। বাড়ির মেয়েদের বলছি—অল্পক্ষণের মধ্যেই রান্না করে দিতে।

হ্যারি শাঙ্কোকে গিয়ে তাড়া লাগাল। বলল তোমাদের দুজনের জন্যে যা হোক রেধে দেওয়া হচ্ছে। দেরি না করে খাওয়া শেষ করেই যাত্রা শুরু করবে। আর হ্যাঁ পেট পুরে খাবে। তোমাদের বেশি খেলে আমাদের খাবার কম পড়ে যাবে কিনা এসব একেবারে ভাববে না। যাও—শুয়ে পড়ে বিশ্রাম যতটা পার করে নাও।

শাঙ্কো বিনোলাকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারল। তারপর তৈরি হয়ে নদীর ধারে চলে এল। দুটো নৌকোয় উঠল দুজনে। নদীর জলের ভাঁটার টানে নৌকো ছেড়ে দিল। দুপুরের রোদের তেজ কম।এদিক ওদিক আকাশ ছাড়া ছাড়া মেঘ রোদের তেজ চাপা পড়ে গেছে।

নদীর মুখের কাছাকাছি এসেছে আজ শাঙ্কো আর বিনোলা। শাঙ্কো হিসেব করে বুঝল ভাটার টানে বেশ তাড়াতাড়িই এসেছে। পশ্চিমের তারাজ্বলা আকাশে বাঁকা

চাঁদ। খুব উজ্জ্বল চাঁদের আলো নেই। এর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় চারিদিক মোটামুটি দেখে বোঝা যাচ্ছে একপাশে গাছগাছালি অন্য পাশে উঁচুনিচু পাহাড়ি এলাকা।

দূর থেকে শাঙ্কো অস্পষ্ট দেখল ওদের জাহাজটা বাঁদিকের তীরে নোঙ্গর করা হয়েছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় আস্তে আস্তে দুলছে। শাঙ্কোদের রাত তো চাঁদের আলো না থাকলে অন্ধকারেই কাটে। কাজেই অন্ধকারে ওরা বেশ আন্দাজে সব বুঝে নেয়। অন্তত জাহাজ বন্দর সহজেই বুঝতে পারে।

ওদের জাহাজের কাছে এসে দেখল জাহাজের সব আলো নেভানো এমনকি সিঁড়ির ঘরের আলোও। শাঙ্কোর কেমন খটকা লাগলো। ওরা সাধারণত রাতে সিঁড়িঘরের আলোটা জ্বেলে রাখে যাতে জাহাজে রাতের অন্ধকারে জলদস্যুরা জাহাজে উঠলে দেখা যায়। কয়েকজন বন্ধু জাহাজের উপর ঘুমোয়। ওদের তো ডাকতে হয়। শাঙ্কোরা আসবে এটা তো ওরা জানে না। জাহাজের গায়ের কাছে এসে শাঙ্কো হাতের চেটো গোল করে চেঁচিয়ে ডাকল—ভাইসব একটু সজাগ থাকো। এভাবে মড়ার মতো ঘুমিও না। কিন্তু কারও কোন সাড়া পেল না। অবাক কাণ্ড! কেউ কি তাহলে উপরে শোয়নি। যাক গে জাহাজে উঠে দেখা যাবে। নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে লাগল। দড়ির মইটা নামানো নেই। অবশ্য বন্ধুদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওরা যে এত তাড়াতাড়ি মাত্র দুজন আসবে এটা তো ওদের জানা নেই। হালের কাছে গোটানো দড়ি ধরে ধরে শাঙ্কো জাহাজের অন্য পাশে চলে এলো। তখনই অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখল নদীর মুখের ওপাশে একটা জাহাজ দেখল। চলন্ত জাহাজ নয়। নোঙ্গর করা জাহাজ। শাঙ্কো দড়ি ধরে উঠতে উঠতে ভাবল—এই জাহাজেটা বোধ হয় ওদের পর এখানে এসেছে। কিন্তু জাহাজে চড়ে এখানে কারা এল? যাক গে দুজনে পরপর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় জাহাজের উপর উঠে এল। সামনে তাকিয়েই শাঙ্কো দেখল—রাজকুমারী চুপ করে সিঁড়িঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো রাজকুমারীর দিকে যেতে যেতে বলল—রাত জাগবেন না। যান ঘুমিয়ে পড়ুন। ফ্রান্সিসরা সবাই সুস্থ। ভালো আছে। রাজকুমারীর কাছে এসে শাঙ্কো সেই স্বল্প আলোয় দেখল—রাজকুমারী কেমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখ শুকনো। মাথার চুল এলোমেলো। কেমন রোগার্ত। রাজকুমারী—আপনার শরীর ভালো আছে তো? আপনি অসুস্থ শুনলে ফ্রান্সিস কিন্তু —কথটা শাঙ্কো শেষ করতে পারল না। দেখল সিঁড়ি দিয়ে দুতিনজন মূর যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত উঠে এল। বিদ্যুৎ চমকের মতো ওর মনে পড়ল একটা জাহাজ ও আগে দেখে এসেছে। তাহলে মুর যোদ্ধারা

দু তিন জন মূর যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত উঠে এল।

ওদের জাহাজ দখল করেছে। রাজকুমারীসহ সবাই তাহলে বন্দী। শাঙ্কো ত্বড়িৎ গতিতে রেলিঙ্গের দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে বললো—বিনোলা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পালাও। কথাটা বলতে বলতেই শাঙ্কো লাফ দিয়ে রেলিঙ টপকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরেই একটু ডুবে ওদের একটা নৌকার কাছে ভেসে উঠল। ভেজা শরীর নিয়ে এক ঝটকায় একটা নৌকায় উঠে পড়েই এক হাঁচ্‌কা টানে দড়িটা ছিঁড়ে নৌকাটা নিয়েই দাঁড় তুলে বাইতে লাগল। জোরে দাঁড় বেয়ে অনেকটা দূরে চলে এল। মাথা তুলে এক নজর দেখল—রেলিঙ ধরে মূর যোদ্ধারা তাকিয়ে আছে। শাঙ্কো জোরে শ্বাস ফেলল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ দাঁড় বাইতে লাগল। জোয়ার তখন শুরু হয়ে গেছে। বেশ কষ্ট করেই নৌকাবাইতে লাগল। জোয়ারের টান বাড়ল। নৌকো দ্রুত চলল।

ততক্ষণে মুর যোদ্ধারা বিনোলাকে ধরে সিঁড়িঘরের দিকে নিয়ে চলেছে। রাজকুমারী দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই বন্দী জীবনে একটাই সান্ত্বনা ফ্রান্সিসরা সকলেই সুস্থ আছে, ভালো আছে। অবশ্য কবে সবাই ফিরবে সেটা আর আতর্কিতে আক্রান্ত শাঙ্কো বলতে পারে নি।

শাঙ্কো দাঁড় বাওয়া একেবারে বন্ধ করতে সাহস পেল না। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল খুব অস্পষ্ট ওদের জাহাজটা তখন বেশ দূরে। চাঁদের আবছা আলো চারদিকে। আস্তে আস্তে জোয়ারের টান আরও বাড়ল। সেই টানে নৌকো বেশ তাড়াতাড়িই ভেসে চলল। এতক্ষণে শাঙ্কো বুঝতে পারল ও কতটা ক্লান্ত। একটু আস্তে আস্তে দাঁড় বাইতে লাগল। নদীর জলে চাঁদের নিস্তেজ আলো পড়েছে। নদীর দুপাশে এবার কালো কালো গাছগাছালি শুরু হল। আস্তে আস্তে চারদিক একবারে অন্ধকার হয়ে গেল। শাঙ্কো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কালচে মেঘ জমেছে আকাশে। হঠাৎই জলে ছড় ছড় শব্দ তুলে বৃষ্টি নামল। কেমন ধূসর হয়ে গেল আকাশটা। ঝাপসা হয়ে গেল চারদিক। এক তো সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের পোশাক ভিজে গিয়েছিল এখন বৃষ্টির জলে পোশাক সপসপে হয়ে গেল। মেঘ উড়ে গিয়ে বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ সাদাটে হয়ে গেল। বোঝা গেল ভোর হতে দেরি নেই।

তখন সবে সূর্য উঠেছে। চারিদিক ভোরের রোদ ছড়িয়ে পড়ল। দূরে ইরেকাস গ্রামের ঘাট দেখা গেল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ঘাটে নৌকো দুটো ভেড়াল। নৌকো চালিয়ে এত দূরে যাওয়া আসা। শাঙ্কো ক্লান্তিতে অবসাদে তখন প্রায় নড়তেই

পারছে না। ঘাটে বন্ধুরা কেউ দাঁড়িয়ে নেই। শাঙ্কো শরীরের সমস্ত জোর এক করে প্রাণপণে ডাকল—ফ্রান্সিস। কিন্তু সেই ডাক খুবই মৃদু শোনাল। শাঙ্কো বুঝল তীরে উঠে না ডাকলে কেউ শুনতে পাবে না। ও ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না গা ছেড়ে দিয়ে নৌকায় জমা বৃষ্টির জলের মধ্যে চোখ বুজে পড়ে রইল। নৌকটা ভাসতে ভাসতে তীরের কাছে এসেছে তখন। ফ্রান্সিস দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। শাঙ্কোরা ফিরবে বলে। কাজেই সারারাত প্রায় জেগেই কেটেছে। শাঙ্কোর ডাক খুব অস্পষ্ট ওর সতর্ক কানে পৌঁছলো ও এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই তীরভূমির দিকে ছুটলো। ফ্রান্সিসকে ছুটতে দেখে হ্যারিও পেছনে পেছনে ছুটল।

তীরের কাছে নৌকো ভাসছে। তখন ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকার কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল নৌকোর মধ্যে শাঙ্কো একা অসাড় পড়ে আছে। হাতে দাঁড়টা ধরা আছে। ও তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শাঙ্কোকে টেনে তুলল। তখনই হ্যারি আর দুই বন্ধুও এসে হাত লাগাল। ওরা শাঙ্কোর অসাড় দেহটা তুলে এনে পাথুরে শুকনো মাটির উপরে শুইয়ে দিল। এতক্ষণ শাঙ্কো চোখ বুঁজে ছিল। এবার চোখ মেলে ফ্রান্সিসদের দেখল। ফ্রান্সিস পাশের বন্ধুটিকে বলল—শিগগির শাঙ্কোর জন্যে শুকনো কাপড় নিয়ে এস। বন্ধুটি ছুটে গেল। হ্যারি শাঙ্কোর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল শাঙ্কো তুমি সুস্থ আছো তো? শাঙ্কো ম্লান হেসে মাথা কাত করল।

—শাঙ্কো-বিনোলা কোথায়? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল । শাঙ্কো হাতের চেটোতুলে ইঙ্গিত করল—পরে বলবে। ফ্রান্সিস আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। তখনই বন্ধুটি শাঙ্কোর জন্য শুকনো পোশাক নিয়ে এল। সবাই মিলে শাঙ্কোকে দাঁড় করাল। তারপর ভিজে পোশাক খুলে শুকনো পোশাক আস্তে আস্তে পরিয়ে দিল। শুকনো পোশাক পরে শাঙ্কোর শরীর যেন সাড় এল।

হেঁটে যেতে পারবে? হ্যারি জানতে চাইল। শাঙ্কো মাথা কাত করল। দুতিন জন শাঙ্কোকে ধরে ধরে বাড়ির উঠোনে নিয়ে এল। যে মোটা কাপড় পেতে ওরা কয়েক জন রাতে শুয়ে ছিল সেখানে শাঙ্কোকে আস্তে করে শুইয়ে দিল।

—সিনাত্রা দেখো তো কারো বাড়িতে দুধ পাও কি না ফ্রান্সিস বলল, সিনাত্রা চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় গ্লাসে করে দুধ নিয়ে এলো। গ্লাসটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস বুঝল বেশ গরম দুধ। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর মাথা তুলে ধরল। হ্যারি আস্তে আস্তে শাঙ্কোকে দুধ টুকু খাইয়ে দিল।

—ছাগলের দুধ। সিনাত্রা বলল।

—গরম হলেই হল। ফ্রান্সিস বলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এত ক্ষণ ভিজে পোশাকে থাকা শাঙ্কো শরীরের উষ্ণতা অনুভব করল। ও আস্তে আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ওর পাশে বসল।

—এখন ভালো লাগছে তো? হ্যারি বলল।

শাঙ্কো মাথা কাত করে দুর্বল স্বরে বলল। হ্যাঁ।

—শাঙ্কো আমার মনের আশঙ্কা যাচ্ছে না জাহাজের সবাই ভালো আছে তো? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—মনে হয় ভালো আছে। তবে সবাই বন্দী হয়ে আছে জাহাজে। রাজকুমারী শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তবে অসুস্থ নয়। তারপর শাঙ্কো থেমে থেমে আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বলল। ফ্রান্সিস হ্যারি দুজনেই চুপ চাপ রইল। ততক্ষণে বন্ধুরাও এসে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল—এখন সবই পরিষ্কার বুঝতে পারছি ইবু গ্যাব্রিওল জাহাজ ভর্তি যোদ্ধা নিয়ে আমাদের হন্য হয়ে খুঁজে বেরিয়েছে। উদ্দেশ্য ইবু সালোমনের স্বর্ণভাণ্ডারের উদ্ধারের জন্যে আমরা চেষ্টা করছি কিনা। ও ভালো করেই জানে ঐ স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করার বুদ্ধি ওর নেই। ওর বন্ধুদেরও নেই। খুব ধুরন্ধর তো ঠিক আন্দাজ করেছে আলফানসো আমাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে আর আমরা স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে নেমেছি। আমরা সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারলে নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে জাহাজে ফিরবো। তাই ও বুদ্ধি খাটিয়ে জাহাজ দখল করে বন্ধুদের বন্দী করছে। অপেক্ষা করছে কখন আমরা আসব তার জন্যই।

—তাহলে এখন কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—বন্ধুদের আগে মুক্ত করবো। ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে বলল।

—তাহলে তো আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে। আর একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায়। ঐ দুর্ধর্ষ মুর যোদ্ধাদের সঙ্গে তো লড়াইয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। হ্যারি বলল।

—হ্যারি কব্জির জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি। আজকের দিনটা থাক। শাঙ্কোর যা অবস্থা। একদিন বিশ্রাম পেলে শাঙ্কো অনেকটা সুস্থ হবে। ওকে এই অবস্থায় সাথে নেওয়া যাবে না। আবার ওকে এখানে একা রেখেও যাওয়া যাবে না। একটা দিন তো হাতে আছে। ঠিক একটা ছক কষতে পারবো।

—কিন্তু ইবু গ্যাব্রিয়েল শুধু ধুরন্দর নয় ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। নিজের অমন নিরীহ পিতাকে যেভাবে নিঃশব্দে হত্যা করেছে—। ফ্রান্সিস হাত তুলে হ্যারিকে

থামিয়ে দিয়ে বলল—অনেক দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষেরই কোন না কোন দুর্বলতা থাকে। ইবু গ্যাব্রিয়েল সম্পদ পিশাচ। এটাই ওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সেই ফাঁদেই ওকে ফেলতে হবে।

—তাহলে তো সেই স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করতে পারলে—

—হ্যাঁ। ওকেই দিয়ে দেব। হাজার হোক ও তো ইবু সালোমানের পুত্র। পিতার সম্পদের অধিকারী তো ইবু গ্যাব্রিয়েলই। প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করবো ধনী হবো সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তো আমরা গুপ্তধনভাণ্ডার উদ্ধার করি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। কিন্তু ওর মতো নরপশুকে কি বিশ্বাস করা যায়?

—ভাবতে হবে। একটা পুরো দিন তো পাচ্ছি। দেখি সবদিক ভেবে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তুমি এই বৃদ্ধকে বল—তাড়াতাড়ি যা হোক রেঁধে দিতে। শাঙ্কোকে সুস্থ করাই এখন আমার প্রাথমিক কাজ। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো—এখন শুয়ে বিশ্রাম কর রান্না হলেই পেট পুরে খাবে। সারা দুপুর শুয়ে ঘুমিয়ে বিশ্রাম করবে। রাতেও বিশ্রাম ঘুম হলে কাল সকালেই তুমি সুস্থ বোধ করবে। আর কথা নয়। এবার বিশ্রাম কর। ফ্রান্সিস উঠে এল। শাঙ্কোর জন্য রান্না হল কি না সেই খোঁজে চলল। বন্ধুরা কয়েকজন এসে শাঙ্কোর কাছে বসল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু মাঝে মাঝেই উন্মানা হয়ে যেতে লাগল। রাজকুমারী ও বন্ধুরা বন্দী হয়ে আছে। এই কথা ভেবে। ফ্রান্সিস কী ভাবে ওদের মুক্ত করবে সেই চিন্তাই করছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কোকে বাসি পাঁচ-ছটা রুটি গরম করে সঙ্গে বেশ কয়েকটা মাছের ঝোল দেওয়া হল। শাঙ্কো খেতে লাগল।

রাতে খাওয়ার সময় হ্যারি বলল—তাহলে কখন যাবো আমরা?

—দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়েই বেরিয়ে পড়বো ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। শুধু রুটি আর মাছের ঝোল। অন্য কোন পদ নয়।

পেট পুরে খাও। রুটি খাওয়া নাও জুটতে পারে। ফ্রান্সিস যেমন বরাবর বলে তাই গলা বাড়িয়ে বলল। পরদিন বিশ্রাম করে ঘুমিয়ে শাঙ্কো আবার গায়ে জোর পেল। তারপর তৈরি হয়ে নদীর ধারে চলে এল। দুটো নৌকোয় উঠল সবাই। নদীর জলের ভাঁটার টানে নৌকো ছেড়ে দিল।

কেউ কোন কথা বলছিল না। ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল।

একটাই সমস্যা। আবু গ্যাব্রিয়েল নিজে ঐ জাহাজে আছে কিনা। শাঙ্কো বলতে পারেনি।

কারণ ও তরোয়াল হাতে কয়েকজন মূর যোদ্ধাকেই দেখেছে শুধু। ইবু গ্যাব্রিয়েল থাকলে যে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। দলপতি সেটা পারলেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাবে। ওরা ইবু গ্যাব্রিয়েলকে যমের মতো ভয় করে। এটাই স্বাভাবিক।

সন্ধ্যের কাছাকাছি সময়ে ফ্রান্সিসদের নৌকোদুটো নদীর মুখের কাছাকাছি এল। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় দেখা গেল দুটো জাহাজই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস আশান্বিত হল নিশ্চয়ই ইবু গ্যাব্রিয়েল এসেছে সরেজমিনে সব দেখতে।

জাহাজ দুটোর কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিসরা দেখল খোলা তরোয়াল হাতে বেশ কয়েকজন যোদ্ধা জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। সিনাত্রা হ্যারির কাছে এসে বলল—ওরা তো আমাদের মেরে ফেলবে।

—এখনই ঠিক বলতে পারছি না। তবে ফ্রান্সিস খুব ভেবেচিন্তে পা ফেলে। কাজেই প্রাণের ভয় নেই। হ্যারি বলল।

নৌকো দুটো জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিস নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে গলা তুলে বলল—ভাই, আমরা নিরস্ত্র। আমরা লড়াই করতে আসিনি একথা আগেই বলেছি। আমরা বন্ধুদের খোঁজ নিতে এসেছি। তখন যোদ্ধাদের মধ্যে একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আস্তে আস্তে, পা ফেলে এগিয়ে এল। বেশ গর্বোদ্ধত ভঙ্গি অন্য যোদ্ধাদের মতো পোশাক হলেও মাথায় একটা কালো কাপড়ের পাগড়ির মতো। তরোয়ালের বাঁটে সোনারূপোর কাজ করা। বেশ বলশালী চেহারা। গলায় বুটিমতো সোনার হার ঝুলছে। ফ্রান্সিসদের বুঝতে অসুবিধে হল না এই লোকটিই দলপতি। কাছে আসতে বলল। গায়ের আটোসাটো কালো পোশাকটা দামি কাপড়ের। হয় তো এই যোদ্ধার হাতেই ইবু সালোমানের মৃত্যু হয়েছে। মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব এলেও নিজেকে সংযত করল।

তোমার বন্ধুরা আমাদের জাহাজে বন্দী হয়ে আছে। দলপতি বলল।

কেন?

—তোমরা ইবু সালোমনের কুফির ভাণ্ডার উদ্ধার করে এই জাহজেই আসবে। যাতে তোমরা আমাদের স্বর্ণমুদ্রার সিন্দুক নিয়ে পালাতে না পার আগাম সেই ব্যবস্থা করে রাখতে। বেশ গম্ভীর গলায় দলপতি বলল।

—তাকিয়ে দেখুন আমাদের দুটো নৌকোয় কয়েকটা দাঁড় আর কিছু পোশাক পড়ে আছে।

—ও তাহলে তোমরা সেই সোনার ভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারো নি? দলপতি যেন একটু হতাশ হল।

—তার আগে একটা কথা জানতে চাই বর্তমান শাসক ইবু গ্যাব্রিয়েল কি এই জাহাজে আছেন?

—হ্যাঁ উনি দুপুরের সব ব্যবস্থা দেখতে এসেছেন।

—তাঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে বলতে পারো। আমি রব্বানি। সেনাপতি।

—না। আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চাই। বোঝা গেল সেনাপতি রব্বানি বেশ মন ক্ষুণ্ণ হল। তবে আর কোন কথা না বলে বলল—দাঁড়াও। ইবু গ্যাব্রিয়েলকে সংবাদ পাঠাচ্ছি। একজন যোদ্ধাকে এসে ইঙ্গিত করল যোদ্ধাটি দ্রুত চলে গেল।

একটু পরে ইবু গ্যাব্রিয়েল সিঁড়িঘর দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। জেনারেল পোষাক পরনে। মাথায় পাগড়ির সামনে একটা বড় মুক্তো বসানো। বলল—

—তোমরা তো ভাইকিং? বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল।

—হ্যাঁ ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—তোমাদের দলনেতা কে? ইবু গ্যাব্রিয়েল জিজ্ঞেস করল।

—আমি। ফ্রান্সিস বলল—আমার নাম ফ্রান্সিস।

—হুঁ। আমি সব খবর রাখি। আলফানসোকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছো। লোকটা আমার হাত ফসকে পালিয়েছিল। যাকগে—আমাদের পৈতৃক সম্পদ-সিন্দুক ভর্তি কুফি তোমরা উদ্ধার করতে পেরেছো! বেশ সাগ্রহে ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল।

—না। তবে অনুমান করছি। সেই অনুমান কতটা সত্যি তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি? ইবু গ্যাব্রিয়েল প্রায় লাফিয়ে উঠল। এইবার ভুরু কুঁচকে ফ্রান্সিসের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ পিট্ পিট্ করতে করতে বলতে লাগল-এই নিখোঁজ সোনার মুদ্রাভর্তি সিন্দুকটা একমাত্র আমিই দেখেছিলাম। আর আলফানসো বুড়োটা হয়তো দেখেছে। তুমি বুড়োটার সুযোগ বুঝে পালিয়েছে। ইবু গ্যাব্রিয়েলের চোখ পিট্পিট্যানি দেখে ফ্রান্সিস বুঝল

লোকটা শুধু নরপশুই নয় ধূর্ত। সাবধানে কথা বলতে হবে।

কিন্তু অনুমানটা করলেন কি করে? ইবু গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইল।

ইবু সালোমান একজন সত্যিকারের কবি ছিলেন তবে একইসঙ্গে বুদ্ধিমানও ছিলেন। নইলে আরবীর বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করে অত ধনসম্পদ বাঁচাতে পারতেন না।

—ও সব শুনে লাভ কী । আসল কথা বল। ইবু গ্যাব্রিয়েল তাড়া লাগাল।

—তাঁর শেষ কবিতা থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। ওটা তো পাগলের প্রলাপ। ইবু গ্যাব্রিয়েল দেঁতো হাসি বলল।

—না। ওটা গিজেল না বেশ ভেবেচিন্তে লেখা। কবিতা।

—কিন্তু আমি ঐ কবিতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি।

—কবিতাটা আলফানসোর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। বৃদ্ধটা তো আভাসেও একথা বলেনি।

—কারণ উনি একটা মর্মন্তুদ ঘটনা আন্দাজ করে ঐ কবিতাটা দু এক পংক্তি মনে করতেই তাঁর চোখে জল আসতো অর্থটা আর ভাবতে পারেন নি। আমরা সেই অর্থটা বুঝতে পেরেছি। তার সাহায্যেই এগিয়েছি। তবে এখনও নিশ্চিন্তই কবিতার মধ্যে দিয়ে ইবু সালোমান যা বলতে চেয়ে ছিলেন তার সত্যতা এখনও যাচাই করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি তোমার অনুমান সত্যি হয় তবে ঐ স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে? ইবু গ্যাব্রিয়েল আবার চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল।

—এখনই বলতে পারছি না। ফ্রান্সিস মাথা এপাশ ওপাশ করল।

—যদি উদ্ধার করতে পারো তহলে আমাদের ফাঁকি দিয়ে ঐ ধনসম্পদ নিয়ে গোপনে পালাবে। এটাই তো তোমাদের মতলব।

—একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

—অবাক কাণ্ড। তোমাদের এই জাহাজটা তো একটা সিন্দুকে দামি দামি গয়না সোনার চাকতি পেয়েছি। সে সব কি কেউ তোমাদের বিলিয়ে দিয়েছে? ইবু গ্যাব্রিয়েল ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল।

—সেই সম্পদের সঙ্গে বহু মানুষের রক্ত চোখে জল মিশে আছে। এই সম্পদ অভিশপ্ত সম্পদ। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন ভাল ভাল কথা বলো হয়তো। অত স্বর্ণমুদ্রা খুঁজে পেলে তখন অন্য চেহারা ধরবে। তোমরা তো লুঠেরার দল।

—এই অভিযোগ এই সন্দেহের চেহারা আমরা আগে দেখেছি। কিন্তু যখন তারা দেখেছে আমরা একটা সোনার আংটিও চাই নি তখন আমাদের বিশ্বাস করেছে। ইবু গ্যাব্রিয়েল, আমরা অন্য ধরনের মানুষ। যদি সোনা ভর্তি সিন্দুক উদ্ধার করতে পারি ইবু সালোমানের যর্থাথ দাবিদার আপনাকেই সব দিয়ে যাবো। বললাম তো একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না।

—আমাকে বোকা বুঝিয়ে পালিয়েও যেতে পারবে না।

—আমরা আমাদের বন্ধুদের বন্দী অবস্থায় রেখে হাজার প্রলোভনেও এক পা যাবো না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল।

—বিশ্বাস কি! আবার ইবু গ্যাব্রিয়েল চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল।

—বেশ। আপনার সেনাপতি রব্বানি নিশ্চয়ই খুব বিশ্বস্ত। তার সঙ্গে আপনার কিছু দুধর্ষ যোদ্ধা আমাদের সঙ্গে চলুক। তাহলে তো আপনার বিশ্বাস হবে আমার কথা? ওদের হুকুম দিয়ে রাখবেন আমরা কেউ পালাতে গেলে তারা যেন তাকে হত্যা করে। আমরা তো নিরস্ত্র। ইবু গ্যাব্রিয়েল একবার রব্বানির দিকে তাকাল। তারপর বলল—বেশ। তোমাদের ওপর নজর রাখতে ওরা তোমাদের সঙ্গে যাবে। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। ও নিশ্চিন্ত হল।

—কবে কোথায় যাবে তোমরা? ইবু গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইল।

—সেটা রব্বানি দেখতেই পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশি না। এখানে তোমরা যে কজন আছো শুধু তারা যাবে। তার বাইরে আর কেউ যাবে না। ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল।

— কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে?

—কি শর্ত?

—গুপ্তধন উদ্ধার করে যখনই আপনাকে দেব তখনই আমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলল।

—সে তখন দেখা যাবে। ডান হাত শূন্যে ঘুরিয়ে গ্যাব্রিয়েল বলল।

—উঁহু। আগে এই শর্তটা আপনাকে মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলল।

ইবু গ্যব্রিয়েল একবার চোখ পিট্ পিট্ করে রব্বানির দিকে তাকাল। রব্বানি—বলল মান্যবর শর্ত মেনে নিন। ওরা ঐ স্বর্ণসিন্দুক কোনদিন উদ্ধারই করতে পারবে না। তখন ওদের বন্দি করে জাহাজ সুদ্ধু রাজধানী ফিরে যাবো আমরা।

—হু। বেশ তোমার শর্ত মেনে নিলাম। তোমরা কখন যাবে? ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে গ্যাব্রিয়েল বলল।

—আজ রাতের খাওয়া শেষ করে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু যাবে যে থাকবে কোথায়? খাবে কী?

—ইরেকাশ নামে একটা গ্রাম আছে। ওখানেই আমরা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ব্বাঃ! বেশ আটঘাট বেঁধেই নেমেছো। ঠাট্টা করে গ্যাব্রিয়েল বলল।

—বুদ্ধিমানরা তাই করে। অবশ্য জঘন্য চরিত্রের মানুষেরাও তাই করে থাকে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—হু। রব্বানিরা আমাদের নৌকোয় যাবে।

—তাহলে তো ভালই হয়। কারণ—কিছু লম্বা কাছি আর দড়ি নিয়ে যেতে হবে আমাদের। নৌকো দরকার।

—ব্বাঃ! বেশ অনুমান মাত্র করেছো। এর মধ্যেই—

—হ্যাঁ। আমি ভেবেচিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে এর আগেও বেশকিছু গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছি। অবশ্য বন্ধুদের সাহায্যও পেয়েছি।

—ভাল—ভাল। ইবু গ্যাব্রিয়েল পিছু ফিরে হালের দিকে চলল। বোধ হয় নিজের জাহাজের দিকে যাবে বলে।

সিঁড়িঘরের কাছে এখন মারিয়া দাঁড়িয়ে ছিল। তখন অস্পষ্টই জ্যোৎস্না মারিয়াকে দেখে ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি মারিয়ার কাছে এল। স্বল্প আলোয় মারিয়ার মুখচোখ দেখেই বুঝল—পেট ভরে খায় নি মারিয়া চিন্তায়। রাতও জেগেছে। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল মারিয়া—তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের বিপদ বাড়বে। তুমি সুস্থ থাকার চেষ্টা কর। কিচ্ছু ভেবো না। ঐ স্বর্ণভাণ্ডার আমরা উদ্ধার ঠিক করতে পারবো। সবাই মুক্তি পাবো। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জাহাজ দেশের দিকে চালাবো। একেবারে দুশ্চিন্তা করো না। শুধু আমার উপরে বিশ্বাস রেখো। মারিয়া মৃদু হাসল।

—যাও—গিয়ে শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম করো। গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার খোঁজ করে ফ্রান্সিসরা কতটা সফল হয়েছে সেটা আর জিজ্ঞেস করল না। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে মারিয়া নেমে গেল। রব্বানি এগিয়ে ফ্রান্সিসকে একসঙ্গে বসতে নির্দেশ দিল। দুজন যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে ওদের পাহারা দিতে লাগল। ফ্রান্সিসরা কজন চুপচাপ ডেকএ বসে রইল। সেনাপতি রব্বানি ফ্রান্সিসের কাছে এল।

বলল—বন্ধুদের দেখবে না?

—কি হবে দেখে? ওদের মুক্ত তো করতে পারবো না বরং ওদের কষ্ট বাড়িয়ে দেবো। তবে একটু অনুরোধ একটা খবর ওদের দিলে উপকার হয়। খবর দেবেন যে আমরা সবাই সুস্থ আছি আর আজ রাতেই স্বর্ণভাণ্ডার অনুসন্ধানে যাচ্ছি। আমার প্রতিজ্ঞা বন্দী বন্ধুদের মুক্ত করবোই।

—বেশ। খবর দেওয়া যাবে। তবে তুমি বড্ড বেশি এগিয়ে ভাবছো। ঐ স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধারের জন্যে মাননীয় শাসক ইবু গ্যাব্রিয়েল কম চেষ্টা করেন নি।

—দেখা যাক। আমরা যে বেশি বুদ্ধিমান সেই প্রমাণ করতে পারি কি না। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ফ্রান্সিসরা রাতের খাওয়া ঐ ডেক এ মশালের আলোয় বসে খেয়ে নিল।

—চলো সব। দেরি করবো না। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

কাছি দড়ি জোগাড় করে নৌকোয় উঠতে উঠতে একটু দেরিই হল। ফ্রান্সিসরা দেখল ইবু গ্যাব্রিয়েল জাহাজের দিক থেকে বেশ একটা শক্তপোক্ত নৌকোয় চড়ে চারজন বলশালী সশস্ত্র যোদ্ধাকে নিয়ে রব্বানি আসছে। রব্বানিদের নৌকো ওদের নৌকোর পিছনে পিছনে এসে দাঁড়াল।

—নৌকো ছাড়া। ফ্রান্সিসের হুকুম শোনা গেল সব নৌকো পরপর যাত্রা শুরু করল। অস্পষ্ট স্রোতের মধ্যে দিয়ে নৌকোগুলি চলল নদীর ওপর দিয়ে ভেসে।

—জোয়ারের টান এসেছে। শাঙ্কো দাঁড় বাইতে বাইতে গলা চড়িয়ে বলল।

—তবু-দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল না। ভোর ইরেকাবা গ্রামে পৌছতেই হবে। ফ্রান্সিসও গলা চড়িয়ে বলল। কাছি দড়ি বোঝাই নৌকোয় শুধু সিনাত্রা একা দাঁড় বাইতে লাগল।

সারা নদীপথে ফ্রান্সিসরা কেউ প্রায় কোন কথা বলল না। হ্যারি ভেবে চলল—ফ্রান্সিস কি সত্যিই স্বর্ণভাণ্ডার হদিশ বের করতে পারবে? ফ্রান্সিস নদীর জলধারার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। হ্যারি একবার ভাবল ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু চিন্তান্বিত ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলল না।

এক সময় ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল। যদি নৌকোর মধ্যে ঘুমুতে চাও ঘুমিয়ে নাও। কালকে অনেক কাজ করতে হবে। হ্যারি আর দুই বন্ধু নৌকার মধ্যে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নৌকোগুলো বেশ দ্রুতই চলল। রব্বানির নৌকোটা ফ্রান্সিসদের শেষ নৌকোটার সঙ্গে বাঁধা ছিল। ওদের তো আর কোন

তাড়া নেই। চিন্তাও নেই। শুধু নিরস্ত্র ফ্রান্সিসদের ওপর নজর রাখা। কেউ পালাতে গেলে তরোয়াল চালিয়ে হত্যা করা।

তখন ভোর হয় হয়। চারটে নৌকোই ইরেকাবা গ্রামের নদীতীরে বাঁধা হল। নামল সবাই। গ্রামের লোকেরা আর সবাই ঘুম ভেঙ্গে উঠেছে। সবার আগে হ্যারি সেই বৃদ্ধের বাড়ীতে এল। দরজায় ধাক্কা দিতে বৃদ্ধ বেরিয়ে এল।

—শুনুন আমরা আমাদের জাহাজ থেকে দড়ি কাছি এসব দরকারি জিনিস আনতে গিয়েছিলাম এই মাত্র এসেছি আমাদের সময় কম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জন্যে যাহোক কিছু খাবার তৈরি করতে বলুন। সঙ্গে আমাদের আরো কয়েকজন এসেছে। সকলের জন্যে অন্তত দুটি করে রুটি আর মাছের ঝোল ব্যবস্থা করুন। শাঙ্কো তখনই এসে হ্যারির পাশে দাঁড়াল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল শাঙ্কো তোমার পট্টি থেকে চারটে সোনার চাকতি বের করে দিও।

—এই দামটা রাখুন আরও দরকার পড়লে দেব। কিন্তু রান্নাটা তাড়াতাড়ি হতে হবে। আমাদের দুই বন্ধু আশপাশের সাহায্য করবে। বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলল—না না। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের রান্নার কাজ করতে দিলে গ্রামের অমঙ্গল হবে। আপনারা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। গ্রামের মহিলাদের মধ্যে ভালো রাঁধুনি এসে আপনাদের খাবার তৈরি করে দিচ্ছে।

হ্যারি ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে সব বলল। তারপর বলল—কাল সারা রাত কারো তেমন ঘুম হয়নি। এই অবস্থায়—

উপায় নেই হ্যারি। সব কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারতে হবে। ঐ নরপশুর উপর আমার বিন্দু মাত্র বিশ্বাস নেই। যত তাড়াতাড়ি স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করে ওর জাহাজে পাঠিয়ে মুক্তি নিতে হবে। বেশি দেরি হলে ইবু গ্যাব্রিয়েল বিগড়ে যেতে পারে। ঐ লোকটা কাউকে বিশ্বাস করে না। নিজেকেও না।

—বেশ। তাহলে খাওয়া সেরেই যাত্রা শুরু করবো। হ্যারি মাথা নাড়িয়ে বলল।

বন্ধুরা সিনাত্রার নৌকোয় কাছি দড়ি নিয়ে বৃদ্ধের বাড়ির উঠোনে এসে এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল। রব্বানি সঙ্গী সহ একপাশে একটা গাছের ছায়ায় বসল। রব্বানি তীক্ষ্ণ নজর রাখল ভাইকিংদের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—রান্না হয়ে গেছে। আপনারা খেতে বসুন। সবাই একপাশে জড়ো করা শুকনো পাতা নিয়ে উঠোনে বসে গেল। হ্যারি রব্বানির কাছে এসে বলল—আপনারাও খেতে চলুন।

—এই লোনা উঠোনে? রব্বানি বেশ অবাক হয়ে বলল।

—কী করা যাবে। এদের ঘরের জায়গা খুবই কম। আসুন। হ্যারি বলল।

সকলেরই খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিসের কণ্ঠ উচ্চস্বরে শোনা গেল।

—বিশ্রাম টিশ্রাম হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ ঘুর্ণির কাছে যেতে হবে। চলো সব।

ভাইকিংরা একে একে নৌকাতে উঠল। রব্বানি তখনও ভেবে পাচ্ছে না—এরা কাছি দড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? মরুক গে। দেখাই যাক না ওদের কাজ তো ভাইকিংদের উপর কড়া নজর রাখা যাতে কেউ পালাতে না পারে। রব্বানিও ওদের নৌকোয় উঠল। নৌকোয় বাঁধা দড়ি। কাজেই রব্বানিদের নৌকো চালাতে হচ্ছিল না। ফ্রান্সিস ভালো করেই বুঝল রব্বানিরা বিশ্রামের সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু ফ্রান্সিস এই চিন্তাটাকে আমল দিল না। একসময় রব্বানি গলা চড়িয়ে বলল—কেউ চালাকি করতে যাবে না। করতে গেলে খতুম হয়ে যাবে। ভাইকিংরা চুপ করে রইল।

যে ঘাটে নেমে ওরা তীর ভূমির পাথর ছড়ানো পাথুরে জমি ঝোপ জঙ্গল গাছপালার মধ্যেই দিয়ে আগে গিয়েছিল নৌকো থেকে নেমে সবাই চলল। রব্বানিরা সব পিছনে পিছনে চলল।

বেশকিছুক্ষণ পর সেই কাণ্ডে কাটাদড়ি বাঁধা গাছটার নিচে এল সবাই। হ্যারি রব্বানির কাছে গিয়ে বলল—আপনারা এখানে গাছের নিচে পাথরে বসুন বিশ্রাম করুন। আমরা কাজে নামছি। রব্বানি কিন্তু হাঁ করে দেখছিল ফ্রান্সিসদের । এরা কাছি দড়ি এনেছে কেন কি করবে ওসব দিয়ে তাই জিজ্ঞেস করল—এসব কাছি দড়ি দিয়ে কী করবেন? এখন কি ঠিক বুঝবেন না দেখতে থাকুন পরে বুঝবেন। রব্বানি যোদ্ধাদের বলল ওরা ওদের মত যা করছে করুক। আমাদের শুধু কড়া নজর রাখা। কাজই যে যেখানে পারো বসে পড়। কিন্তু চোখের বাইরে কাউকে যেতে দেবে না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা ততক্ষণ নৌকো থেকে কাছি দড়ি এনে সেই গাছটার নিচে জড় ক'রে ফেলেছে। দ্রুত কাজ করছে সবাই। রব্বানি নদীর ঘুর্ণিটা এখন কাছ থেকে স্পষ্ট দেখাও গেল। লোকমুখে এতদিন শুনেছে সমুদ্রে নদীতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে জাহাজে প্রচণ্ড পাক খেতে খেতে ডুবে যায়। নদীর ঘূর্ণির টানে আরোহী সুদ্ধ নৌকো ডুবে যায়। ঘূর্ণির প্রচণ্ড টান জাহাজ নৌকো মানুষ তো বটেই কোন কিছুর সাধ্য নেই সেই টান থেকে উদ্ধার পাওয়ার।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে বল—আর এক মুহূর্তেও দেরি নয়। কাছির

একদিকের মাথা নিয়ে গাছটায় ওঠ। কাটা দড়ির কাছে গিয়ে কাণ্ডটায় শক্ত করে ধরো। বিনালা নেই। সিনাত্রা তোমার পেছনে পেছনে উঠবে। কাটা দড়িটা এত দিনের রোদে বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আর তেমন শক্ত নেই। ওটা ছিঁড়তে গেলে সময় নষ্ট হবে। ওটার ওপরেই কাছিটা যত শক্ত করে পারো বাঁধবে দুজন মিলে। যাও। পারবে তো?

—কিছ্ছু ভেব না। শাঙ্কো দড়ির মাথাটা আলগা ফাঁস দিল। কাঁধে ঝুলিয়ে গাছটা বেয়ে উঠতে লাগল। এখানে ওখানে ডাল ধ'রে ধ'রে। সিনাত্রাও ওর দেখাদেখি সেইভাবে উঠতে লাগল। জাহাজে জাহাজেই তো জীবন কেটেছে এতদিন। শক্ত বাঁধনের কৌশল ওরা ভালভাবেই জানে। অল্প সময়ের মধ্যেই বাঁধা শেষ ক'রে নেমে এল।

—এবার কাছিটা নিয়ে গিয়ে কিছু দূরে নদীতীরে আমাদের নৌকোটা বাঁধা আছে সেই নৌকোয় চড়ে ও পারে চলে যাও। এখন ভাঁটার টান চলছে। কাজেই নৌকো স্রোতের টানে ঘূর্ণির দিকে যাবে না। ওপারে পৌঁছে দু'জন কাছিটা নিয়ে ঐ চেস্টনাট গাছের নিচে যাবে। কাছির থোকা কোমরে আল্‌গা ক'রে বেঁধে চেস্টানাট গাছটায় উঠবে। এপারের গাছটার প্রায় সমান উচ্চতায় কাছিটা শক্ত করে বাঁধবে। তারপর নেমে আসবে। তখন নদীর ঐ ঘূর্ণিটার ওপর দিয়ে কাছিটা টান টান হয়ে থাকবে। যাও দেরি করো না। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল।

দুজনে ঝোপঝাড় পার হয়ে নৌকার কাছে এল। দুজনের হাতে তখন কাছিটা ধরা। নৌকা বাঁধার দড়িগুলি খুলে দুজন নৌকা ভাসিয়ে দিল। কিছুদূর ঘূর্ণিটা দেখা গেল। কিন্তু ভাঁটার টানে নৌকো ওদিকে গেল না। ওপারে নৌকা পৌঁছল। শাঙ্কো কাছিটা নিয়ে বসল। সিনাত্রা ওকে পেছনে কাছি ধরতে সাহায্য করল। দুজন কাছি নিয়ে চেস্টনাট গাছটায় কাণ্ড বেয়ে বেয়ে উঠল। দেখল—ফ্রান্সিসের অনুমান সত্য। একই উপায়ে কাটা কাছি বাঁধা। দুজনে কাণ্ড পেঁচিয়ে কাটা দড়ির ওপরে খুব শক্ত ক'রে কাছিটা বাঁধল। দু'জন নেমে এল। দেখল এপারে মাত্র একটাই চেস্টনাট গাছ। ওপারের তুলনায় এ পারটা অনেকসমতল। সবুজ ঘাসে ঢাকা। এবার নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল ঘূর্ণিটার ওপর দিয়ে কাছিটা টানা টান বাঁধা হয়ে গেছে।

এ পারে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল ইবু সালোমদের দেহরক্ষীরা এভাবেই দু'ধারের গাছদুটিতে বেঁধেছিল। কাজেই নিচে ঘূর্ণির ভয় ছিল না। আমরাও দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে ঘূর্ণির ওপর দিয়ে ওপারে চলে যেতে পারবো। নিরাপদে।

—তাহলে তো হাত ফসকে নিচের ঘুর্ণীর জলে পড়তে হবে না।

—ঠিক তাই। প্রথমে ঝুলে ঝুলে আমিই যাব। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চমকে উঠে বলল পাগল হয়েছো? ঘূর্ণির ওপর দিয়ে এভাবে যাওয়া? হাত ফসকে গেলে তো। ওকে থামিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আমার অভ্যাস আছে এটা তো তুমি জানো। কাছি দড়ির রকমসকম ও বহন ক্ষমতা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। উপায় নেই এভাবে না গিয়ে। এ পারটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হ'য়ে গেছে। বাকি রয়েছে ওপারটা। শাঙ্কো সিনাত্রা ওপারে আছে। আমরাও পর পর কাছি তে ঝুল ঝুল করে ওপারে যাব। তুমি পারবে না। তুমি কাউকে নিয়ে নৌকায় চড়ে ওপারে যাও। কাজে নেমে পড়ো।—কিন্তু সবাই পার হ'ল না হয়—ফ্রান্সিস বলে উঠল—হ্যারি—এখনও শেষ রহস্যের সমাধানটা বাকি। ইবু সালোমন নিশ্চয়ই কোন না কোন ব্যবস্থা রেখেছিল যাতে প্রয়োজন হলে স্বর্ণভাণ্ডার ভরা সিন্দুকটা তুলে আনা যায় সহজে। সেই সুত্রটাই খুঁজে বের করতে হবে। কথাটা শেষ করেই ফ্রান্সিস গাছটায় উঠতে শুরু করল। কাটা গাছটার কাছে উঠে ঝোলানো কাছিটা ধরে দু'তিনবার খুব জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। বুঝল কাছিটা বেশ শক্ত করেই বাঁধা হয়েছে। এবার দুলতে-থাকা কাছিটা ধ'রে ফ্রান্সিস ঝুলে পড়ল। নিপুণভাবে হাত দুটো পর পর ছেড়ে ধরে দুলতে দুলতে ওপারে দিকে চলল। ঘূর্ণির ওপরটায় আসতেই বুঝল নিচ থেকে যেন একটা হাওয়া ওপরের দিকে উঠে আসছে। ফ্রান্সিস কাছিটা শক্ত হাতে ধরে জায়গাটা আস্তে আস্তে সাবধানে পার হল। বেশ হাঁপানো গলায় চিৎকার ক'রে বলল—ঘূর্ণির ঠিক ওপর দিয়ে সাবধানে পার হবে। এখানকার পাক-খাওয়া হাওয়াটা বিপজ্জনক।

আস্তে আস্তে একসময় ও পারে চলে এল। গাছের কাণ্ডটা দু হাতে জড়িয়ে ধরে একটুক্ষণ দম নিল। তারপর কাণ্ড ডাল ধ'রে নিচে মাটিতে নেমে এল। দেখল গাছটার গোড়ায় প্রায় হাতখানেক উঁচু পাথরের টুকরোর স্তূপ। বড় টুকরোও আছে। যেন কেউ সাজিয়ে রেখেছে। এটা প্রকৃতির খেয়াল হয়ে নি। ও ভুরু কুঁচকে ভাবল—এরকম ছোট বড় পাথরের টুকরো কারণ কি? কোন বাচ্চা ছেলেমেয়ের কাণ্ড এটা নয়। এভাবে পাথরের টুকরো সাজিয়ে রাখার কারণ কি? ততক্ষণে শাঙ্কো আর সিনাত্রা ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটুক্ষণ ঘাসের ওপর বসে বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস বলল—কেমন এই চেস্টনাট গাছের তলাটা আর চারপাশ খুঁটিয়ে দেখতে হবে। একটাই গাছ, ঝোপজঙ্গলও বেশি নেই। খোঁজা শুরু কর। ইবু সালোমনের দেহরক্ষীরা এপারে নিশ্চয়ই এসেছিল আর চুপ করে

বসে থাকে নি। এখানেও ওরা কিছু করেছে। কী করেছে সেটা খুঁজে দেখতে হবে। সমস্ত জায়গাই তন্ন তন্ন করে খোঁজো। বেলা বাড়ছে।

ওপারে একটা পাথরের ওপর বসে রব্বানি দূর থেকে ফ্রান্সিসদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। ওরা ওপারে কী করছে বোঝা যাচ্ছে না। ওপারে ওর কোন যোদ্ধাও নেই। রব্বানি দ্রুত উঠে বসল। ও সজাগ হল। যদি ঐ তিনজন ভাইকিং সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় ইবু গ্যাব্রিয়েল ওদের গর্দান নেবে। ও তাড়াতাড়ি হ্যারির কাছে এল। রব্বানি বলল—ওপারে আমাদের কোন যোদ্ধা এ যাবৎ যায় নি। তোমাদের বিশ্বাস নেই। আমি দুজন যোদ্ধাকে নিয়ে ওপারে যাবো।

—বেশ। চলুন নৌকোয় চড়ে আমিও একসঙ্গে যাবো।

রব্বানি দু'জন যোদ্ধাকে ইশারায় ডাকল। ওরা কাছে এলে বলল—

—চলো ওপারে যাবো। তোমরা কাছিতে ঝুলে ঝুলে যাবে।

—ওভাবে কি যাওয়া যাবে? একজন যোদ্ধা বলল।

—ঐ ভাইকিংটা গেল কী করে?

—ওর বোধহয় জীবনের ওপর কোন মায়া দয়া নেই। যোদ্ধাটি বলল।

—মরুক গে। চলো নৌকোয় চড়েই যাবে। রব্বানি বলল। হ্যারি আর রব্বানিরা ঝোপঝাড় ভেঙে পাথরের চাঁইয়ের গাছের মোটা মোটা শেকল এড়িয়ে নৌকাগুলির দিকে চলল।

—কিন্তু কী খুঁজব? শাঙ্কো ঠিক বুঝতে না পেরে বলল।

—এমন কিছু যা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। মানুষের হাতে গড়া। গাছটার গোড়ায় পাথর-টুকরো কেমন যেন মানুষের হাতে সাজিয়ে রাখা। অবশ্য এলোমেলোভাবে। নাও—খোঁজা শুরু করো।

তিনজনে চারপাশ মাথা নিচু করে খুঁজতে লাগল। ততক্ষণে আরো কয়েকজন ভাইকিংও কাছি ঝুলে ঝুলে এপারে চলে এসেছে। সবাই মিলে খোঁজা শুরু হল। তারপরই হ্যারি এল। সঙ্গে রব্বানির দুজন যোদ্ধা সবাই মিলে খোঁজা শুরু হল। ঝোপঝাড় টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হল। হঠাৎ শাঙ্কো নদীর জলের কাছাকাছি দেখল ওখানেও টানা পাথরের ছোটো-বড়ো টুকরো যেন একটানা এই গাছটার দিকে এসে শেষ হয়ে গেছে। ও গলা চড়িয়ে ডেকে বলল—ফ্রান্সিস, এদিকে দেখো তো। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এল। দেখল পাথরের সারি যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে বালি-মেশানো মাটি কেমন যেন চেপে বসানো।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—সবাই হাত লাগাও। পাথরের খণ্ডগুলো সরিয়ে ফেলো। দেখা যাক নীচে কী আছে। ততক্ষণে হ্যারিও এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই ছুটে এসে হাত লাগাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাথরখণ্ডগুলো সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল টানা গর্তমতো। গর্তের ওপরকার বালি মেশানো মাটি তুলে ফেলতেই দেখা গেল একটা মোটা কাছি। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—হ্যারি, রহস্য আর রহস্য নেই। এই কাছি দিয়ে সিন্দুকটা বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ঐ ঘূর্ণির মধ্যে। পরে প্রয়োজনে যাতে সিন্দুকটা টেনে তুলে আনা যায়।

—বলো কী? শাঙ্কো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

—তাহলে তো এই দড়ি ধরে টানলেই ঐ সাংঘাতিক ঘূর্ণি থেকে সিন্দুকটা উঠে আসবে। হ্যারি বলল।

—অবশ্যই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—তবে তো যে কেউ এসে এই কাছি টেনে সিন্দুকটা তুলে আনতে পারত। শাঙ্কো বলল।

—পারত যদি সে বুঝতে পারত এভাবে পাথরখণ্ড মানুষই সাজিয়েছে, প্রকৃতি নয়। এটা বুঝতে গেলে তাকে অন্তত আমার মতো বুদ্ধিমান হতে হবে। যাক গে, দেরি নয়। সবাই মিলে কাছিটা টেনে তুলে ফেলো।

সবাই কাছি টেনে তুলে ফেলল সবটা তুলতে দেখা গেল কাছির মাথাটা চেস্টনাট গাছের গোড়া পর্যন্ত গেছে। আর অনুমান নয়। চেস্টনাট গাছটার ঠিক গোড়ায় কাছিটা বেঁধে রাখা হয়েছে। তাই ওখানে পাথরখণ্ড দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল।

—তাহলে তো এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঐ সিন্দুকের হাতল দুটোয় এই কাছিটা বেঁধে ওরা টানা কাছিতে ঝুলিয়ে এনে ঐ ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। ওরা সত্যিই দুঃসাহসী ছিল। কোনও সন্দেহ নেই। হ্যারি বলল। কাছি টানতেই বোঝা গেল ওটার সঙ্গে খুব ভারী কিছু বাঁধা আছে।

শাঙ্কোরা বারকয়েক টানতেই বুঝল, যে ভারী জিনিসটা বাঁধা আছে সেটা উঠে আসছে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কাছি ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল—ফ্রান্সিস, কাছিটার সঙ্গেই সিন্দুকটা বাঁধা আছে। মারো টান।

হ্যারি হেসে বলল—ফ্রান্সিস, এত সহজে সিন্দুকটা উদ্ধার হবে ভাবিনি।

ফ্রান্সিস কিন্তু হাসল না। বলল—হ্যারি, সিন্দুকটা জলের তলা থেকে এখনও কিন্তু পারে নিয়ে আসতে পারোনি। পারলে বুঝব সফল হলাম। ফ্রান্সিসের কথা

শেষ হতে না হতেই কাছিটা ছিঁড়ে গেল। শাঙ্কোরা ভারসাম্য হারিয়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে গেল। ছেঁড়া কাছিটা জল থেকে উঠে এল। সবাই হতবাক।

—যাঃ। বিনোলা মুখে হতাশার শব্দ করে ঘাসে ঢাকা বালির ওপর বসে পড়ল। ছেঁড়া কাছিটা হাতে নিয়ে ভাইকিংরা এ ওর মুখের দিকে হতাশার ভঙ্গিতে তাকাল। হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—ফ্রান্সিস, এটা কী হল? এত মোটা কাছিটা—

—হ্যাঁ ছিঁড়ে গেল। কিন্তু কেন? কথাটা বলেই ফ্রান্সিস কাছির ছেঁড়া জায়গাটা মাটি থেকে তুলে খুঁটিয়ে দেখে বলল—বোঝাই যাচ্ছে কাছিটার এই জায়গাটা দীর্ঘদিন অত্যন্ত ধারালো কিছুর সঙ্গে ঘষা খেয়ে খেয়ে ছিবড়ে মতো বেরিয়ে গেছে। জোরে টান পড়তে একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

—জলের নীচে এমন কী ধারালো জিনিস থাকতে পারে? হ্যারি বলল।

—অনেক কিছু। বড় শামুকের ভাঙা খোল, কাঁচ বা পাথরের চাঁইয়ের ধারালো মাথা। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আর স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধারের কোনও আশাই রইল না। শাঙ্কো বলে উঠল।

—উঁহু। হাল ছাড়তে আমি রাজি নই। একটু সময় চাই। ছক কষতে হবে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস ঘাসে-ঢাকা বালির ওপর বসে পড়ল। বন্ধুরা সব একজন দুজন করে এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। হতাশায় ম্লানমুখ সকলেরই। এত কষ্ট করে এতদূর এগিয়ে এসে হার স্বীকার করতে হবে? ফ্রান্সিস দু'হাত হাঁটুতে রেখে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু পাখপাখালির ডাক আর ঘূর্ণিরত পাক খাওয়ায় জলের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—দড়ির কুণ্ডলীটা নিয়ে এসো। শাঙ্কো আর সিনাত্রা কাঁধে দড়ির কুণ্ডলীটা নিয়ে ফিরে এল।

—দড়ি দিয়ে কী করবে? শাঙ্কো কিছু বুঝতে না পেরে বলল।

—ঐ ঘূর্ণিতে নামতে হবে। ফ্রান্সিস দড়ির মুখটা বের করতে করতে বলল।

—সর্বনাশ! ফ্রান্সিস, এ তো আত্মহত্যা। হ্যারি ভীতস্বরে চেঁচিয়ে বলল।

—না হ্যারি। কাপুরুষ আত্মহত্যা করে। বীরপুরুষ লড়াই করে বেঁচে থাকে। এটা জীবনের ঝুঁকি। বলা যায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। এই ঝুঁকি নিতেই হবে। নইলে হার মেনে মাথা নিচু করে চলে যেতে হবে। সেই বৃদ্ধ অভিজ্ঞ নাবিক

জলের নীচটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়।

বলেছিল—ঘূর্ণির একেবারে নীচে ওপরের চক্করের দাপট থাকে না। সেখানে জল অনেক শান্ত থাকে। আজকে সেটা হাতে-কলমে পরীক্ষার সময় এসেছে।

ফ্রান্সিস লম্বা দড়িটার একটা মাথা কোমরে দুটো প্যাচ দিয়ে বাঁধল। তারপর বলল—আমি দড়ির মাথাটা নিয়ে কাছিতে ঝুলে ঘূর্ণির ঠিক ওপরে যাব। ওখান থেকে ঘূর্ণির মধ্যে নামব। তারপর ঘূর্ণির পাকই আমাকে দ্রুত টেনে নিচে নামাবে। একেবারে নীচে অনেকটা শান্ত জলস্তর পাব। কোমর থেকে দড়ির মাথাটা বের করে ছেঁড়া কাছিটায় শক্ত করে বেঁধেই দড়িতে জোরে দুটো হ্যাঁচকা টান দেব। সঙ্গে সঙ্গে দড়ির অন্য মুখটা ধরে তোমরা সবাই মিলে আমাকে টেনে তুলবে। খুব সাবধান। এতটুকু দেরি করা চলবে না। জলের নীচে সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি। দেশের ডুবুরিদের কাছ থেকে এই কৌশলটা আমার শেখা আছে। আমার নিরাপত্তার কথা একেবারে ভাববে না। তাতে সময় নষ্ট হবে। তৈরি হও সবাই।

কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছটায় উঠে পড়ল। তারপর কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। হাত দুটো দিয়ে কাছি ধরে দুলতে দুলতে চলে এল ঠিক ঘূর্ণির ওপর। একটুক্ষণ দম নিল। তারপর দু'হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত হাঁটু দুটো দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে মাথা নিচু করে ঘূর্ণির মাঝখানে পড়ল। মুহূর্তে প্রচণ্ড পাক খেয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল। জোর পাক খেতে খেতে নীচে তলিয়ে গেল। হাত-পা খোলা থাকলে বোধহয় ছিঁড়ে বেরিয়ে যেত ঘূর্ণির প্রচণ্ড পাকে। ওর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। আশ্চর্য! নীচে জলের সেই প্রচণ্ড পাক নেই বললেই চলে। ফ্রান্সিস একটা বড় পাথরের মাথায় পা রাখল। জলের নীচেটা কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার নয়। ঘোলা জলের মধ্যে দিয়েও সূর্যের অল্প একটু আলো জলতল অবধি পৌঁছচ্ছে। সেই ম্লান আলোয় ফ্রান্সিস দেখল ছেঁড়া কাছিটা ঐ পাথরের চাঁইয়ের মাথার কাছে পড়ে আছে। পাশেই একটা অন্ধকার গভীর খাদে কাছিটা নেমে গেছে। এই গহ্বরের জন্যেই এখানে এরকম প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। কোমর থেকে দড়ির মাথাটা বের করতে করতে দেখল পাথরের চাঁইয়ের মাথাটা উঁচিয়ে আছে। ভীষণ ধারালো। এখানে ঘষা খেয়ে খেয়েই কাছিটার ছিবড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই জোর টান পড়তেই ছিঁড়ে গেছে। অভিজ্ঞ হাতে দ্রুত কাছিটার ছেঁড়া মাথায় দড়িটা শক্ত করে বেঁধে পাথরের ছুঁচোলা মাথা থেকে এক ঝটকায় দড়িটা সরিয়ে দিয়ে পরপর দুটো হ্যাঁচকা টান মারল ফ্রান্সিস। ওপরে দড়ি ধরে দাঁড়ানো শাঙ্কোরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে দড়ি টানতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস প্রাণপণে দড়িটা হাতে-পায়ে জোরে চেপে ধরে রইল। ঘূর্ণির মুখ থেকে অনেকটা সরে এসেছে বলে ঘূর্ণির প্রচণ্ডতা এখানে কম। এর পাক খাওয়া জলের টান চোখ বুজে সামলাতে লাগল। চোখের সামনে একটা কালচে ভাব বাড়তে লাগল। মাথা ঘোরা বেড়ে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিস প্রাণপণে দড়ি চেপে ধরে রইল। এখন এই দড়িই একমাত্র ভরসা। ঘূর্ণির পাক তখনও ওকে নীচে টানছে।

দম ফুরিয়ে আসছে। চোখের সামনে সবকিছু কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। তবু ফ্রান্সিস ভয় পেল না। চোখ বুঁজে দড়ি চেপে ধরে রইল। মুঠি আলগা করল না। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ফ্রান্সিস জলের ওপর ভুস করে মাথা তুলল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। ফ্রান্সিসকে জলের উপরে মাথা তুলতে দেখেই শাঙ্কোরা কয়েকটা জোর টান দিয়ে ফ্রান্সিসকে তীরের বালুর ওপর টেনে আনল। কোমরের ওপরটা তীরের বালিতে কোমর থেকে পা জলের মধ্যে। হ্যারি দ্রুত ছুটে এসে ফ্রান্সিসের মাথার কাছে বসল। মাথাটা আস্তে কোলে তুলে নিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস, ভালো আছ তো? ফ্রান্সিস চোখ খুলল। দেখল বন্ধুদের ঝুঁকে পড়া মুখগুলো কেমন নড়ছে। মাথা ঘুরছে তখনও। ও চোখ বুজল।

—ফ্রান্সিস, শরীর ঠিক আছে? হ্যারি ব্যাকুলকণ্ঠে জিগ্যেস করল।

ফ্রান্সিস চোখ বোঁজা অবস্থায় আস্তে ডান হাত তুলে মাথায় ছুঁইয়ে আঙুল ঘোরাল। তার মানে ওর মাথা ঘুরছে।

—এক্ষুনি মাথা ঘোরা কমবে। তুমি চোখ বুজে বিশ্রাম করো। ভেন তো নেই। ভেন থাকলে ওষুধ দিতে পারত। হ্যারি বলল।

কারো মুখে কথা নেই বালি ঘাসের মধ্যে কেউ কেউ বসে আছে, কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে। শুধু শাঙ্কো ফ্রান্সিসের শিয়রের কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পারে তুলে আনা কাছিটার কাছে কেউ গেল না। কাছিটা দিয়ে ফ্রান্সিস সিন্দুকটা বাঁধতে পেরেছে কিনা এই নিয়ে কেউ ভাবলই না। কতক্ষণে ফ্রান্সিস সুস্থ হবে—এই একটাই দুশ্চিন্তা সবার।

ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলল। হ্যারি ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল—মাথা ঘোরাটা কমেছে? ফ্রান্সিস দুর্বল ভঙ্গিতে আস্তে মাথাটা কাত করল। হ্যারি বলে উঠল—শাঙ্কো, ফ্রান্সিসের মাথা-মুখ আস্তে আস্তে মুছে দাও। এতক্ষণ জলে ছিল।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে নিজের জামাটা খুলে ফেলল। হাঁটু গেড়ে বসে ফ্রান্সিসের মুখ কপাল মাথায় আস্তে আস্তে একটু চাপ দিয়ে মুছে দিতে লাগল। মোছা শেষ হলে

ফ্রান্সিসের বোধহয় একটু ভালো লাগল। ম্লান হাসল। শাঙ্কো তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল—সিনাত্রা, এখানে এসো। ফ্রান্সিসকে জল থেকে তুলে আনব। তুমি ধরো।

তারপর দুজনে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে টেনে বালি ঘাসের ওপর তুলে আনল। এবার শাঙ্কো আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের জামাটা টেনে বুকের কাছে তুলে দিল। তারপর বুক-পেট মুছিয়ে দিতে লাগল। জলে ভিজে শরীর কেমন সাদাটে হয়ে গেছে। তারপর পা মুছিয়ে দিল। বেশ আরাম হল ফ্রান্সিসের। ও হাত দিয়ে ছেঁড়া কাছিতে বাঁধা দড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল। হ্যারি বুঝল সেটা বলল—জাহান্নামে যাক ঐ সিন্দুক। আগে তুমি সুস্থ হও। ফ্রান্সিস চোখ বুজল।

মাথার ওপরে সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। সারাদিন এত খাটুনি গেছে। সবাই উপোসী। কিন্তু কেউ এই নিয়ে একটি কথাও বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস নড়েচড়ে উঠল। আস্তে ডাকল—হ্যারি!

হ্যারি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল।

—কাছিতে বাঁধা—দড়িটা—টানো। ফ্রান্সিস থেমে থেমে বলল।

—আগে তুমি সুস্থ হও তো তারপর। হ্যারি প্রায় ধমকের সুরে বলল।

—উঁহু, হাতে একদম সময় নেই। ইবু গ্যাব্রিওল মোটেই ভালো মানুষ নয়। ফ্রান্সিস দম নিয়ে নিয়ে নিম্নস্বরে বলল।

হ্যারি শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, এসো। দড়ি টেনে সিন্দুকটা তুলতে হবে। হাত লাগাও। কিন্তু খুব আস্তে আস্তে টানতে হবে। আবার না দড়ি ছিঁড়ে যায়।

শুয়ে-বসে থাকা ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। কাছিতে বাঁধা দড়িটা আস্তে আস্তে টানতে লাগল। নীচের ধারালো মাথাওয়ালা পাথরের চাঁইটা এড়িয়ে ফ্রান্সিস কাছিটা সরিয়ে রেখে এসেছিল। দড়ির ঘষা খাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কাও ছিল না। আস্তে আস্তে সিন্দুকটা টেনে এনে তীরে তোলা হল। ফ্রান্সিসের অনুমান ঠিক। চারপাশে এখানে-ওখানে সোনার গিল্টি করা সিন্দুকটার ওপরেও একটা মোটা লোহার হাতল। দু'পাশের লোহার হাতল দুটোও বেশ মোটা। হ্যারি বুঝল ইবু সালোমন বেশ ভেবেচিন্তেই এসব করেছিলেন। এই লোভাত নদীর তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। হয়তো তখনই এই পরিকল্পনা করেছিলেন। অসৎ দুরাচারী পুত্রকে তিনি অনেকদিন আগেই চিনেছিলেন।

সিন্দুকটার কাছে গিয়ে সবাই ভিড় জমিয়েছে। সামনের কড়ায় একটা বড় তালা জুলছে। শাঙ্কো তালাটা ধরে টানাটানি করল। কিন্তু তালা খুলল না। তখন ও কোমর থেকে বড় ছোরাটা বের করল। তালা লাগানো কড়াটায় ছোরাটা ঢুকিয়ে প্রাণপণে চাড় দিতে লাগল। চাড় দিতে দিতে জলে ভেজা জংধরা কড়াটা বেশ খানিকটা আলগা হল। এবার কড়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জোরে হ্যাঁচকা টান। কড়াটা আরো আলগা হল। হাঁপাতে হাঁপাতে শাঙ্কো বলল—তোমরা একে একে কড়াটা টানতে থাকো। একজন একজন করে বন্ধুরা কড়া ধরে টান মারতে লাগল। একসময় কড়াটা সশব্দ খুলে এল। শাঙ্কো ডালার ওপরের কড়া ধরে টান দিল। ডালা খুলল না। শাঙ্কো আবার টান দিল।—আবার—আবার। শেষ পর্যন্ত ডালা খুলে গেল। বিকেলের নিস্তেজ আলোতেও ঝিকিয়ে উঠল আরবী স্বর্ণমুদ্রাগুলি। বেশ কিছু হিরে বসানো স্বর্ণালঙ্কার ও চুনি-পান্না একপাশে রয়েছে দেখা গেল। ভাইকিং বন্ধুরা উল্লাস ধ্বনি তুলল—ও হো হো।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসকে উঠে বসতে দেখে ওরা ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

—দেরি নয়। এখনই ফিরব। ফ্রান্সিস ঝোলা সিন্দুকটার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। এরকম বহুমূল্য গুপ্তধন ওর কাছে তো নতুন কিছু নয়।

রব্বানিরা তখন ছুটে এল। ভিড়ের মধ্যে এসে ওরাও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ঝিকিয়ে ওঠা কুফি অলঙ্কারের দিকে। রব্বানি জীবনের কোনদিন এত সোনার ভাণ্ডার অলঙ্কার দেখেনি। হঠাৎ রব্বানি হাসলেন উল্লাস দু'হাত ওপরে তুলে নাচতে লগাল। ভাইকিংরা আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও হো হো। ওরা অবশ্য ফ্রান্সিসের উদ্ধার করা এরকম স্বর্ণভাণ্ডার আগেও দেখেছে। কাজেই ওরা খুব আশ্চর্য হল না। ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুরাও বুঝল ফ্রান্সিস স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। ওরাও ও-হো-হো-হো ধ্বনি তুলল। রব্বানি তখনও নেচে চলেছে। কাছে এসে মৃদু হেসে হ্যারি বলল—ঐ সিন্দুকের একটা কুফিও কিন্তু আপনি পাবেন না। রব্বানি নাচা থামাল। সত্যই তো এবারই তো গ্যাব্রিয়েল নিয়ে নেবে দয়া করে দু'চারটে স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারে। এবার ও ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল— তোমরা কিন্তু একটা কুফিও পাবে না।

—তা তো বটেই। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আবার আপনারাও কেই পাবেন না। এত স্বর্ণসম্পদ দেখে ইবু গ্যাব্রিয়েল সম্পদের অংশ যে দাবি করবে সেই মরবে।

—এই সিন্দুক আমরা আমাদের নৌকায় তুলে নিয়ে যাবো। বেশ গম্ভীর

গলায় রব্বানি বলল।—বেশ। আপনারা খুশি হলে আমরাও খুশি। রব্বানি গলা চড়িয়ে বলল—অ্যাই—হাতলাগা। এই সিন্দুক আমাদের নৌকায় তোল।

উল্লাসে যোদ্ধা কজন এক লাফে এসে। সিন্দুকটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে কাঁধে তুলে ওদের নৌকোর দিকে চলল। উৎসাহের চোটে রব্বানিও নিজের পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে কাঁধ লাগল।

—চলো হ্যারি ওপারে যাই। আমাদের কাজ শেষ। ফ্রান্সিস ওদের নৌকা যেখানে ভেড়ানো রয়েছে সেদিকে চলল। সিনাত্রা শাঙ্কো এগিয়ে এল। এত ভেবে চিন্তে এত কষ্ট করে ওরা এই সম্পদ তুলল সেটা ওদের চোখের সামনে দিয়ে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না করে রব্বানিরা নিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ওদের মুখ দেখেই বুঝল ওরা কি বলতে চায়। সেটাকে আমলে না দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—যে বাড়তি কাছি দড়ি পড়ে আছে সে সব নিয়ে এসো। এবার নৌকোয় চড়েই ওপারে যাবো। ওসব কখন কি কাজে লাগে। যাও। শাঙ্কো আর সিনাত্রা গিয়ে কাটা কাছি দড়ি নিয়ে এল।

—নৌকায় চলো বিকেল হয়ে এসেছে। কাল রাতে আমাদের কারও ভালো ঘুম হয় নি। ভীষণ ক্লান্ত আমরা। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই নৌকোর দিকে চলল। যেতে যেতে এবার হ্যারি বলল—এত স্বর্ণমুদ্রা ঐ পিতৃহন্তাকে দিয়ে দেবে ফ্রান্সিস?

—কী করবে বলো হ্যারি? এই ভাণ্ডার নিয়ে না গেলে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। রব্বানি আমাদের সহজে পালাতে দেবে না। পিছু ধাওয়া করবে। এত স্বর্ণসম্পদ দেখে ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো আমাদের পিছু নেবে। ধরা পড়বই। ভুলে যেওনা ওরা সশস্ত্র। আমাদের অস্ত্র একমাত্র শাঙ্কোর ছোরা। এমনি ওদের মানিয়ে চললে আমরা প্রাণে রক্ষা পাবো। কিন্তু পালাতে গিয়ে ধরা পড়তেই হবে। রব্বানি ঠিক আমাদের হত্যা করবে। আর একটা কথাও তো মানতে হবে। মারিয়া আর বন্দী বন্ধুদের কী অবস্থা হবে তা এই নরপশুর হাতে। হ্যারি হাঁটতে হাঁটতে ভাবল সত্যি এছাড়া কোন উপায় নেই।—ভেবে দেখ—আমরা তো এই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে আসি নি। স্বর্ণভাণ্ডার তো একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে ইবু গ্যাব্রিয়েলরই। ওরই তো অধিকার এই সম্পদে। আমাদের তো এই সম্পদের ওপর কোন অধিকারই নেই।

নৌকোয় চড়ে সবাই ওপরে এল। সব ভাইকিং বন্ধুরা নিঃশব্দে নৌকোয় উঠল। সিন্দুক নিয়ে সামনে রইল রব্বানির নৌকা। আজ শেষ বিকেল।

নৌকোগুলো চলল ইতেরাস গ্রামের দিকে।

ইরেকাবা গ্রামের ঘাটে গিয়ে সব নৌকো ভিড়ল। সেই সকালে আধপেটা খেয়ে গিয়েছিল। এখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় সবাই কাতর ভীষণ ক্লান্তও। সিন্দুকটা রব্বানি দুজন যোদ্ধার জিম্মায় রেখে গ্রামের দিকে চলল। গ্রামে ঢুকে ক্লান্তিতে ফ্রান্সিসও শুয়ে পড়ল। পাশে বসা হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—এখন বিশ্রাম অবশ্য প্রয়োজন। রাতের খাওয়া সেরেই নৌকো ভাসিয়ে দেব। ফ্রান্সিস ক্লান্ত স্বরে বলল।

—কিন্তু রব্বানিরা যদি রাতটা এখানেই থাকতে চায়।

—থাকবে। আমরা কোনমতেই থাকবো না। একটা কাজ কর—বৃদ্ধকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা দাও আর বলো যে বেশি করে যেন রুটি তৈরি করে। সবাই ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত। পেট পুরে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই বেশ তরতাজা হয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চলে গেল বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে। একটু রাত হতেই সবাই শুক্‌নো পাতা উঠনে পেতে খেতে বসল। যথেষ্ট রুটি করা হয়েছে। মাছের তো অভাবই নেই।

খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও। তারপর আমরা নৌকা ভাসাবো। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকবো না। রব্বানি এসে হ্যারিকে বলল—আমরাও আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে ফিরবো বেশ। চলুন। হ্যারি বলল।

নৌকাগুলো ছেড়ে দেওয়া হল। আজ আকাশ—জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। ফ্রান্সিসের ক্লান্তি অনেকটা কেটেছে। ও নৌকায় গুটিয়ে শুয়ে রইল। তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। এই একই আকাশ তো ওদের দেশেও। তবে ওদের দেশের আকাশের জ্যোৎস্না এত উজ্জ্বল হয়। শীতের দেশ। কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে একটা চিন্তা কিছুতেই ওর পিছু ছাড়ছিল না। বেশ কষ্ট করেই তো স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার হল। এই পরিশ্রম ও বিশেষ গায়ে মাখে না। কিন্তু চিন্তাটা হ'ল ইবু গ্যাব্রিয়েল তো স্বর্ণভাণ্ডার পেলেই ওদের সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহই থাকবে না। ঐ লোকটাকে বিশ্বাস নেই। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণভাণ্ডার পেলে ওর মতো লোভী নীচ মানুষ কী চেহারা ধরবে সেটা ভেবেই ফ্রান্সিসের মন ভীষণ উদ্বেগকাতর হল। পাশেই বসেছিল হ্যারি। ও তো ভালো করেই চেনে ফ্রান্সিসকে। সহজেই বুঝে নিল—ফ্রান্সিস জেগে আছে বটে কিন্তু গভীরভাবে কিছু ভাবছে। তাই ডাকল ফ্রান্সিস?

—হুঁ।

—নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় পড়েছো।

—স্বাভাবিক। স্বর্ণভাণ্ডার পেয়ে যদি ইবু গ্যাব্রিয়েল আমাদের শর্ত অস্বীকার করে।

—অসম্ভব নয়। তবে এতদিন ধরে যে গোপন স্বর্ণভাণ্ডারের চিন্তায় উদ্ধার করে নিজের হাতে পাবার জন্যে চেষ্টা করেছে নিজের পিতাকে হত্যা করেছে তা পেয়ে হয়তো লোকটা উদার হয়ত হতেই পারে। হয়তো আমরা বাঁচলাম কি মরলাম তাই নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাববে না। হয়তো আমরা আজ ওর কাছে বাতিল হ'য়ে যাবো।

—সেটা হলেই মঙ্গল। একটু ভেবে ফ্রান্সিস বলল—

—আমি স্থির করেছি—তুমি আর আমি রব্বানীর সঙ্গে প্রথমে ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজে যাবো। কথা বলবো। ওর মনোভাবটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারবো। যদি বুঝি ও শর্ত মানবে না তাহলে পালাবার ছক কষবো।

—দেখা যাক। তোমার অনেক খাটুনি গেছে। অনেক চিন্তাভাবনা গেছেই। আপাতত বিশ্রাম করো। পারো তো ঘুমোও।

—অসম্ভব। বন্ধুরা মুক্তি পেলে তবেই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুবো। নিজেদের জাহাজ। বন্ধুদের মধ্যে পরিচিত পরিবেশের মধ্যে।

নিজেদের জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজের কাছে যখন নৌকোগুলো পৌঁছল তখন সকাল হয়ে গেছে। চারদিক রোদে চনমন করছে। কাছাকাছি আসতে দেখল জাহাজের রেলিঙ্ ধ'রে মারিয়া আর বয়স্ক ভেন দাড়িয়ে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো তোমরা আমাদের জাহাজে গিয়ে ওঠো। প্রথমেই মারিয়াকে গিয়ে বলবে আমরা সবাই সুস্থ। স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার হয়েছে। আমাদের কাজ শেষ করে আমি আর হ্যারি ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজে উঠবো। তাড়াতাড়িই নিজেদের জাহাজে ফিরে আসব। মরিয়া যেন কোনরকম দুশ্চিন্তা না করে।

রব্বানিদের নৌকোর পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস আর হ্যারির নৌকো নিয়ে চলল। ইবু গ্যাব্রিয়েলে দেখা গেল জাহাজের রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি আসতে রব্বানি নৌকায় উঠে দাঁড়িয়ে সিন্দুকটা দেখিয়ে বার বার গলা জড়িয়ে বলতে লাগল—মাজার—স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার ক'রে এনেছি। এতক্ষণে ইবু গ্যাব্রিয়েলের উদ্বিগ্ন মুখে হাসি ফুটল। জাহাজের যোদ্ধারাও আনন্দে চিৎকার করে উঠল। শূন্যে খোলা তরোয়াল ঘোরাতে লাগল।

এবার নৌকো থেকে সিন্দুক তোলার জোড়জোর শুরু হল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি যখন দড়ির সিড়ি বেয়ে জাহাজে উঠল সিন্দুকের সামনে তখন ইবু গ্যাব্রিয়েল

প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে আছে। যোদ্ধারাও চারপাশে এসে জড়ো হয়েছে। সবাই খুশিতে আটখানা।

রব্বানি এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ডালা এক হ্যাঁচ্‌কা টানে খুলে ফেলল। হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা সোনা হীরে মুক্তো বসানো গয়নাটা উজ্জ্বল রোদ পড়তে বিজিয়ে উঠল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। হ্যারি গলা নামিয়ে ডাকল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল—এখন কথা বলতে যেও না। ইবু গ্রাবি ফেলের কানেই যাবে না কোন কথা। ওর প্যান্ড খুশির জোয়ার ভাঁটা পড়তে দাও। দুজনই চুপ করে দাঁড়িয়ে যোদ্ধাদের আনন্দাল্লাশ দেখতে লাগল। ইবু গ্যাব্রিয়েল হাসিমুখে চারদিকে তাকাতে লাগল।

—রব্বানি—কী ক'রে উদ্ধার করলে? হাসিমুখে ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল।

—এই লোকটা। ভীষণ দুঃসাহসী। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে রব্বানি বলল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—মান্যবর—কয়েকটা কথা ছিল। ইবু গ্যাব্রিয়েল হাত নেড়ে ব'লে উঠল।

পরে এমন সর রব্বানির দিকে তাকিয়ে বলল—সিন্দুক আমরা ঘরে নিয়ে রাখো একটা বুফিও যেন কেউ না নেয়। আর কাল একা তুমি ছাড়া আর কেউ আজ্ঞে না জানিয়ে আগে ঘরে ঢুকবে না।

—মান্যবর এটা তো আপনার বরাবরের হুকুম। রব্বানী ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ইবু গ্যাব্রিয়েল বলল—তোমরা কিন্তু একটা কুফিও চাইবে না।

—এ কথা তো আমি আগেই বলেছি। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—তাহলে কী বলতে এসেছো?

—আপনার সঙ্গে একটা শর্ত ছিল। ইবু গ্যাব্রিয়েল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

—ফ্রান্সিসের শর্ত? কী শর্ত?

—এই শর্ত যে স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারলে আর আপনাকে দিলে আপনি আমার বন্ধুদের মুক্তি দেবেন।

—ও। তাই নাকি? ঠিক আছে। এই নিয়ে পরে কথা হবে।

—পরে না। এক্ষুনি। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল। ইবু গ্যাব্রিয়েল কড়া চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

—ঠিক আছে। স্বর্ণভাণ্ডার তো পেয়ে গেছি। বিদেয় হও সব। রব্বানিকে বলল—যাও ঐ ভিখিরিগুলোকে ছেড়ে দাও।

রব্বানি চলল সিঁড়িঘরের দিকে।

—হ্যারি—তুমি যাও। কয়েদঘরের ঐ জঘন্য পরিবেশে বন্ধুদের দেখলে আমার সহ্য হয় না।

—বেশ হ্যারি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মুক্ত বন্দীরা ডেকে উঠে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সবারই চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। পরনের পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কয়েকজনের পোশাক ছিঁড়ে গেছে। ওরা কয়েকজন ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আর এখানে না। আমাদের জাহাজে চলো। ওরা কেউ আর নৌকায় নেমে যাওয়ার আগ্রহ দেখাল না। ছুটে গেল হালের দিকে বাঁধা দাড়িতে ঝুল খেয়ে নিজেদের জাহাজের ডেকএ গিয়ে উঠল। হ্যারি বরাবরই দুর্বল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে নৌকোয় চড়ে নিজেদের জাহাজের ডেকএ উঠে এল। মারিয়া হাসতে হাসতে ছুটে এল। সত্যি মারিয়ার শরীর বেশ খারাপ হ'য়ে গেছে। চোখমুখ শুকনো মাথার চুল উড়ে উড়ো। অশান্ত মন শান্ত হল। মারিয়া এসে ওর হাত চেপে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া—এক কাজ কর। বন্ধুদের অবস্থাতো দেখছ। শিগগির ওদের স্নান করার ব্যবস্থা করো। তারপর ভাল পোশাক পরে নিতে বলো। রাঁধুনি বন্ধুদের তাড়াতাড়ি রান্নার ব্যবস্থা করতে বলো। বন্ধুরা তখন শাঙ্কো আর সিনিত্রার কাছে গুপ্তধন উদ্ধারের কথা শুনছে। মারিয়া কাছে এসে বলল—

—গল্প পরে হবে। আগে স্নান করে নতুন পোশাক পরে নাও। এসো। সবাই।

—ভাইসব তোমাদের শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে, হ্যারি বলল।

অসুখেই ভুগেছে অনেকে। তবে ভেন দু'বেলা ঐ জাহাজে গিয়ে ওষধু দিয়েছে। রাজকুমারীও আমাদের সেবা শুশ্রূষা করেছেন। এক ভাইকিং বন্ধু বলল।

শাঙ্কো ছোরা বের করে পোঁচ দিয়ে দিয়ে ইবু গ্যাব্রিয়েলের জাহাজের বাঁধা দড়ি কেটে দিল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জাহাজ সরে এল। বিলোনো ততক্ষণে শেকল তুলে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ বেশ দূরে চলে এল। চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। চারদিকে ঝলসানো রোদ। সমুদ্রের ঢেউও আনেকটা শন্ত। সব পাল খুলে দেওয়া হল। ফ্রেজার জাহাজ চলল দ্রুত বেগে। স্বদেশের দিকে।

শেষ